সাউথ ব্লক পেরিয়ে

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

সাউথ ব্লক পেরিয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাল, তারিখ, দিনক্ষন আজ আর মনে নেই, কিন্তু সময়টা মনে আছে।

শরতের শেষ। মনে আছে ক্যানবেরা থেকে সিডনী আসার পথে রাস্তার দু'পাশে ম্যাপেলগাছের সবুজ পাতায় তখন হলদে রং ধরেছে। ব্লু মাউনটেনের তুষার-ছোঁয়া হিমেল বাতাসের মৃদুস্পর্শ লাগলেই পাতার হলদে রং বদলে যাবে। মেটে সিঁদুরের ছোঁয়া লাগবে ম্যাপেলের পাতায় পাতায়। কৃষ্ণচূড়ার বুকে আগুন লাগে শেষ বসন্তে। কিন্তু ম্যাপেলের গায়ে বহ্নুৎসব লেগে যায় শিশির ভেজা হেমন্তের দিনগুলোতে। তারপর শুরু হবে ঝরে পড়ার পালা। কে কার আগে শীতের শীতল মাটিতে তাদের শেষ শয্যা গ্রহণ করবে তার জন্যে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যাবে ঝরে যাবে শেষ পাতাটা। কাঙাল হয়ে যাবে ম্যাপেল। কিন্তু কাঙালপনা সে দেখাবেনা। অনাসক্ত চোখে তাকিয়ে দেখবে তারই পাতার রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে সারা পথটা। তারপর দক্ষিণ মেরুর হিম প্রবাহ যখন একদিন রূপকথার সহস্র রাক্ষসের মত ছুটে আসবে তাদের প্রাণ-ভোমরার কাছে, তখন বরফের ঝালর ঝুলবে ম্যাপেলের শাখা প্রশাখায়। শীতের গভীর ঘুমে চৈতন্য হারাবে ম্যাপেল। ঘুম ভাঙ্গবে সেই অক্টোবর মাসের শেষে।

সবুজ কিশলয় মিটি-মিটি তাকাবে বসন্তের সূর্য্যের দিকে। নব জীবনের প্রাণ রসের নিঃশব্দ কলরোল শোনা যাবে শাখা প্রশাখায়, পাতায় পাতায়।

আমার মনেও তখন নানা ভাবনার কাড়াকাড়ি। ভাবনা না বলে

দুর্ভাবনা বললেই বোধকরি ঠিক হয়। জানি বিলয়ের মধ্যে দিয়েই বিকাশের কাজ চলছে, এও জেনেছি যে প্রাণ-বসন্তের গুপ্ত আবির্ভাবের নামই শীত-মৃত্যু। কিন্তু এই সব উচ্চ গ্রামে বাঁধা জীবন সঙ্গীতের নন্দনতত্ব উপলব্ধি করার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিলনা।

ক্যানবেরায় আমাদের দূতাবাস থেকে যখন সিডনীর পথে পা বাড়ালাম তখন আমাদের রাষ্ট্রদূতের মুখের চেহারাটা অনেকটা ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ ষ্ট্রাইকারের মুখের মতই করুণ দেখাচ্ছিল। 'বেরুবার মুখে তিনি বললেন, 'অষ্ট্রেলিয়ান' পত্রিকার জন্য ভাবিনা, তাদের ত তুমি এক রকম হাত করে ফেলেছো, কিন্তু ভয় ঐ 'সিডনী মর্নিং হেরল্ড', 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' আর "বুলেটিন" কে নিয়ে। সিডনীর কাগজগুলোকে যদি একটু নমনীয় মনোভাবে নিয়ে আসতে পারো তবে মেলবোর্নের কাগজগুলো খুব একটা বাগড়া দেবেনা। আচ্ছা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি এগোও। সিডনী থেকে আমাকে টেলিফোন করো।

আচ্ছা, বলে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলাম।

ক্যানবেরা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে 'রেড হিল' এর গা ঘেসে ভারতীয় দূতাবাস। ক্যানবেরা, সিডনী মেলবোর্ণের মত জনাকীর্ণ, হাজার হাজার মোটর গাড়ী কণ্টকিত প্রাণ চঞ্চল সহর নয়। আকারে ছোট। জন সংখ্যা বিরল। ধনগর্বের প্রতিক আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা সেখানে নেই। ক্ষিপ্রগতি মোটর গাড়ীর বাহুল্যে ট্রাফিক জ্যাম সেখানে হয়না। শহরের কেন্দ্রস্থলে ফেডেরাল সরকারের অফিস আর পার্লামেণ্ট ভবনকে কেন্দ্র করে দূরে দূরে পাহাড়ের টিলার উপর আবাসিক এলাকা। ভাবতে অবাক লাগে ভৌগলিক সংজ্ঞায় যাকে মহাদেশ বলা হয় সেই অষ্ট্রেলিয়ার ফেডেরাল ক্যাপিটাল ক্যানবেরা যেন তার স্বল্পতার দৈন্যে সর্বক্ষণ মনমরা হয়ে আছে। পঞ্চগ্রাম নিয়ে ক্যানবেরা শহরের পত্তন হয়েছিল, কেউ কেউ কেউ বলেন সপ্তগ্রাম। তাই আজো ক্যানবেরা থেকে কেউ সিডনী কিংবা মেলবোর্ণে ফিরে এলে তার পরিচিত কেউ জিজ্ঞাসা করে, কিহে, গাঁ

থেকে কবে ফিরলে ?

সহরই যখন একরত্তি, তখন আমাদের দূতাবাসের আয়তনও সেই অনুপাতেই হ্রস্ব হতে বাধ্য। বারো ফুট দীর্ঘ আমাদের জাতীয় পতাকা দূতাবাসের পক্ষে বেমানান। তাই বারো ফুটের জায়গায় আটফুট একটি ঝক ঝকে নতুন পতাকা নিয়ে সকাল বেলার স্নিগ্ধ বাতাস খেলা করছিল।

বসরার গোলাপ আমি দেখিনি, জামসিদ আর কায়কোবাদের গোলাপ বাগে কি রংয়ের গোলাপ ফুটতো আর তাদের সুগন্ধ কত যোজন দূর থেকে পাওয়া যেত তার বিস্তৃত বিবরণ ওমর খৈয়াম তার রুবাইয়াতে বলেন নি। ক্যানবেরার সকল দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়েছে তার গোলাপ। শুধু আমাদের দূতাবাসের প্রাঙ্গনে নয়, ক্যানবেরার রাস্তার দুধারে, সকল গৃহের সামনে পিছনে নয়নাভিরাম গোলাপ বাগের যে সৌন্দর্য্য আমি দেখেছি, তাতে বসরার গোলাপ দেখিনি বলে আর দুঃখ করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলে রাখছি গোলাপের সৌন্দর্য্য সুধা পান করার মত আমার মনের অবস্থা তখন ছিল না। আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন, শোক ভুলে থাকবার জন্যে হয় গান করবে, নয়ত প্রিয় জনদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করবে নয়ত আবো যা হয় একটা কিছু করবে। আমিও আমার দুর্ভাবনার হাত থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পাওয়ার মানসেই বোধ করি ম্যাপেল আর গোলাপের সৌন্দর্য্য চর্চা করছিলাম। কিন্তু পিঠের উপর দুষ্ট ব্রণের টনটনানি চন্দনের প্রলেপে যাবার নয়। যেতে যেতে কেবলি মনে পড়ছিল রাষ্ট্রদূতের মলিন মুখ, তা ছাড়া খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে সম্ভাব্য পরাজয়ের আত্মগ্লানির অম্লরসে টইটম্বুর মনের গলা বেয়ে তখন থেকেই চোঁয়া ঢেকুর তুলতে আরম্ভ করেছি।

সিডনীর দৈনিক সংবাদপত্রগুলো ভারতবর্ষকে কোন দিনই সুনজরে দেখেনা। কাশ্মীর নিয়ে একটা আধা-মিষ্টি কথাও ওদের মুখ থেকে কখনো বেরোয়নি। যত দোষ সবই ভারতরূপী নন্দ ঘোষের কপালে জুটেছে। তারা এতকাল বলে এসেছে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের দাবী মানতেই হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে যথাযোগ্য ফয়সলা না

করলে উপমহাদেশে শান্তি বিঘ্নিত হবার দায় দায়িত্ব ভারতকেই নিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এহেন হিত বাক্য তারা আগাগোড়া বলে আসছে। কাশ্মীরের ব্যাপার সে সময় একটু ধামা চাপা পড়ে আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে দুই রকমের রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি 'এ্যাকিউট' আর অপরটি 'ক্রণিক',। কাশ্মীর তখন 'ক্রণিক' রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। 'এ্যাকিউট' হল বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যা, শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র বিক্ষোভ, বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা, সে দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহানুভূতি, সিডনীর কাগজগুলি সুনজরে দেখছিলনা। ভারত বিরোধী প্রচারে সিডনীর সংবাদপত্রের অফিসগুলোয় যখন এমনতর তাপ প্রবাহ চলছিল ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসছেন অষ্ট্রেলিয়া সফরে। অর্থাৎ এতদিন যে আগুন প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ করে ধিকিধিকি জ্বলছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আগমনে তা আলেয়াব আলোর মত দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে আর, আমরা অর্থাৎ রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কূটনৈতিক কর্মী-বৃন্দ যারা এতদিন তপ্ত খোলায় ভাজা ভাজা হচ্ছিলুম, তারা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়বো। সিডনীর 'হুইাইল' প্রেসের সুগ্রীব দোসর হলো সহরের টেলিভিশন নেট-ওয়ার্ক। সরকারী চ্যানেল একটাই, কিন্তু বেসরকারী সংস্থা একগাদা। সেই সঙ্গে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত অষ্ট্রেলিয়ান ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের আধা-সরকারী রেডিও সংস্থা। এই সব সরকারী, আধা-সরকারী আর বেসরকারী সংস্থার সকলেরই এক রা। এরা হুমকীর কেয়ারকরেনা, বিনয়ে বশীভূত হয়না। যুক্তি তর্ক করে ভারতের মনোভাব বোঝাতে গেলে উল্টো বুঝলিরাম হয়। অথচ এদের এড়িয়ে চলার উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রীর প্লেন থেকে এয়ার পোর্টে ভি, আই, পি লাউঞ্জে ঢোকার মুখেই ভেলী গুড়ের উপর একপাল মাছির মত প্রধানমন্ত্রীকে এরা ছেঁকে ধরবে। একটার পর একটা শানিত ক্ষুরধারের মত প্রশ্নবাণ ছুড়বে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে। সেই

শরজাল থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন ভাল, আর যদি না পারেন তবে তার নিতে হবে শরশয্যা, আর আমার, অর্থাৎ (আমি দূতাবাসের প্রেস, পাবলিক রিলেশানস ও কালচারাল এফেয়ার্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রথম সচীব), হবে অনন্ত শয্যা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরগুলো যা সবিস্তারে সেদিন টেলিভিশন নেটওয়ার্কে আর রেডিও থেকে প্রচারিত হবে, আর যা পরের দিন ফলাও করে সবগুলো খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে, সে সব যদি প্রধান মন্ত্রীর মনঃপুত না হয় তবে আমাদের দূতাবাসে পদার্পন করে তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রদূতকে বলবেন, ওহে তোমার ঐ তথ্য বিভাগের ফার্স্ট সেক্রেটারীকে ভাত কাপড় দিয়ে আর পুষো না, ওকে দিল্লীতে পত্র পাঠ পাঠিয়ে দাও। আমি যে এ ব্যাপারে নিতান্তই অসহায় তা ষোল আনা বুঝে সুজেও রাষ্ট্রদূত তার নিজের চামড়া বাঁচাতে খেলার মাঠে রেফারীর মত আমাকে লাল কার্ড দেখাবেন।

সম্ভাব্য বিপদ পাতের আশঙ্কায় মনঃসংযোগ করে গাড়ী চালাতে পারছিলাম না। ক্যানবেরা থেকে সিডনীর দূরত্ব প্রায় দুশো মাইল। এক্সপ্রেস হাইওয়ে দিয়ে গেলে আড়াই ঘণ্টার বেশী সময় লাগার কথা নয়, কিন্তু আমার গাড়ী চলছিলো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শৈল্যের অশ্বহীন রথের মত। অর্থাৎ রথের ঘোড়াগুলো অর্জুনের তীরে ধরাশায়ী হওয়ার পর শৈল্যরাজ উপায়ান্তর না দেখে কুরুসেনার কয়েকটী পদাতিকের ঘাড়ে রথের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝলাম স্নায়ুর চাপে ভুগছি। সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে উল্কার বেগে গাড়ী চালালাম। সিডনী পৌঁছে সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং রেডিও টেলিভিশানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে প্রধানমন্ত্রীর টেলিভিশন ইন্টারভিউ, প্রেস কনফারেন্সের দিনক্ষণ ঠিক করে, হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন 'অস্ট্রেলিয়ান' সংবাদ পত্রের বিদেশ বিভাগের সম্পাদক ডেভিড উইলিয়ামকে বললাম, বিল, প্রধান মন্ত্রী এখানে থাকা কালীন বাংলাদেশ ব্যাপারে আমাদের সম্পর্কে দু'একটা ভাল কথা লিখবেতো, চাকরীটাত রাখতে হবে। বিল হেসে বললো, সেজন্যে ভেবোনা। হাঁ একটা সুখবর দিচ্ছি। সিডনী

মর্নিং হেরল্ডের সম্পাদক মিঃ গাই হেরিয়েট, যে তোমাদের দেশকে দুচোখে দেখতে পারেনা, সে আগামী কাল আমেরিকা চলে যাচ্ছে। রডনীইক গাইএর জায়গায় কাজ করবে, তার সঙ্গে তোমার ভাব আছে, তুমি আজই একবার হুকের সঙ্গে দেখা করে এসো, তাকে বুঝিয়ে বলো এডিটরিয়াল কমেন্টস এ প্রধানমন্ত্রীকে যেন স্বাগত জানানো হয়, আর খোলা মন দিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে।

ছুটে গেলুম রডনী হুকের কাছে। তাকে নিয়ে লাঞ্চে বেরিয়ে পড়লুম। খেতে বসে একদফা ব্রিফিং দিলাম রডনী হুককে। ভোজন পর্ব শেষ করে হোটেল থেকে পথে বেরিয়ে এলাম দুজনে। গাড়ীতে উঠতে উঠতে হুক বললো, তুমি ভেবনা। তোমাদের প্রাইম মিনিষ্টারের প্রেস কনফারেন্সে আমাদের রিপোর্টাররা তোমাদের প্রধানমন্ত্রী বিব্রত হন এমন্ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। আমি বলে দেব।

এই আশ্বাস বাণীর জন্য রডনী হুককে ধন্যবাদ জানিয়ে অষ্ট্রেলীয়ান ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের প্রখ্যাত টেলিভিশন ইন্টারভিউয়ার বব সণ্ডার্সের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বব রসিক লোক। বব বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজির ডক্টরেট। আমাকে দেখেই বললেন, কিহে লর্ড কৃষ্ণ, আবার কি গুরু দৌত্য কার্য্যে হেথা তব আগমন?

ওর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললাম, কেন আর এই অভাজনকে ওসব বলে ল্যাং মারছো। লর্ড কৃষ্ণই যদি হতাম তবে কি আর তোমার কাছে আসতাম, তা হলে হস্তিনাপুরে কৌরবদের সভায়ই যেতাম।

পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে টেবিলের উপরে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বব বললো, তুমি কি মনে কর এখানে কৌরব সভা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, আছে নাকি?

মৃদু হেসে বব বললো, আছে কি না আছে তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সেই জানতে পারবে, তবে তফাৎ আছে। মহাভারতের

কৌরব সভায় একটি মাত্র দুর্যোধন ছিল আর আসন্ন প্রেস কনফারেন্সে যে সব সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকবে তারা সকলেই দুর্যোধন। বিনা বাকযুদ্ধে সূচ্যাগ্র মেদিনী তারা ছাড়বে না।

ববের কথায় মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেও মুখে একটা কৃত্রিম তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়ে বললাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ওসব দুর্যোধনদের দেখে হৃদয় কম্পিত হয় না। সে যাই হোক, তুমি কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে একটু বলবে।

বব সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, এই বুদ্ধি নিয়ে ডিপ্লোম্যাটের চাকরি পেলে কি করে? পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেব এমন আহাম্মক আমি নই। হেসে বললাম, আমাদের দেশে কিন্তু ওটাই রীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার আগেই কিন্তু ছাত্ররা প্রশ্নপত্র জেনে ফেলে।

আমার মুখে এই কথা শুনে সণ্ডার্স উৎসাহে ফেটে পড়ে বললো, বলকি! এতবড় একটা সংবাদ তুমি এতদিন আমাকে বলনি। জান, এবার আমার ছেলের একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

সণ্ডার্সের কথার আগা পাছতলা কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম।

বব বললো, ভাবছি আমার ছেলেটাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেবো। এখানে ওর পরীক্ষায় পাশের কোন আশা নেই।

আমি বললাম ভালই হলো দিল্লী যাওয়ার পথে তোমার ছেলের জন্যে একজন বিশ্বস্ত এসকর্ট পাবে।

এবার বিস্ময়ের পালা ওর। বললো কি করে? আমি বললাম, প্রাইম মিনিষ্টারকে নিয়ে যদি তোমরা মাত্রাতিরিক্ত ঠেস ঠিসারা কর, তবে তোমাদের সরকার না করুক আমাদের প্রধানমন্ত্রীই আমাকে 'পারশোনা ননগ্রাটা' করে দিল্লী পাঠিয়ে দেবে। তোমার ছেলে আমার সঙ্গেই যেতে পারবে। তবে কি জান, তোমার দেশের হাওয়া পানি ভালো, কলাডা, মুলাডা, তালডা বেলডা, ভালই পাওয়া যায়, তাই ছেড়ে যেতে

একটু কষ্ট হবে।

বব সণ্ডার্স হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললো, মা ভৈষী। আমার ছেলে দিল্লী যাক আর না যাক তোমাকে যেতে হবে না। তবে এই সহরে তোমার যদি আর কিছু কাজ থাকে ত তুমি এখন গা তোল। আমার একবার ষ্টুডিও যেতে হবে।

বব সণ্ডার্সের অফিস থেকে বেরিয়ে অখিল অষ্ট্রেলিয়া উইমেনস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিসেস জুলিয়া বার্নার্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মিসেস বার্নার্ড অষ্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির স্ত্রী। খুবই সম্ভ্রান্ত মহিলা। অষ্ট্রেলিয়ার নারীর স্বাধীকার আদায়ের জন্য তিনি দীর্ঘ দিন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যানবেরার একটি ককটেল পার্টিতে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন "ইউ সি, দিস ওয়ার্ল্ড স্টিল বিলংস টু মেন"। এ জগতটা এখনও পুরুষের অধিকারে। কিন্তু মনে রেখো নারীর অধিকার পুরুষকে একদিন না একদিন মেনে নিতেই হবে। নইলে এ পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

পুরুষ অপরিনামদর্শী, পুরুষ উদাসীন, পুরুষ দায়িত্বজ্ঞানহীন, পুরুষ কেবল ভাঙ্গতেই জানে, গরতে জানেনা। কিন্তু নারী তার বিপরিত। জানো আজো কোন নারী এদেশের প্রাইম মিনিষ্টার কিংবা গর্ভনর জেনারেল বা কোন বিচারপতির আসন পায়নি। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু যে দিন তোমাদের দেশে একজন রমনী প্রাইম মিনিষ্টার হলো সেদিন আমাদের কি আনন্দ হয়েছিল। আমাদের এসোসিয়েসনের তরফ থেকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে একটি অভিনন্দনের টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। তিনি আমাদের দেশে আসছেন জেনে আমাদের যে কি আনন্দ হচ্ছে তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। যাই হোক, অষ্ট্রেলীয়ার এই নারী সংঘের তরফ থেকে তাঁকে আমরা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাবো। আমাদের প্রোটোকল বিভাগকে এবং ফেডারল সরকারের

বৈদেশিক দপ্তরে আমাদের অভিপ্রায় ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি।

মিসেস বার্নার্ডকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন আর বিশেষ কিছু করার ছিলনা, হোটেলে ফিরে এসে রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোন করলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর বলো, কারো সঙ্গে দেখা টেকা হ'লো।

আমি বললাম, হ্যাঁ অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। কথাবার্ত্তাও হয়েছে। শুনে সুখী হবেন, সিডনী মর্নিং হেরল্ড, খুব বেশী গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। গাই হ্যাবিয়ট আগামী কাল আমেরিকা চলে যাচ্ছে। ওর যায়গায় কাজ করবে রডনীহক। হককে লাঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলুম, ও বললে আমাদেব নিয়ে তোমাদেব বিব্রত হবার কারণ নেই।

রাষ্ট্রদূত খুশী হয়ে বললেন তোমাকে ধন্যবাদ, দরকার হলে আগামী কালও সিডনীতে কাটিয়ে পরশু নাগাদ ক্যানবেরায় ফিরে এসো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা 'গুডনাইট'।

পরদিন কয়েকটা সাময়িক মাসিক পত্রের অফিসে গেলাম; বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যে-সব সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা। অনেকটা আমাদের দেশের 'ইভস উইকলির' মত। দেখলাম তিন চারটা সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অস্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষে অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করছে। কিছু কিছু ফটো ও 'রাইট আপ' দেখার সৌভাগ্যও হলো। দু'একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী গান্ধী সম্বন্ধে দু'চারটে খুটিনাটি তথ্য জিজ্ঞেস করলেন, এসকল অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য একটিই। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে কালো চামড়ার দেশ ভারতবর্ষে নারীর সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে ওঠার যে উদার স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে, সাদা চামড়ার দেশ হয়ে তোমরা তোমাদের নারী সমাজকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছো।

এসব দেখে আমি খুসিতে ডগমগ, কথায় বলে 'ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে', আমার পজিশনটা ঠিক সেই ফকিরের মত।

অর্থাৎ নিজেদের সমস্যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সমাজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তুলে ধরতে চাইছেন অস্ট্রেলিয়ার জনগণের সামনে। এই সুযোগটি আমার কাজে লাগাতেই হবে। এজন্য আমার এতটুকু শ্রম স্বীকার করতে হয়নি, কিন্তু তক্ষুনি ঠিক করলাম ক্যানবেরাতে ফিরে গিয়ে সত্যি মিথ্যার নানা রঙে মেশানো একটা চোখ ঝলসানো ছবি উপস্থাপিত করবো রাষ্ট্রদূতের সামনে। তাকে বলবো 'সিডনী মর্নিং হেরল্ড' আর 'ডেইলি টেলীগ্রাফ' চুলোয় যাক, উইমেনস ম্যাগাজিনগুলোর জন্য যা করে এসেছি স্যার, তা দিন তিনেক পরেই দেখতে পাবেন। আমার কথা শুনে তার চোখ দুটো নিশ্চয়ই রাত্রি শেষের শুকতারার মত জ্বলজ্বল করে উঠবে আর তার চোখের আলোয় আপাত দৃষ্টিতে আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের রাস্তাটায় হয়ত একটু আলোক সম্পাত করবে।

পরদিন ক্যানবেরায় ফিরে এলাম। আমার সিডনী সফরের কাহিনী রাষ্ট্রদূতের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম। তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, আমাদের প্রটোকল বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর সফরের কর্ম্মসূচী তৈরী করছেন তুমি প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশনের সঙ্গে ইন্টারভিউর প্রোগ্রাম আর টাইম টেবল প্রটোকল বিভাগে দিয়ে এসো।

প্রটোকল বিভাগের ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর কাছে গেলাম। তিনি আমার প্রোগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তার হাতে ওটা দিয়ে পুরো এনগেজমেন্টের খসড়াটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। পাঁচদিনের ঠাসা কর্ম্মসূচী। প্লেন থেকে নেমেই এয়ারপোর্টে রেডিও ও টেলিভিশন ইন্টারভিউ। তারপর সেখান থেকে পুনরায় প্লেনে ক্যানবেরায় চলে আসবেন। প্রথমে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনেরালের সঙ্গে গভর্ণমেন্ট হাউসে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তারপর অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠক। তারপর পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনে বক্তৃতা। অপরাহ্ণে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা। তারপর ফেডেরাল সরকারের ক্যাবিনেট মিনিষ্টারদের সঙ্গে আলোচনা। রাত্রিতে

গভর্ণমেন্ট হাউসে রাষ্ট্রীয় ভোজে যোগদান। ভোজনান্তে বক্তৃতা ও টোষ্ট আদান প্রদান। তারপর সিডনী, মেলবোর্ন এবং অন্যান্য স্থানে সফর, সিডনীতে প্রেস কনফারেন্স, টেলিভিশন ইন্টারভিউ, অখিল অষ্ট্রেলিয়া উইমেনস এসোসিয়েশনের সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান, সিডনীর বিখ্যাত তারঙ্গা পশুশালা দর্শন। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জগৎ বিখ্যাত মেরিনো ভেড়ার খামার পরিদর্শন। 'স্নোয়ী মাউন্টেনের' আট হাজার ফুট উর্দ্ধে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিবিদ্যার অপূর্ব্ব নিদর্শন, কোসিয়াসকো'র বাঁধ পরিদর্শন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নির্দ্ধারিত দিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এয়ার ইণ্ডিয়ার একটি বোয়িং বিমানে সিডনী এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছুলেন। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় তাঁকে স্বাগত জানানো হলো। অষ্ট্রেলিয়া বীর পূজার দেশ নয়, কাজেই এয়ারপোর্টে জনসমাগম খুব বেশী নয়। প্রেস এবং টেলিভিশন ইন্টারভিউ সেরে তিনি ক্যানবেরার উদ্দেশ্যে একটি ছোট প্লেনে উঠলেন তাঁর দলবলসহ। আর একটা প্লেনে আমরা অর্থাৎ ভারতীয় দূতাবাসের কূটনীতিক কর্ম্মীবৃন্দ তাঁর অনুগামী হলাম।

পাঁচ দিনের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দিল্লী ফিরে গেলেন। খবরের কাগজওয়ালারা বেশী হৈচৈ করলো না। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে আমাদের ফরেন অফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রত্যেকের কাছে উইমেনস ম্যাগাজিনের অতিরিক্ত সংখ্যাগুলো যথারীতি পৌঁছে দেওয়া হলো। সফরান্তে এয়ার ইণ্ডিয়ার অপর একটি বোয়িং শ্রীমতী গান্ধী এবং অপর সকলকে নিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে সিডনী ত্যাগ করলো। আমরাও সেই সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম।

বলতে ভুলে গেছি প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঠাসা কর্ম্মসূচীর মধ্যেও অল্পক্ষণের জন্য আমাদের দূতাবাসে এলেন। রাষ্ট্রদূত আমাদের অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাটিক অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে চলে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরদিন রাষ্ট্রদূত দূতাবাসে সকল কূট-

নৈতিক কর্মীদের নিয়ে এক মিটিং-এ বসলেন। তিনি বললেন, অষ্ট্রেলীয় নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং দুদেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো বললেন, অষ্ট্রেলীয় নেতারা বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগের কারণটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে প্রধানমন্ত্রী তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। মিটিং শেষ হবার আগে তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রী আমার মারফৎ দূতাবাসের সকল স্তরের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আমিও আমার ডেস্কে ফিরে গিয়ে ডেভিড উইলিয়ামস, রডনী হক আর বব স্যাণ্ডার্সকে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর আমাদের অবস্থাটা অনেকটা সীতার পাতাল প্রবেশের পর অযোধ্যা এবং সেই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত। দ্বিধা বিভক্ত ধরিত্রীর গহ্বরে সীতার অন্তর্ধানের পর রামচন্দ্রের (ষ্টেজে শিশির ভাদুরীর ষ্টাইলে) সিংহাসন থেকে লাফ মেরে সীতার কেশাকর্ষণ করে তাকে টেনে তোলবার চেষ্টার কথা বলছিনা, কিংবা 'হা-সীতা হা-সীতা' করে আর্ত বিলাপে অযোধ্যার রাজসভা সচকিত করার কথাও বলছিনা, অথবা মাতৃ-হারা লব কুশের হাপুস ক্রন্দনে সভাসদদের অশ্রু-সজল করুণ দৃশ্যের অবতারণা করাও আমার বক্তব্য নয়, আমার বক্তব্য সীতার পাতাল প্রবেশের পর কি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একটা কোটেশন লাগিয়ে বলছি—দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার, দণ্ডক বনে ফুটে ফুলভার, সরযুর কোলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল শ্যাম লেখা। অর্থাৎ সীতার অন্তর্ধানের

কিছুদিনের মধ্যেই অযোধ্যা রাজ্যের এভরিথিং নরম্যালে এসে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর আমাদের দূতাবাস ও একদম নরম্যাল।

রাষ্ট্রদূত যথারীতি সময় মত আফিসে এসে, প্রধান মন্ত্রীর অস্ট্রেলীয়া সফরের উপর একটা স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল রিপোর্ট লিখছেন দিল্লীতে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার জন্যে। আমি ইতিমধ্যে ডজনখানেক নিউজ টেলিগ্রাম বিদেশ মন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্পেশাল পাবলিসিটি রিপোর্ট ও লিখতে শুরু করেছি, আমাদের পলিটিকাল এবং কনস্যুলার সেক্‌শন তাদের কর্ত্তব্য করে চলেছেন। আমাদের মিলিটারী এ্যাটাসে কর্নেল সাহেবের তখন বিশেষ কোন কাজ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু তিনি ভীষণ ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন, দূতাবাসের একতলা দোতলায় বারবার ওঠানামা করে।

রিপোর্ট লেখা শেষ করে এনগেজমেণ্ট ডায়েরীটা খুলে পরবর্ত্তী সাত দিনের বাইরের কর্মসূচীর উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। একগাদা রোটারী ক্লাবের বক্তৃতার নিমন্ত্রন নিয়ে বসে আছি। তাও কাছে পিঠে নয়, দু তিনটা রোটারী ক্লাব ক্যানবেরা থেকে প্রায় তিন চারশো মাইল দূরে। একবার যখন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি তখন যেতেই হবে, ইজ্জতের ব্যাপার। এছাড়া ফেডেরাল সরকারের এডুকেশন সেক্রেটারীর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে কটা সংগ্রহ করা যায় তারই চেষ্টা চালাতে। এছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় রয়েছে জাপানের বিদেশ মন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত সম্বর্দ্ধনায় যোগদানের নিমন্ত্রণ। রিসেপসন দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ মন্ত্রী। রিসেপসনের পর ক্যানবেরার ন্যাশনাল থিয়েটারে নৃত্য গীতের কালচারাল প্রোগ্রাম।

যদি কেউ তার শরীরকে নির্মেদ করতে চান, কিংবা আহারের ব্যাপারে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে চান তবে তাকে অষ্ট্রেলিয়ার রোটারী ক্লাব-গুলোতে মাসে অন্ততপক্ষে গোটা দশবার বক্তৃতা দিতে হবে। প্রত্যেক ক্লাবেরই বক্তৃতার আগে নৈশ আহারের বন্দোবস্ত থাকে। কিন্তু এই

রোটারি ক্লাবগুলোর সমস্ত আচার আয়োজন যেন 'ঋষিশ্রাদ্ধ' অর্থাৎ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, কিংবা বলতে পারি 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।' বহিড়াম্বরে কোথাও একচুল ঘাটতি নেই। স্বয়ং ক্লাবের প্রেসিডেন্টের গায়ে সময়োচিত জমকালো পরিচ্ছদ, গলায় সোনার গিল্টি করা মোটা শেকলের লম্বিত হারের শেষ প্রান্তে রোটারী ইন্টারন্যাশনালের চক্রাঙ্কিত সুদৃশ্য লকেট। তার সামনে কাঁসার একটি কাঁশি একটি কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের উপর ঝোলান, পাশে একটি কাঠের হাতুড়ি। এই হাতুড়িটি দিয়ে কাঁশি বাজিয়ে তিনি সভার কাজ পরিচালনা করেন। কেতাদুরস্ত কায়দায় শ্রোতাদের নিকট বক্তার পরিচয় করিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট সাহেব। তারপর নৈশাহার, আহার কেন বলি, বিধবার একাদশী বললেই কথাটা যথাযথ হয়। একটা প্লেটে একটা আলু সেদ্ধ একটুকরো মাংস (কিসের মাংস খোদাই জানেন) একটুকরো রুটি, ব্যস। আহার মধুরেণ সমাপয়েৎ করতে হয় জলো দুধে জ্বাল দেওয়া সাবু দিয়ে। সেই জ্বরো রুগীর পথ্য (অখাদ্য) দুধ সাবুর নামের বহর শুনলে পিলে চমকে যায়। একে বলে কিনা 'ইয়র্কশায়ার পুডিং। নামটা কিন্তু সার্থক। সেটা অন্য কারণে। আমার ছেলেবেলায় ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট বলে একটা গোরা সৈন্যদল বছর তিনেক ছিল ব্যারাকপুরে। এই গোরাদলের বাছাই করা একটা ফুটবল টিম কলকাতা ময়দানে এখনকার মত লীগ আর আই, এফ, এ শিল্ড খেলতো। কিন্তু বেটারা এমনি হীনবল টিম যে অন্যান্য গোরা টিমের কাছে এরা গণ্ডায় গণ্ডায় গোল খেত। এমন কি হাওড়া ইউনিয়ন ও এদের ল্যাং মেরে লীগে দুটো করে পয়েন্ট কেড়ে নিত। তখন এই ইয়র্কশায়ার টিমের ব্যর্থতার কারণ বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম সাবু খেয়ে যারা ফুটবল মাঠে নামে তারা যে হাওড়া ইউনিয়ন, কুমারটুলীর মত টিমের কাছেও ল্যাং খাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাঁচটি সহরের রোটারী ক্লাবে বক্তৃতা সেরে ক্যানবেরায় ফিরে আসছিলাম। এই পাঁচ ছ'দিন রোটারি ক্লাবের 'ভোজ' খেয়ে শরীরের ওজন কয়েক কিলো কমে গেছে বেশ বুঝতে পারছিলাম। গাড়ী চালাতে

চালাতে ভাবছিলাম ক্যানবেরা গিয়ে এই দৈহীক ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে হবে। কি কি বলকারক খাদ্যে দেহের পুষ্টি দ্রুততর হবে তার একটা তালিকা মনে মনে তৈরী করছিলাম। এতক্ষণ আমার গাড়ীটা আপেল আর পীচ ফলের বিস্তৃত বাগিচার ধার ঘেঁসে যাচ্ছিল। বাগান পেরিয়ে এবার রাস্তার দুধারে ব্রকোলী আর সেলারী সব্জীর ক্ষেত দেখতে পেলাম। যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম সেলারী ক্ষেতের এক কোণে হাইওয়ের খুব কাছেই আমাদের দেশের ডাঁটা গাছের মত একটা ছোট ঝাড়। কৌতূহলী হয়ে গাড়ী থামিয়ে গাছগুলোর কাছে গিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই, ডাঁটাগুলো অনেকটা আমাদের দেশের 'সুরেশ্বরী' ডাঁটার মত দেখতে। আহা, কত কাল ডাঁটা শাকের স্বাদ পাইনি। সুরেশ্বরী তো দূরের কথা, দেশের জলো ডাঁটার স্বাদও যেন ভুলে গেছি। আমার ছেলেবেলায় পিসিমা ছড়া কেটে বলতেন,

চাকরীর সেরা দারোগাগিরি
ডাঁটার সেরা সুরেশ্বরী।

গাছগুলোর কাছে গিয়ে মনে হোল এগুলো সুরেশ্বরী হতেও পারে। অমনি এক লহমায় ভুলে গেলাম আমি ইণ্ডিয়ান ফরেণ সার্ভিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি। ভুলে গেলাম আমার গায়ে লণ্ডনের বণ্ডস্ট্রীট থেকে কেনা দামী সুট ; অক্সফোর্ড স্ট্রীটের সালফ্রিজের মতো সম্ভ্রান্ত ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স থেকে কেনা জুতো আর ইটালীয়ান সিল্ক টাই, মার্সেডিজ বেনজ গাড়ী আমার বাহন। এক মুহূর্ত্তে আমার মন চলে গেল আমার বাল্যের গ্রাম্য জীবনে। বর্ষা ঘন ঘোর। পদ্মায় প্লাবন। আমাদের বাড়ীর সামনের বহমান খালের জল পাড় উপচে বাড়ীর উঠোনে ঢুকে পড়েছে। উঠোনে একহাঁটু জল। জলে অগুনতি ছোট ছোট চিংড়িমাছ। একটা হাফের হাফ জীর্ণ মলিন প্যাণ্ট পড়ে (প্যাণ্টের পেছনের দিকের অনেকটা অংশ নেই) আমি আর আমার খুড়তুতো ভাই গামছা দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে সেই চিংড়ি

মাছ ধরে পিসিমার কাছে জমা করে দিচ্ছি। তিনি বড়ঘরের দাওয়ায় বসে রান্নাঘরে আমার কাকীমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "ধন বৌ, এই ইচা মাছ (চিংড়ি) মিঠা কুমড়া আর সুরেশ্বরী ডাঁটা দিয়া একটা লাবড়া রাইন্দো"। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর সুদূর নিউ সাউথ ওয়েলসের পথে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আমি যেন সেই কাকিমার লাবড়া রান্নার গন্ধ পেলাম। ভাবতে অবাক লাগলো আমার গ্রামের ডাঁটা অষ্ট্রেলিয়ায় কি করে এলো। নিউ সাউথ ওয়েলসের সমুদ্র কূলবর্ত্তী অংশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সেখানে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের শাকসব্জীই বা জন্মালো কি করে? সে যাই হোক, স্থির করলাম কয়েকটা ডাঁটা সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। ক্যানবেরায় চিংড়িমাছের অভাব নেই। লিভারপুল সহর থেকে একটা কুমড়ো যদি পাই তো নিয়ে যাবো। লাবড়া খেতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল কাউকে না বলে কয়ে ঐ ডাঁটাগুলো নিয়ে যাই কি করে। যতদুর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি এই ক্ষেত-খামারের মালিক কে এবং তার অনুমতিই বা পাবো কি করে। বেশ কিছুক্ষণ একা একা রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখতে পেলাম রাস্তার বিপরীত দিক থেকে একটা খোলা ভ্যান আসছে। ভ্যানটা আমার গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। তিন চারজন আরোহী চটপট গাড়ী থেকে নেমে এলো। সবকটিই চাষাভূষো লোক। ওর মধ্যে একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার গাড়ী খারাপ হয়েছে?

আমি বললাম, গাড়ী ঠিকই আছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি অন্য কারণে। আমার অভিপ্রায় জানতে পেরে লোকটা হো হো করে হেসে উঠলো। বললো মাইট, (মেট শব্দের বিকৃত উচ্চারণ অর্থাৎ বন্ধু। অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রেণ্ড শব্দটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়) এজন্যে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছো। আমরাত ঐ জঞ্জাল পরিস্কার করতেই এসেছি। যাও, যাও যতগুলো ইচ্ছে নিয়ে যাও। পুরো জঙ্গলটা তোমার গাড়ীতে তুলে দেবো। তাহলে আর ওগুলো আমাদের কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যেতে হবেনা।

আমি বললাম, সবগুলো নেবার জায়গাত আমার গাড়ীতে নেই, আর অতগুলো দিয়ে আমি কি করবো। দু চারটে হলেই আমার চলবে। এক আঁটি ডাঁটা গাড়ীর বুটে তুলে দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা মাইট, এগুলো দিয়ে তুমি কি করবে? তুমি কি খরগোস বা গিনিপিগ পোষ?

কি করে তাকে আমি বোঝাই যে ঐ সরল রেখার মত উইডগুলোর সঙ্গে আমার জীবনের এক অমূল্য স্মৃতি মিশে আছে।

লিভারপুল সহর থেকে একটা কুমড়ো কিনে নিলাম। রাত্রিতে ক্যানবেরায় ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বললাম এক্ষুণি এগুলো দিয়ে একটা তরকারী রান্না করে ফেলত। অনেক দিন এসব খাইনি। ফ্রিজে চিংড়িমাছ আছে তো? তিনি বিকারহীন কণ্ঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়োনা, সবই আছে।

কাপড় চোপড় বদলে রান্নাঘরে গিয়ে মস্ত একটা ছুরি দিয়ে কুমড়োটাকে দুফাঁক করে কেটে ফেললাম। কুমড়োটার ভিতরের চেহারা দেখে আমার চোখে জল এলো। ওটার ভেতরকার রং কাঁচা পেপের শাসের মত। একেবারে ধপধপে সাদা। কাটা কুমড়াটার ঐ রং দেখে আমার স্ত্রী বললো, এটা কি এনেছো, এটা কুমড়ো না আর কিছু।

আমি বললাম, এটা কুমড়ো নিশ্চয়ই, তবে আমার কি মনে হয় জান, আমার মনে হয় এই কুমড়োটা বোধ হয় জন্ম থেকেই কনজেনিটাল এনিমিয়ায় ভুগেছে, তাই ওর রং সাদা। পরে জেনেছিলাম ওটা আদতেই কুমড়ো নয়, ওটাকে বলে 'ম্যারো', যদিও দেখতে অনেকটা কুমড়োর মত।

পরদিন দূতাবাসে যেতেই রাষ্ট্রদূত আমাকে ডেকে পাঠালেন। তার ঘরে যেতেই তিনি বললেন, এসো, বসো। একটা চেয়ার দখলকরে তার মুখোমুখি বসলাম। তিনি বললেন, বল তোমার রোটারী ক্লাবের বক্তৃতার তোড়ে ক্লাব সভ্যদের কতদূর ভাসিয়ে নিয়ে গেলে।

একটু হেসে বললাম স্যার, ওদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলুম ঠিকই,

কিন্তু ওরা সব পাঁড় সাঁতারে। সবাই জল কেটে ডাঙ্গায় ফিরে এলো। তবে গলার স্বুর চড়িয়ে ওদের একটা কথা বলে এসেছি। বলে এসেছি যে তোমরা মনে রেখো যে অস্ট্রেলিয়াকে যেমন ভারতের প্রয়োজন, তেমনি ভারতকেও অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন।

কৌতুহলী হয়ে রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞাসা করলেন, বলেছো এই কথা ?

আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কথা শুনে ওদের কি প্রতিক্রিয়া হলো ?

বললাম, প্রচুর হাততালি।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, বলকি, ঐ কথা বলে হাততালি পেলে ? তোমার ভাগ্য ভাল।

এর পর তিনি একটু হেসে বললেন, এই জাতটা সত্যিই খানদানি স্পোর্টর্সম্যান। দে ক্যান টেক স্পেড এজ এ স্পেড। এর পর টেবিলে রাখা গোলাপী রংএর একখানা লম্বা কাগজ তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখানা পড়।

কাগজ খানার রং দেখেই বুঝতে পারলাম ওখানা ডিম ভেঙ্গে সদ্য বেরিয়ে আসা মুরগীর বাচ্চার মত সাইফার কোডের খোলস ভেঙ্গে ডিসাই-ফার করা একখানা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটি আমাদের বিদেশ মন্ত্রালয় থেকে। দুদিন পর সিডনীতে কমনওয়েলথ 'ল' কনফারেনসের তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন বসছে। ভারতের অফিসিয়াল ডেলিগেট হয়ে তাতে যোগ দিতে আসছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচার-পতি শ্রীগজেন্দ্র গাদকার। কেন্দ্রের আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এবং বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী কে. পি. সাহ।

আমার টেলিগ্রাম পড়া শেষ হলে রাষ্ট্রদূত বললেন, তুমি কালই সিডনী চলে যাও। ওদের জন্যে ফাইভ ষ্টার হোটেল ঠিক করবে। ওরা যে ক'দিন ওখানে থাকবে ওদের দেখাশোনা করবে। ওদের দু'একজন পারসোনাল এসিষ্ট্যান্টের দরকার হবে। তুমি তোমার সঙ্গে তোমার

পি, এ কে নিয়ে যাও আর আমাদের সিডনীর ট্রেড্‌ কমিশনারের পি, এ কেও দরকার হলে নিও। আমি ট্রেড কমিশনারকে বলে দেব। ওদের রিসিভ করতে পরশু সকালের ফ্লাইটে আমি সিডনী যাবো।

এখনো রোটারী ক্লাবের টুরের ধকল কাটেনি এরি মধ্যে আবার টুর। ধ্যৎ, নিকুচি করেছে কনফারেনসের, যাও, আবার সিডনীতে ছুট লাগাও। ভি, আই, পিদের থাকা, খাওয়া, আরাম আয়েসের বন্দোবস্ত কর। কঙ্কনার বাবুদের গোমস্তা গোপী মিত্তিরের মত হাত কচলে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বলো, স্যার, আপনার টেলিগ্রামটা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনার বক্তৃতাটা টাইপ হচ্ছে স্যার, আমার পি, এ কে যতক্ষণ ইচ্ছা রাখুন, তার হাড় মাংস পিষে ফেলুন, আমাদের সঙ্গে মধ্য যুগের ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করুন আমাদের সব সহ্য হবে।

স্বগতোক্তি থামিয়ে রাষ্ট্রদূতকে বললাম, ঠিক আছে। কালই আমি সিডনী যাবো। প্রশ্ন করলাম, সিডনীতে একটা কাজ করলে হয় না ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি করতে চাও। বললাম আমি ভাবছি 'ল' মিনিষ্টারের জন্যে একটা প্রেস কনফারেনসেব আয়োজন করলে হয়না। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন উত্তম প্রস্তাব। দেখ যদি মিনিষ্টার সাহেব রাজি হন।

আমি বললাম তিনি এসব ব্যাপারে খুবই উৎসাহী নিশ্চয়ই রাজী হবেন।

রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে উঠবো উঠবো করছি এমন সময় রাষ্ট্রদূত বললেন, ভাল কথা, একটা বিষয় তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আজ থেকে সাতদিন পর, লকলনভ্যালীর, সকল স্কুলের ছাত্ররা কাওড়া সহরে ওদের বাৎসরিক 'ওয়ার্লড চিলড্রেনস্‌ ডে' উৎসব প্রতিপালন করছে! ওদের এবৎসরের উৎসব ভারতের শিশু ছাত্রদের নিয়ে। কাওড়া সহরের মেয়র আমাকে এই উৎসবে যোগদিতে আমন্ত্রণ করেছেন। আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ। আমি যেতে পারবো না। দুঃখ প্রকাশ করে আমি কাওড়ার মেয়রকে আমার অপারগতা জানিয়ে দিয়েছি।

আর এও জানিয়েছি যে আমার হয়ে তুমি এই উৎসবে যোগদান করবে। তুমি সিডনী থেকে সরাসরি কাওড়া চলে যেও। তোমার থাকা খাওয়ার হোটেল ওরাই ঠিক করবে। তোমার অসুবিধা হবেনা ত? মুখে বললাম, না, না, অসুবিধে কিসের। আমি নিশ্চয়ই যাবো। মনে মনে বললাম, ভগবান, আমার কি একদিনের জন্যও বিশ্রাম নেই। যাও কাওড়া, সেখানে গিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সত্য মিথ্যার মিকশ্চার বানিয়ে বক্তৃতার টাইগ্লাসে তাই পরিবেশন করে এসো।

রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দোতলার সিঁড়ির মুখে মিলিটারি এ্যাটাশে কর্নেল সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি মিলিটারি কায়দায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, তোমার লং ফেস কেন?

গোঁফে তা দিয়ে বেড়ানো ছাড়া দূতাবাসে যার অন্য কোন কাজ নেই তার এই পেট্রোনাইসিং টোনে কথা শুনে আমার গা পিত্তি জ্বলে গেল।

তিক্ত গলায় বললাম, তোমার আর কি। হোটেলে খাও আর দূতাবাসে ঘুমোও। বন্দুকের ঘোড়া টেপা ছাড়া আর ত কিছু জানলেনা, আমাদের জ্বালা বুঝবে কি করে।

আমাকে আর ঘাটানো ঠিক হবেনা ভেবেই বোধকরি—তা বটে, তা বটে বলে তিনি লাউঞ্জের দিকে চলে গেলেন।

কমনওয়েলথ্ 'ল' কনফারেনস্ শেষ হলো সিডনীতে। আইন মন্ত্রীর প্রেস কনফারেনসও নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। কাওড়া সহরের কিশোর ছাত্রদের বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হল কাওড়া পাবলিক স্কুলের খেলার মাঠে। সমবেত প্রায় পাঁচ হাজার কিশোর ছাত্রদের উদ্দেশ করে বললাম, আমি তোমাদের জন্য আমার দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর ছাত্রের অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে এসেছি। ভারতবর্ষ তোমাদের মত ধনীদেশ নয়, সেখানকার স্কুলের ছাত্রদের অনেকেই তোমাদের মত ভাগ্যবান নয়। বহু ক্লেশ স্বীকার করে তাদের লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু তা সত্বেও জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা তোমাদের চাইতে তাদের কম নয়। তোমরাই তোমাদের দেশের ভবিষ্যত নাগরিক এবং

তোমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যবিধাতা। আমার দেশের আজকের কিশোররাও তাই। দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান যতই থাক আসলে তোমরা সবাই এক। জগৎ পারাবারের তীরে এই সে কিশোরদের মহামেলা, এই মহা মেলায় তোমরা আর আমার দেশের ছাত্ররা সবাই শরিক। সকল দেশের কিশোর ছাত্র বড় হয়ে মানবজাতিকে আরও মহান করবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ক্যানবেরায় ফিরে এসে রাষ্ট্রদূতকে বললাম, স্যার, এই সবতো বলে এসেছি। ওরা কি বুঝলো কে জানে।

রাষ্ট্রদূত একটু চিন্তা করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। ওখানকার লোকাল পেপারে, তোমার বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল? আর টেলিভিশনে নিজেকে দেখতে পেয়েছিলে?

বললাম, বক্তৃতাটা বেশ দুই কলাম জুড়ে ছাপা হয়েছে আমার ফটো সমেত। আর টেলিভিশনও নিউজে আমার উপস্থিতির কথা বলেছে। রাষ্ট্রদূত তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, একটা কাজ কর, কাওড়ার কাগজে তোমার যে বক্তৃতাটা ছাপা হয়েছে তার ক্লিপিং দিল্লীতে পাঠিয়ে দাও। যথা আজ্ঞা বলে রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় ব্রিটিশ দূতাবাসে একটা ককটেল পার্টিতে যেতে হবে। ককটেল পার্টি থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। পার্টিতে অন্যান্য দূতাবাসের সহকর্মী এবং অস্ট্রেলিয়ান ফরেন অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে ঘণ্টা দুই বকবক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললাম, তাড়াতাড়ি যা হয় কিছু খেতে দাও। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

খাওয়ার টেবিলে এসে দেখলাম, ফলের ট্রেতে চার পাঁচ রকমের থোকা থোকা আঙ্গুর সাজানো রয়েছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, এত আঙ্গুর কোথায় পেলে?

তিনি বললেন, বাজারে গিয়েছিলাম। এগুলো 'মারে' নদীর

উপত্যকার বিখ্যাত আঙ্গুর। খেয়ে দেখ কি মিষ্টি আর কি অপূর্ব গন্ধ।

ট্রে থেকে একটা আঙ্গুরও মুখে তুলতে ইচ্ছে হলনা। মনে পড়লো কলকাতায় আমার ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন কোন দিন এই আঙ্গুরের স্বাদ পাবেনা। কাশ্মীর কিংবা কুলু উপত্যকার কলকাতায় চালান করা নিকৃষ্ট মানের আঙ্গুরও কিনে খাওয়ার সঙ্গতি তাদের অনেকের নেই। মনে হল আহারে বিহারে আমার এই বিলাস একটা নির্লজ্জ স্বার্থপরতা। এ খাওয়ার অধিকার আমার নেই।

স্ত্রীকে বললাম, আজ আর আঙ্গুর নয়, ডাল ভাত যদি কিছু থাকে ত দাও।

তিনি বললেন ডালত রাঁধিনি। মাষ্টার্ড দিয়ে 'ম্যাকরেল' মাছের ঝাল রান্না করেছি, খাবে ? বললাম, তাই নিয়ে এসো।

এমনি করে দূতাবাসে প্রথাগত কাজকর্ম করে, ককটেল আর ডিনার পার্টিতে হাজিরা দিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করে, রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে প্রচার অব্যাহত রেখে, জনসংযোগ রক্ষা করে, ভাবত সম্পর্কে তথ্য বিতরণ করে, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, রোটারী ও লায়ন্স ক্লাবে বক্তৃতা দিয়ে, আমাদের দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিতদের সরকারী অর্থে আমন্ত্রণ করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার আয়োজন করে, ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস শিল্পকলা, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে প্রামানিক এবং কাহিনী-মূলক ছায়াচিত্র দেখিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলোতে ভারত সম্পর্কে রাশি রাশি বই উপহার দিয়ে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের মধ্যদিয়ে আমার অষ্ট্রেলীয়ার প্রবাস জীবন শেষ হলো। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে আমার কথা এখানেই ফুরোলো না। পরে এই দেশ সম্পর্কে আরো দু'চার কথা বলবো।

কিছুদিন হলো অষ্ট্রেলিয়া থেকে পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ, ঘনায় বদলী হয়ে এসেছি। এক মহাদেশ থেকে অন্য একটি মহাদেশ। অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ঘনার কোথাও কোনো মিল নেই—অষ্ট্রেলিয়া শ্বেতাঙ্গ

জাতির দেশ। ঘনার অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, হাব-ভাব, চালচলন, চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারনায় একটির সঙ্গে অপরটির আসমান জমীন ফারাক। অষ্ট্রেলিয়ার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতালব্ধ ঘনা একটি অনুন্নত দেশ। এই বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির মধ্যে একজন কুটনীতিকের খাপখাইয়ে নেওয়া যে কি কষ্টকর ব্যাপার তা বোঝানো খুব সহজ নয়। কিন্তু কষ্টসাধ্য হলেও তাকে খাপখাইয়ে নিতেই হয় নইলে কাজ চলে না। ভাগ্যক্রমে ঘনার সরকারী ভাষা ইংরেজী, নইলে দুৰ্দ্দশার মাত্রা আরো দশগুন বেড়ে যেত। দোভাষী দিয়ে যে কাজ হয় তা খুবই সীমাবদ্ধ। ইংরেজের ঔপনিবেশিক যুগে ঘনার নাম ছিল গোল্ডকোষ্ট। আক্রা ঘনার রাজধানী সহর। দক্ষিণ এটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর উপকুলবর্তী একটি ছিমছাম ছোট সহর। আক্রা থেকে প্রায় একশষাট মাইল উত্তরে অবুয়াসী নামে একটি স্থানে ঘনার প্রসিদ্ধ সোনার খনি। যা থেকে ঘনার পূর্বনাম হয়েছিল গোল্ডকোষ্ট। স্বাধীনতা লাভের পর নাম বদলে ঘনা হয়েছে। ঘনার ইতিহাস বলে ঐ অঞ্চলে প্রাচীনকালে যে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল, তার নাম ছিল ঘনা।

আমি যখন আক্রা এলাম তখন দেশেবিদেশে ঘনার প্রেসিডেন্ট কোয়ামে ইনক্রুমার জনপ্রিয়তা মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত দীপ্যমান। ইংরেজের ঔপনিবেশিক পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে কোয়ামে ইনক্রুমার সংগ্রাম, কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং দুর্ভোগ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু একদিকে "নেও কলোনিয়া-লিসম"এর সশব্দ পদচারনা এবং অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ঘনার উপর প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং তদুপরি অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং ট্রাইবালিজম-এর অন্তর্দ্বন্দ্বে ইনক্রুমার রাজ্যশাসন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

যে ভারত আফ্রিকার সকল দেশের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বশাসনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যার সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন জওহরলাল

নেহরু, যিনি ঘনার স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংসদে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন এবং কোয়ামে ইনক্রুমার দিকে যে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পর সেই ইনক্রুমা রাতারাতি চীনের বন্ধু এবং ভারত সম্পর্কে নির্বিকার মনোভাব পোষন করতে লাগলেন। ইনক্রুমা যদিও সাংবিধানিক প্রেসিডেন্ট, কিন্তু আসলে তিনি ঘনার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এবং এক নিষ্ঠুর একনায়কের স্থান অধিকার করে বসলেন। যিনি একদা বলেছিলেন যে তিনি "আফ্রিকান পারসোনালিটি" আবিষ্কারের এক শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন অভিযাত্রী, ক্ষমতালাভের পর তিনিই হয়ে উঠলেন আত্মপ্রচারকামী, বিরোধীদের ত্রাসসঞ্চারকারী এক অসংযমী টালমাতাল ডিক্টেটর। জ্ঞানে, চিন্তায়, বিচারবিবেচনায় সূক্ষ্মদর্শী যে-সকল চিন্তানায়ক একদিন ইনক্রুমাকে দেশের নায়কের পদে উন্নীত করেছিলেন, ক্ষমতালাভের পর তিনি সেই সকল মনীষীদের স্থান দিলেন ঘনার বন্দীশালায়। সেখানে অনশনে, অর্দ্ধাশনে অনেকের জীবনের পরিসমাপ্তি হল। যে আর্মির সহায়তায় তিনি ম্যাকবেথের মত নিজেকে নিরাপদ মনে করলেন, সেই সেনাধ্যক্ষেরাই একদিন তাকে গদিচ্যুত করে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করলেন। ঘনায় ইনক্রুমা যুগের অবসান হলো। তাঁর পতনের বছর দেড়েক আগে আমি আক্রায় বদলি হয়ে এলাম। তখন ভারত-চীন যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এই যুদ্ধের পূর্ব থেকেই ইনক্রুমা ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবকে উপেক্ষা করে চলতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের সময় ও তার সহানুভূতি ছিল চীনের পক্ষে। যুদ্ধান্তে ইনক্রুমার চীনপ্রীতি যে পরিমানে বেড়ে গেল, সেই পরিমানে ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠলো। এমন একটা কোনঠাসা অবস্থার মধ্যে আমি ঘনায় এলাম। দু'চারদিনের মধ্যেই কোয়ামে ইনক্রুমার একদিকে যেমন স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির বিভিন্ন পরিচয় পেলাম, অপর দিকে ভারত সম্পর্কে তার কটুকাটব্য ফলাও করে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র গুলোতে প্রকাশিত হতে লাগলো। সহরের তিনচারটে বড় বড় রাস্তাগুলোর

নামকরণ হলো, কোয়ামে ইনক্রুমা রোড, প্রেসিডেন্ট ইনক্রুমা রোড, ওসাজেফো (লিডার, অর্থাৎ ইনক্রুমা) রোড ইত্যাদি ইত্যাদি। আক্রা পার্লামেণ্ট ভবনের প্রাঙ্গনে চৌদ্দফুট উচু ইনক্রুমার ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপিত হলো। ভোলটা নদীর প্রসিদ্ধ বাঁধের নাম হলো ইনক্রুমা বাঁধ। ভোলটা নদীর উপর দীর্ঘ পুলের নাম হলো কোয়ামে ব্রীজ। ঘনার দ্বিতীয় বৃহত্তম সহরের বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হলো কোয়ামে ইনক্রুমা ইউনিভারসিটি। ইনক্রুমার দলের আধা শিক্ষিত আর গুণ্ডা শ্রেণীর লোকগুলোকে সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সাব-এডিটরের পদে বসিয়ে দেওয়া হলো। সে সকল আধা বর্বর লোকগুলোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার বক্তব্য শোনা ত দূরের কথা আমাকে বসতে পর্যন্ত বলেনা। প্রায় তেড়ে মারতে আসার অবস্থা। এদের তুষ্ট করার জন্যে ডিনারে ককটেলে নিমন্ত্রণ করলে বাড়িতে একটা লোকও আসে না। মুখে বলে, হ্যাঁ যাবো, কিন্তু চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার সামগ্রী ডিনার টেবিলে সাজিয়ে শবরীর মত দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত এক জনেরও শুভাগমন হয়না। আমার বিফলতার কথা হাই-কমিশনারকে জানালে তিনি বলেন, কি আর করবে, তিন দিন বসে ওসব খাবার নিজেরাই গেলো।

কি করে ভারত সম্পর্কে এদের কঠিন হৃদয় একটু নরম করা যায় তা নিয়ে দীর্ঘদিন চিন্তা করেও কোন উপায় বার করতে পারলাম না। হঠাৎ মাথায় একদিন একটা বুদ্ধি এলো। কবিগুরুর 'আফ্রিকা' কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'ঘনাইয়ান টাইমস' পত্রিকার আকাটমূর্খ সম্পাদকের কাছে গেলাম। প্রথমে ত তার তথাকথিত সেক্রেটারী আমাকে দেখা করতেই দেবে না। তারপর বিনয়ে তাকে বশ করে সম্পাদকের ঘরে গেলাম। বুঝতে পারলাম আমাকেদেখে সে মহা বিরক্ত হলো। বিরক্তি প্রকাশ করে সে বললো, আবার কি মনে করে? আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো।

যেমনি বলা, সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গলা সপ্তমে চড়িয়ে

বললো, "তুমি কি আমার লগে মসকরা করার লইগ্যা আইছো নাকি? যাও চলে যাও, কাজের সময় আমাকে বিরক্ত করোনা। তোমার কোন কাজ না থাকেত সমুদ্রের পারে বসে ঢেউ গোনগে"। এই বলে সে দুম করে টেবিলের ড্রয়ারটা বন্ধ করে চেয়ারে বসে পড়লো।

ধৈর্য আর সংযমবোধ হারালে ডিপ্লোম্যাট হওয়া যায়না। তাই কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে ধীরে ধীর বললাম, তুমি খামোকা উত্তেজিত হচ্ছো? আমি তোমাকে প্রেমের কবিতা শোনাতে আসিনি। তোমাদের মহাদেশ সম্পর্কে জগতের এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির মর্মবেদনা শোনাতে এসেছি। আমাকে দু' মিনিট সময় দাও তাহলেই আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।

সম্পাদক মহাশয় টেবিলের কাগজ পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললো, পড় কি পড়বে।

আমি ধীরে ধীরে কবিতাটি পড়লাম। পড়া শেষ হয়ে গেলে সে খানিকক্ষণ চুপকরে বসে রইলো। তারপর বললো, ওটা আমাকে দিয়ে দাও। রবিবারের ম্যাগাজিন সেকশনে ছাপিয়ে দেবো। কবিতাটি তার হাতে সমর্পন করে সেদিনকার মত চলে এলাম।

পরের রবিবার বিকেলে হঠাৎ সম্পাদক মহাশয়ের টেলিফোন। তিনি বললেন, তোমাদের দেশের কবির (রবীন্দ্রনাথের নামটা পর্যন্ত জানেনা) কবিতাটা পাঠক মহলে খুবই সমাদৃত হয়েছে। তোমার যদি এখন কোন কাজ না থাকে তবে এসোনা আমার বাড়ীতে। কয়েকজনে মিলে একটু ড্রিঙ্ক করা যাবে। আমি মদ খাইনা। তবু বললাম, তোমার আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ। আমি এক্ষুনি আসছি। তার বাড়ী যেতেই সে কি সম্বর্দ্ধনা। আমার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। যেন কত-কালের এক গেলাসের বন্ধু আমি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলাম সেখানে আরো তিনচারজন ঘনাইয়ান ভদ্রলোক বসে আছেন। তারমধ্যে দু'জন ঘনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন। ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'ইন হোয়াট ইণ্ডিয়ান লাঙ্গোয়েজ পোয়েট ট্যাগোর ইউজড্ রাইট'।

আমি বললাম, তিনি বাংলা ভাষায় লিখেছেন। তবে তিনি অনেক গদ্য রচনা ইংরেজিতেও করেছেন। যেমন তাঁর 'রিলিজিয়ন অব ম্যান্'। সাধনা' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আরো বললাম এশিয়ায় তিনিই একমাত্র সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। (জাপানের কোয়াবাতা সান তখন পর্য্যন্ত নোবেল পুরস্কার পাননি)।

ইংরেজির অধ্যাপক বললেন, বাংলা কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ যে আপনিই করেছেন আজকের কাগজে তা দেখেছি। কিন্তু ভাবতে, আশ্চর্য্য লাগে যে আমাদের অন্তরে যুগযুগধরে সঞ্চিত ব্যথার এমন মহিমময়ী রূপ তিনি দিলেন কি করে? আমাদের লাঞ্ছনার মর্মমূলে এমন অবাধ প্রবেশ করলেন কি করে? তিনি কি কখনো আফ্রিকায় এসেছিলেন?

আমি বললাম, মিশর ইত্যাদি দেশ তিনি পর্যটন করেছেন কিন্তু সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে তিনি বোধকরি কখনো আসেননি। অপর অধ্যাপক বললেন, তিনি ব্লাক আফ্রিকায় আসুন আর নাই আসুন, সেটা বড় কথা নয়। আফ্রিকার ইতিহাসের সঙ্গে এই কবিতাটিও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। এত বড় বিরাট একটা মহাদেশের আত্মা এই কবিতাটির মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে। আপনাদের দেশের কবিকে ধন্যবাদ।

উঠতে উঠতে বললাম এটা শুধু আমার দেশের মহাকবির উপলব্ধিই নয়। সকল ভারতবাসীরই প্রপীড়িত মানবতার প্রতি নিবিড় সহানুভূতি রয়েছে।

কিছুক্ষণ আলাপের পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ঐ সম্পাদক মহাশয় হাসি মুখেই বিদায় দিলেন। গাড়িতে ষ্টার্ট দিলুম। তিনি বললেন, আসবেন একদিন আমার অফিসে। মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, নিশ্চয়ই যাবো। আশাকরি এরপর আর আমাকে তেড়ে মারতে আসবেননা।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে একটা কথা মনে হলো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বাংলার লাঠিই একদিন বাঙালীর ধন বাঁচাতো। মান বাঁচাতো। এই লাঠিই তখন বাংলার পেনাল কোড ছিল। বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠির মতই একজন গুড সামারিটান কিংবা এ গ্যালাণ্ট সামুরাই, যিনি ঘনার সংবাদপত্র রূপ ভারতবিদ্বেষের অনলবর্ষা ড্রাগনের আক্রমন থেকে আপাতত আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। উত্তর কালে এই উগ্রপ্রকৃতির সম্পাদকটিকে দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর চীন সম্পর্কে বিবৃতি পর্য্যন্ত ছাপাতে সক্ষম হয়েছিলাম তার সংবাদপত্রে।

বাড়ী ফিরে শুনলাম হাইকমিশনার আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

বললাম, ঘনাইয়ান টাইমস-এর সম্পাদকের বাড়িতে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

হাইকমিশনার জিজ্ঞেস করলেন। কি ব্যাপার?

আমি বললাম, কঠিন পাথরে একটু ঘাম দেখা যাচ্ছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, বলকি! আনুপূর্বিক সব কথা তাকে বললাম, তিনি বললেন, ট্যাগোরের কবিতাটির অনুবাদটি আমিও আজ প্রথম পড়লাম। এককথায় বলতে পারি কবিতাটি অপূর্ব। মহাকবির কবিতাই বটে। তা তুমি হঠাৎ এটি প্রকাশ করতে উৎসাহী হলে কেন?

আমি বললাম, সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবার জন্যে।

এর কয়েকমাস পরে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল।

ঘনার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের নাম ব্রং-আহাফো। এই প্রদেশের প্রায় পাঁচহাজার বর্গমাইল জুড়ে নিবিড় অরন্যভূমি। সাহারার মরুসূর্যের আগুনমাখা বাতাস যখন বহ্নি জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পরিত্রাণের আশায় পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে ছুটতে ব্রং-আহাফোর বনভূমিতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তখন এই অরন্যের

শীতল স্নিগ্ধতা সেই মরুপবনের গায়ের সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, শতশত বর্ষ ধরে এই বনাঞ্চল এক অতন্দ্র প্রহরীর মত সাহারার নির্মম গ্রাস থেকে ঘনা রাজ্যকে রক্ষা করে আসছে। এই অরন্য প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে মরুভূমির তপ্ত হাওয়া একবার যদি ঘনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে তবে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে দেশের অমূল্য সম্পদ যে কোকো সেই কোকো ক্ষেতে ঘুঘু চড়িয়ে দিত।

সেই অরন্যই কয়েকমাস ধরে সর্বনাশা পীতজ্বরে ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রায় ছ'মাস এই অরন্যে একফোটা বৃষ্টি পড়েনি। বনের শ্যামল স্নিগ্ধ শ্যামলিমা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সমস্ত বনজুড়ে একটা মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। সেই সঙ্গে ব্রং-আহাফোর কৃষ্ণকায় মানুষগুলোর মুখে চোখে যেন আতঙ্কের পাণ্ডুর ছায়া পড়েছে। যদি অবিলম্বে বৃষ্টি না হয় তবে কুমাসী অঞ্চলের কোকোর ফলগুলো চুপসে গিয়ে ভুঁয়ে ঝরে পড়বে। এমন দুর্দৈব যদি ঘটে, তবে ঐ কোকো ফলের মত ঘনার অর্থনীতিও ভূলুণ্ঠিত হবে।

শূন্যানী ব্রং-আহাফো প্রদেশের প্রশাসনিক সদর দপ্তর। প্রায় চার মাস আগে থেকেই ঘনা ইনস্টিটিউট অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচার এই সহরে এক আন্তর্জাতিক সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে রেখেছে। যথা সময়ে ইয়োরোপের ছ'সাতটা আর উত্তর আর দক্ষিণ মার্কিন মুলুকের গোটা দশেক দেশ তাদের গায়ক বাদকের দল নিয়ে আক্রায় উপস্থিত। এই সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ আমাদেরও করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিদেশ মন্ত্রনালয় ভারত থেকে কোন সঙ্গীতশিল্পী পাঠাতে অসম্মত হলেন। খরচ পত্রের ধুয়ো তুলে।

ব্রং-আহাফোর আধিদৈবিক বিপর্যয়ের মুখে এই সম্মেলন আদৌ শুন্যানী সহরে হবে কিনা, তাই নিয়ে আক্রার বিশেষ বিশেষ মহলে কয়েকদিন ধরে নানা জল্পনা কল্পনা হলো। কিন্তু কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলোনা। তাই একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার গুমোট আক্রায় চলতে লাগলো। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার নিরসন করলেন ব্রং-আহাফো

প্রদেশের গভর্ণর। তিনি ইনস্টিটিউট অব কালচারকে জানালেন, সম্মেলন বসবার সব আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন, এখন আর পিছিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এই সিদ্ধান্ত ইনস্টিটিউট মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশাগত শিল্পীগণ তাদের বোচকা-বুচকি নিয়ে শূন্যানী রওনা হয়ে গেল।

প্রাদেশিক গভর্ণরের এই সিদ্ধান্তে আর যেই হোক, আমি অন্তত খুসী হতে পারলামনা। সম্মেলনটা বাতিল হলে আমাদের আর মুখ ফুটে বলতে হোত না যে আমন্ত্রিত দেশগুলোর লিষ্ট থেকে আমাদের নামটা কেটে দাও।

রাষ্ট্রদূতকে খবরটা বললাম। তিনি বিদেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে দু' চারটে কটূক্তি করে কি জানি কেন হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি বললেন, এক কাজ কর। তোমার স্ত্রী ত খুব ভাল গাইতে পারে। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে শূন্যানী চলে যাও। তুমি প্রথমে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর পাঁচ সাত মিনিটের মত একটা স্পীচ দেবে। তারপর তোমার স্ত্রীকে দু' চারখানা গান গাইতে বলবে। তোমার বাড়ীতে বোধ করি হারমোনিয়াম আছে। ওটা সঙ্গে নিয়ে যেও। গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতে পারলে ভালো হোত কিন্তু তা আর পাচ্ছো কোথায়? দরকার নেই, ওতেই কাজ চালিয়ে নিও। কালই চলে যাও।

যথা সময়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে শূন্যানী এলাম। পথে আসতে আসতে জঙ্গলের দুর্দশা দেখতে দেখতে এলাম। বনস্থলীতে নির্মম খরার প্রেতনৃত্য চলছে। রাশি রাশি শুকনো পাতা গরম হাওয়া এদিকে ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শূন্যানীতে অসহ্য গরম। হোটেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তাই প্রাণে বেঁচে গেলাম। কনফারেনস হলটিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

তিনদিন ধরে নানা দেশের গীতবাদ্য চললো। প্রেক্ষাগৃহে শ্রোত-সমাগমের ঘাটতি ছিল না। কিন্তু কারোর মুখেই যেন প্রসন্নতা নেই।

যেন সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। মনে হোল এ অঞ্চলের খরা-ই বোধ করি এর কারণ।

চারদিনের দিন বিকেলে আমাদের ডাক পড়লো। ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বললাম, আমাদের সঙ্গীতের বহু রাগরাগিনীর মধ্যে একটি রাগের নাম মেঘমল্লার। আমাদের দেশের সঙ্গীতানুরাগীদের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে ঐ রাগটি যদি কেউ শুদ্ধভাবে গাইতে পারে তবে সেই সুরধ্বনি বৃষ্টি নামাতে পারে। আমি আমার স্ত্রীকে ঐ রাগটি পরিবেশন করতে অনুরোধ করবো। দেখা যাক অঘটন যদি একটা ঘটে।

হারমোনিয়ামের সামনে আমার স্ত্রী আসন গ্রহণ করতেই সভার শ্রোতৃবর্গ কলরব করে আমার স্ত্রীকে অনুরোধ জানালেন, রাগটি শুদ্ধভাবে গাইবেন কিন্তু।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমার স্ত্রী ঐ রাগে কি একটা গান গাইলেন। গান শেষ হলে শ্রোতাদের প্রচুর হাততালি কুড়িয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। হল থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে ওঠার মুখে দু' একজন ঘনাইয়ান ভদ্রলোককে বললাম, আমার কথাগুলো সিরিয়াসলি নেবেন না। কিংবদন্তি মানেই কিংবদন্তি।

সেদিন সন্ধ্যায় গভর্নরের বাড়ীতে ককটেল পার্টি। আমরা একটু বিশ্রাম করে, স্নানপর্ব সেরে পার্টিতে যাওয়ার পোষাক পড়ছিলাম। হঠাৎ গুরগুর করে কি একটা ক্ষীণ শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা হোটেলের কোথাও থেকে আসছে বলেই মনে হোল। কিন্তু মিনিট দু' তিন পরেই যেন বজ্রধ্বনি শুনতে পেলাম। স্ত্রীকে বলাম, শব্দটা মেঘের ডাকের মত লাগছে না?

তিনি বললেন, মনে ত তাই হচ্ছে। চট করে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে এদিক ওদিক তাকালাম। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুস্থির। সারা আকাশটা ঝড়ো মেঘে ঢেকে গেছে, আর থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

স্ত্রীকে ডেকে দৃশ্যটা দেখালাম। তিনি বললেন, তাইতো, ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার মেঘমল্লারের কেরামতি নয় তো?

আমার স্ত্রী বললেন, ঐ আনন্দেই থাকো। মেঘমল্লার গাইলেই যদি বৃষ্টি হ'ত তবে এই পৃথিবীতে খরা, অনাবৃষ্টির উৎপাত আর থাকতো না।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। তার সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি। প্রায় একঘণ্টা বিরামহীন বৃষ্টিপাত হলো। গভর্নরের বাড়ী যেতে দেখলাম মাঠ-ঘাট-রাস্তা সব জলে জলময়।

গভর্নমেণ্ট হাউসের অঙ্গনে গাড়ী রেখে আমরা দু'জনে কয়েক পা এগুতেই কৃষ্ণকায় গভর্নর সাহেব ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশবারোটা জয়ঢাক কানের ড্রাম ফাটানো আওয়াজ তুলে বেজে উঠলো। লক্ষ্য করলাম গভর্নর সাহেব (আমার অনুমতি না নিয়েই) আমার স্ত্রীর কপালে, গণ্ডে, ঘাড়ে, পিঠে অনর্গল চুম্বন বৃষ্টি করে চলেছেন।

ঢাকের বাদ্যি শেষ হয় না। গভর্নরের চুমো খাওয়াও শেষ হয় না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি ত আছিই। কাছেপিঠে আরো শ'খানেক অতিথি এই দৃশ্য দেখছেন। এক সময় আমার স্ত্রী ময়াল সাপের নিষ্পেষণ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। দেখলাম তার গায়ের ব্লাউজ ঢিলে হয়ে গেছে।

রিসেপসন হলের মধ্যে হাত ধরে আমার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন গভর্নর সাহেব। উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ করে বললেন, ধন্য এই ভারতীয় মহিলা। ধন্য এই ভারতীয় সঙ্গীত। এই মহিলা আজ আমাদের কয়েক লক্ষ মানুষকে বাঁচালেন। ইনি হয় দেবী, নয় যাদুকরী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গভর্নর সাহেব যখন উচ্ছ্বসিত ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন লক্ষ্য করছিলাম তার পাশে দাঁড়ানো আমার স্ত্রী ক্ষণে ক্ষণে তার গালে হাত বুলুচ্ছেন।

তিনি কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

ক্রমাগত গাল ঘসছিলে কেন? তিনি বললেন, লোকটা বোধ করি দাঁত দিয়ে গাল আঁচড়ে দিয়েছে।

আমি বললাম, বল কি! রক্তটক্ত বেরোয়নি তো। তাহলে কিন্তু আর রক্ষে নেই।

তিনি বললেন, কেন?

আমি বললাম, আরে ওরা গোখরো সাপের কোর্মা খায়। যারা গোখরো সাপের মাথা আমাদের রুই-এর মাথার মত কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় তাদের দাঁতের বিষের তীব্রতা অনুমান করতে পারো? রক্ত বেরিয়ে থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ঢলে পড়বে।

আমার স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, যাও, বাজে বকোনা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিজেদের ঘরে বসে আছি। কিছুক্ষণ ধরেই হোটেলের নিচে একটা সোরগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। অনাবশ্যক বলে তাতে কান দিইনি। লক্ষ্য করলাম গোলমালটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। একটু পরে দরজায় মৃদু করাঘাত। দরজা খুলে দেখলাম হোটেলের ম্যানেজার। তিনি বললেন, আপনাদের দু'জনকে একটু নিচে যেতে হবে। এ সহরের অনেক মহিলা জড়ো হয়েছে আপনার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে।

হোটেলের চত্বরে এসে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষুস্থির। ইতিমধ্যেই নানা বয়সের অর্থাৎ যুবতী থেকে প্রৌঢ়া প্রায় শ'তিনেক মহিলা উপস্থিত। প্রত্যেকের মাথায় বিভিন্ন রঙের স্কার্ফ বাঁধা উত্তমাঙ্গ নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে নানারঙের লুঙ্গি।

আমার স্ত্রী তাদের কাছে আসতেই এরা তাকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিল। একদল নেচে সরে যায়, তারপর অন্যদল আসে। সঙ্গে গান, আর ড্রাম বিটিং। গানের সুর, লয়, তান বেশিক্ষণ শুনলে মাথায় খুন চেপে যাবে তাই ওখান থেকে সরে এলাম। হোটেলের বারান্দায় এসে দেখলাম শ'খানেক আনারস, ততোধিক সংখার ছিবড়ে ছাড়ানো নারকেল আর পাঁচসাত কাঁদি মর্তমান কলা। হোটেলের ম্যানেজার বললেন

এগুলো সব আপনাদের জন্যে ওরা নিয়ে এসেছেন।

আমি বললাম, আমার মোটর গাড়ীর পেছনে কিন্তু রেলের ওয়াগন জোড়া নেই। তাই—

বাধা দিয়ে হোটেল ম্যানেজার বললেন, এ আর এমন বেশী কি ভিন্ন ভিন্ন যায়গা থেকে বিকেলে আরো চার পাঁচশ মেয়েছেলে এমনি উপহার নিয়ে আপনার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে আসবে। তিনচারটে মোষের গাড়ী ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তাই নাকি। সংবাদটার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

বিকেলের কথা ভাবতেই গাটা কেমন যেন শিরশির করতে লাগলো। মনে হোল জ্বর আসছে। কোন রকমে মহিলাদের হাত থেকে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করে দুপুর বেলাতেই আক্রার দিকে লম্বা দিলাম। যেতে যেতে ভাবছিলাম মোষের গাড়ীগুলোর সঙ্গে আবার না দেখা হয়ে যায়. তাহলেই ত চিত্তির।

আক্রায় ফিরে এসে শূন্যানীর কাহিনী সবিস্তারে বললাম রাষ্ট্রদূতকে।

তিনি ত হেসেই অস্থির, বললেন, ব্যাপারটা যদিও কাকতালীয় কিন্তু তুমি তা ঘুনাক্ষরেও এদের বলোনা। তাহলে আমাদের দর কমে যাবে।

তারপর সাতদিন ধরে আক্রার সংবাদপত্রে, ঘনা রেডিওতে চলল ভারতীয় সঙ্গীতের অত্যাশ্চর্য মহিমার কাহিনী।

কলকাতার সংবাদপত্র, যুগান্তর ১৯৬২ সালের ২৭ শে মার্চ তারিখের ইস্যুতে প্রথম পাতায় আমার স্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে (ছবিটি কি করে সংগৃহীত হলো জানিনা) এই সংবাদটি পরিবেশন করেছিল। সংবাদের শিরোনাম —"অঘটন আজও ঘটে"।

আক্রায় 'সানডে মিরর' ও 'ঘনাইয়ান টাইমস' ঐ বছরের ১২ই মার্চ তারিখে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে এই সংবাদটি প্রকাশ করলো আক্রার সান্ধ্য সংবাদপত্র 'ইভনিং নিউজ' একটা এডিটরিয়াল লিখে ফেললো এই নিয়ে।

আমরাও এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিলাম। যখন বুঝলাম খোলা বেশ তেতে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই তপ্ত খোলায় ভারত প্রচারের খই ভেজে নিলাম। এই সুযোগে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে প্রাইম মিনিষ্টার নেহেরুর দু-তিনটে বিবৃতি আক্রার সবগুলো সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে গেল।

আক্রা গরম জায়গা। ঋতু পরিবর্ত্তন হয়না বললেই হয়। বৃষ্টি খুব কম হয়। কখনো কখনো বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড ঝড় হয়। অনেক-দিন খরার পর হঠাৎ একদিন সামুদ্রিক ঝড় ধেয়ে এলো। সে কি ঝড়! তিনদিন ধরে ঝড়ের বিরাম নেই। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বাড়ীর ভিত কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনি একটি দারুণ দুর্দিনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "যেন তীব্র ভর্ৎসনায় বায়ু হেঁকে যায়।"

সেদিন রবিবার। ঝড়বৃষ্টির বিরাম নেই। জানালার ধারে বসে আছি। আশেপাশে কেউ নেই। রাস্তায় একটি লোক নেই। চারিদিকে সকাল বেলাতেই মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা। হঠাৎ মনে পড়লো এমনি একটি দুর্যোগপূর্ণ দিনে পনের বছর আগে গৌহাটি থেকে সিমলার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম ফরেন সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষা দিতে। লিখিত পরীক্ষা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিমলা সহরের কেন্দ্রস্থল 'ম্যাল'-এ যাওয়ার সড়কের উপর ঐ যে লাল রঙের বাড়িটা 'জাকো হিলের' দিকে গলা বাড়িয়ে বাঁ দিকে একটু হেলে আছে, হিমাচল প্রদেশের সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস বিল্ডিং বিভাগের ফাইলে ওর নাম এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং। কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল থেকে বছরের পর বছর যে সকল পরীক্ষার্থী সরকারী চাকুরীর আশায় মৌখিক পরীক্ষার জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বোর্ডের সম্মুখীন হয় তারা ওকে বলে 'স্লটার হাউস'। ওখানে নরবলি বা পশুবলি অবিশ্যি হয়না। কিন্তু পরীক্ষার্থী বলি হয়। দশটা খালি পোষ্টের জন্যে তিনশ জনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়।

কাজেই দু'শ নব্বইটি কাঁচা প্রাণকে নিঃশেষে বলি দিয়ে অবশিষ্ট দশটিকে চাকুরী বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় সকল পরীক্ষার্থীকেই বলির পাঁঠার মত কম্পিত কলেবরে ধুঁকতে ধুঁকতে বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয়। তারপর বোর্ডের মেম্বারদের প্রশ্নের কি ঠেলা। প্রশ্ন ত নয় যেন এক একটা খাঁড়ার ঘা। এক ঘায়েই এক একটি করে মুণ্ডু কাটা যায়। যাদের প্রাণশক্তি দুর্দম তারা কোনরকমে দু'চার ঘা সহ্য করলেও অন্তিমে তারাও ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

ইনটারভিউ ত নয় যেন সীতাদেবীর জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ। তবে সীতার শিরায় শিরায় দেবরক্ত ঘোরাফেরা করতো তাই মর্তের আগুন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না। কিন্তু চাকুরীর উমেদারেরা ত সেই ভাগ্য করে আসেনি তাই তাদের মনে আগুন লাগার আগেই ভাগ্যের ললাটে আগুন ধরে যায়। তখন বোধ করি এই আগুন নেভাতে সীতাদেবীর মতই তারা আকুল প্রার্থনা জানায়, হে ধরণী দ্বিধা হও, তোমার শীতল গহ্বরে প্রবেশ করে সকল জ্বালার অবসান ঘটাই।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই ইনটারভিউতে আমারও একদিন ডাক পড়েছিল সিমলায়। ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের জন্য ইনট্যরভিউ। সরকারী ভাষায় এই ইনটারভিউকে বলা হয় পারসোনালিটি টেস্ট। ইংরেজের আমলে একে বলা হত ভাইবাভোসী। ইংরেজ জাতটা তাদের নিজেদের ভাষা ছাড়া তার কোন ভাষারই কোন শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। ওটা জিভের জড়তা না বিজাতীয় ভাষার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য তা আমি জানি না। আসল কথাটা হ'ল 'ভিভা ভোছে'। শব্দ দুটি প্রাচীন ল্যাটিন, অর্থাৎ লাইভ ভয়েস, অর্থাৎ মুখের কথা, অর্থাৎ উমেদারদের দিয়ে প্রশ্নোত্তর আদায় করে নেওয়া।

উত্তরপূর্বপ্রান্তের ঐ সহরটিতে ছোটখাট সাংবাদিকতা করে পেট চালাই। একদিন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রালয় বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলোর তথ্য জনসংযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ পরিচালনার জন্যে

কিছু সংখ্যক কূটনীতিক অফিসার নিয়োগ করবেন। চাকুরী প্রার্থীদের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। উভয় পরীক্ষাসাগর সসম্মানে পার হতে পারলেই ওপারের চাকুরীর নন্দনকাননে প্রবেশাধিকারের পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। তবে চাকুরী প্রার্থীদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক হতে হবে। আমি নামহীন গোত্রহীন সাংবাদিক, তাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিকদের তালিকায় আমার নাম নেই। সাংবাদিকতার কৌলিন্যের বিচারে আমি ব্রাত্য। অনেকটা সত্যকাম জাবালীর মত। এক কথায় চাকুরী পাওয়ার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন আমার নেই। তাই চাকুরী পাওয়ার আশা আকাঙ্খাগুলো প্রাঙ্গনের আগাছার মত মনের মধ্য থেকে ছেটে ফেলে দিয়ে নেহাৎ খেয়ালের বশেই বারোটাকা পঞ্চাশ পয়সা খরচ করে একটা আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলাম। পোষ্ট অফিস থেকে ফিরবার পথে শুধু একটা কথাই আমাকে বারবার খোঁচা দিচ্ছিল। সাড়ে বারোটা টাকা নিরর্থক জলে ফেলে দিয়ে এলাম। ওটা হাতে থাকলে আগামী সপ্তাহের রেশন তোলা যেত।

মানুষের মনে আবেগ বস্তুটা অনেকটা কার্বন মনোকসাইড গ্যাসের মত। আমরা সকলেই জানি কার্বন মনোকসাইড গ্যাসটা অত্যন্ত আনষ্টেবল গ্যাস, বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এলেই ওটা অন্য গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। মানুষের 'মুডগুলো ও অনেকটা তাই। সামান্য কারণেই একটি মুড অন্য মুডে পরিবর্তিত হতে পারে। বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সার জন্যে এতক্ষণ যে আফশোষের মুড ছিল সেটা ফট করে ক্রোধে পরিণত হল যখন ভাবলাম গৃহিণীর প্ররোচনায় এই অর্থদণ্ড হল। সঙ্গে সঙ্গে মুড চেঞ্জ সবটা রাগ গিয়ে পড়লো তার উপর। তারপরেই আবার মুড চেঞ্জ। ভাবলাম এ জীবনে ত অনেক ক্ষতিই সহ্য করে নিয়েছি। বারোটাকা পঞ্চাশ পয়সা লোকসান আর এমন কি ক্ষতি। গেছে, যাক্। এই মনোভাব নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

মাস দুই পর ইউ, পি, এস, সি,র চিঠি পেলাম। শিলং এ গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। যথা সময়ে পরীক্ষা দিয়ে এলাম। তারপর এসব

ব্যাপার বেমালুম ভুলে গেলাম। মাস ছয়েক পর আবার ইউ, পি, এস, সির চিঠি। পারসোনালিটি টেষ্টের জন্য সিমলা যেতে হবে। কমিশনের স্পেশাল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হবে। কমিশন শুধু গৌহাটি থেকে সিমলা পর্যান্ত ইন্টার ক্লাশের রিটার্ন রেল ভাড়া দেবে। চিঠি পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। সিমলা যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। বোর্ডের সামনে উপস্থিত হওয়ার মত স্যুটবুট নেই। খালি রেল ভাড়া দিলেই ত হবেনা। ট্রেনে দু'দিন দুরাত্রি থাকতে হবে, খাওয়া ইত্যাদি নানা খরচ। তারপর সিমলা গিয়ে থাকবো কোথায়। আমার কোন আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব সিমলায় নেই, যাদের কাছে বিনা খরচায় দু'চার দিন থাকা চলতে পারে, অথচ হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই যা দিয়ে খরচ কুলিয়ে উঠতে পারি। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলাম ইন্টারভিউতে গিয়ে কাজ নেই। আমার সিদ্ধান্ত, আমার স্ত্রীকে জানাতেই তিনি আমার উপর নির্মম হয়ে উঠলেন। বললেন, সিমলা তোমাকে যেতেই হবে। টাকার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে করবে?

তিনি বললেন, অত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবোনা।

তুমি যাওয়ার দিন ঠিক কর। যাত্রাকালে টাকা ঠিকই পাবে।

কলকাতায় এসে ধর্মতলা স্ট্রিটের একটা রেডিমেড জামা কাপড়ের দোকান থেকে সাদামাঠা একটা রেডিমেড স্যুট কিনে নিলাম। সেটা কি সহজে ফিট হতে চায়। অনেক ধস্তাধস্তির পরেও কোটটা ফিট হ'লনা। চলেই যাচ্ছিলাম দোকানের মালিক বললো, আপনি পাঁচটা টাকা আগাম দিয়ে যান, কোটটা অলটার করে আপনার গায়ে পড়বার মত করে দেবো। কাল বিকেলে এসে কোটটা নিয়ে যাবেন। অগত্যা এই শর্তেই রাজী হতে হলো। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা সার্ট আর টাই ধার করে নিলাম।

দিনদুই পর হাওড়া স্টেশনে কলকাতা-দিল্লী-কালকা মেলে চড়ে বসলাম। ট্রেনে যেতে যেতে ভাবলাম। ইল্লিদিল্লী ত কখনো দেখিনি।

চাকরি না হোক, এই সুযোগে দিল্লী আগ্রাত দেখা হবে। সিমলা ও দেখতে পাবো। দু'দিন দু'রাত্রি রেলভ্রমনের পর শ্রান্ত দেহে সিমলা পৌছলাম। অর্থের অনটনে কোন হোটেলে ওঠার প্রশ্নই উঠেনা। আগেই শুনে-ছিলাম সিমলার কালীবাড়ীতে সামান্য ব্যয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছোট একটি সুটকেস হাতে করে সিমলা রেলস্টেশন থেকে পথিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে অপরাহ্ন বেলায় কালীবাড়ীতে এলাম। লাউঞ্জে প্রবেশ করে দেখলাম, আমার বয়সী একগাদা ছেলে গিজগিজ করছে। কালীবাড়ীর অধ্যক্ষকে স্থান পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই তিনি স্বল্প কথায় বললেন, যায়গা নেই। আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন।

আমি বললাম, আমার আত্মীয়স্বজন এখানে ত কেউ নেই কোথায় যাবো বলুন। কোন মতে এখানেই দু'দিন থাকবার মত একটু যায়গা করে দিন।

আমার প্রার্থনায় তিনি বিরক্ত হলেন। বললেন, আপনি ত বাঙালী, বাংলা বোঝেন না। আগেই ত বললাম যায়গা নেই। আত্মীয় স্বজন না থাকে ত হোটেলে যান।

বললাম, হোটেলে থাকবার মত পয়সা নেই।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, তাহলে যেখানে খুসী সেখানে যান। এখানে থাকা হবে না।

মাথায় বাজ পড়ার মত অবস্থা। নভেম্বর মাসের শেষ, কিছুক্ষণ হল সূর্য্যাস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন আর ঠাণ্ডাও ক্রমশঃ বাড়ছে। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বিপন্ন মুখ নিয়ে লাউঞ্জে বসে রইলাম। একবার ভাবলাম রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। পরক্ষণেই মনে হল বেলা শেষের শেষ ট্রেন ইতিমধ্যে চলে গেছে। রাত্রে কোন ট্রেন নেই। হয়ত গিয়ে দেখবো ওয়েটিং রুম বন্ধ। তখন কোথায় যাবো। যা থাকে কপালে এখানেই কিছুক্ষণ বসে থাকি। তারপর যা হবার তা হবে।

প্রায় আধঘন্টা পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে লাউঞ্জে ঢুকলেন। এদিক ওদিক একবার দেখে নিলেন। তারপর আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ফরেন সার্ভিসের ইনটারভিউ দিতে আইছো।

তাঁর কথায় বরিশালের টান।

বললাম, সেই জন্যেই এসেছি। কিন্তু রাত্রিতে থাকি কোথায়, এখানে ত যায়গা নেই।

তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, তুমি বড় দেরি কইরা ফেলাইছো। তোমার আগে অনেক ছেলে আইসা ঘরগুলা দখল করছে। তা ঠিক আছে তুমি আমার লগে আয়ো, যায়গা এট্টা হইয়া যাইবে।

যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরটি বেশ বড়। পাশাপাশি দুটো তক্তপোষ। একটা তক্তপোষে ভদ্রলোকের বিছানা পাতা রয়েছে। অপরটা খালি। খালি তক্তপোষটা দেখিয়ে তিনি বললেন, ওডায় তোমার বিছানাডা পাইত্যা ফেলাও।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে ত বিছানা নেই, শুধু একটা কম্বল আছে।

তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, ও মনি, তুমি কি পরীক্ষা দিতে আইছো না শ্বশুরবাড়ী আইছো, লগে একটা বালিশ চাদর তক আনো নাই। এহন শোবা ক্যামনে। এই বলে তিনি উঠে গেলেন। কয়েক মিনিট পর কোত্থেকে যেন একটা আধময়লা বালিশ এবং একটা বিছানার চাদর জোগাড় করে এনে বললেন, নাও পাইত্যা ফালাও। যত সব অর্বাচীনের দল।

কোন কথা না বলে তার আদেশ পালন করলাম। ঠিকঠাক হয়ে তক্তপোষে বসবার পর তিনি আমার নামধাম, কি করি, কোথা থেকে আসছি, ইত্যাদি সব সংবাদ সংগ্রহ করলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এট্টু চা খাবা।

বললাম, পেলে মন্দ হয় না।

তিনি উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর কালীবাড়ীর এক পরিচারক দু' পেয়ালা চা দিয়ে গেল।

চা পানান্তে তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দিলেন। সিমলা বড়পোস্ট অফিসের তিনি হেড পোস্টমাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করে পনের ষোল বছর ধরে কালীবাড়ীর এই ঘরটিতেই আছেন। রিটায়ার করার আগে এই সিমলাতেই তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা মারা যান। সংসারে আত্মীয়স্বজন বলতে আর কেউ নেই। কালীবাড়ীতে একটা মোটা টাকা ডোনেশন দিয়ে এখানেই থেকে গেছেন।

ভদ্রলোককে যেন এতক্ষণ পর আমি চিনতে পারলাম। প্রিয়-জনদের স্মৃতি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তিনি যে জীবনের শেষ কটাদিন এখানেই থাকবেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। কেন যে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে তাঁর ঘরে স্থান দিলেন তা বুঝতেও আমার কষ্ট হ'ল না। ভদ্রলোকের মুখের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম। করুণাঘন চোখ দুটিতে যেন এক অতলান্ত স্নিগ্ধতা।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, চল ভাত খাইয়া আসি। আহারান্তে আর একবার লাউঞ্জে গেলাম। দেখলাম ছোটছোট টেবিল ঘিরে আমারই বয়সী দশ-বারোটি ছেলে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম এরা সকলেই আমার মতই ফরেন সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষা দিতে এসেছেন। তাদের আলোচনাটার সূত্র ধরবার চেষ্টা করলাম। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে তাদের বিতর্ক চলছিল। দেখলাম এমন সব যুক্তিতর্কের অবতারনা করে তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করছেন এবং যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তার অনেক কিছুই আমার জানা নেই। মনে হলো এদের তর্কবিতর্কের অনেক কিছুই আমার মাথায় না ঢুকে মাথার দু' হাত উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে এরা আমার থেকে এ সব ব্যাপারে অনেক বেশী এডভানসড্ এবং আপটুডেট। এদের কাছে নিজেকে যেন খুব ছোট মনে হ'ল। লাউঞ্জ থেকে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের

ঘরে এলাম। তিনি তখনো বিছানার ওপর বসে আছেন।

আমি বললাম, দাদা, ভাবছি কাল আমি ইন্টারভিউ দেবনা। কাল সকালেই গৌহাটি চলে যাবো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

বললাম, যা সব বাঘা বাঘা ক্যাণ্ডিডেট এসেছে! তাদের কাছে আমি নস্যি। বোর্ডের মেম্বারদের এক ফুঁয়ে আমি উড়ে যাব। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, দেহো, ইন্টারভিউ দিলেও হয়ত তুমি চাকরি পাবা না। কিন্তু হেই লগে আরো একটা জিনিষও পাবানা।

জিজ্ঞেস করলাম, সেটা কি?

তিনি বললেন, ঐ ইন্টারকেলাসের রিটার্ণ ভাড়াডা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বৈষয়িক বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। ইন্টারভিউ দেব।

তিনি একটু হেসে বললেন, এতক্ষণে গাছের গোড়ায় আইছো। যাউক, রাত্তির অনেক হইছে, সারাদিন জার্নি কইরা আইছো। এখন শুইয়া পড়। কাইল সকালে তোমারে জাগাইয়া দিমু।

পরদিন সকালে তিনি আমাকে এডমিনিসস্ট্রেটিভ বিল্ডিং অর্থাৎ 'শ্লটার হাউস' পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, বোর্ডের সামনে গিয়া ঘাবড়াবা না। মাথা ঠাণ্ডা কইরা জবাব দেবা। ওরা কিন্তু তোমারে নার্ভাস করার চেষ্টা করবে। লোকগুলা ভালো না। আর পরীক্ষার পর সোজা কালীবাড়ীতে চইল্যা আইসো। অন্য কোনখানে যাইওনা।

তিনি চলে গেলেন। আমি লাউঞ্জে এসে বসলাম। কাল রাত্রিতে কালীবাড়ীতে যে-সকল ক্যাণ্ডিডেটদের দেখেছিলাম তারা সকলেই উপস্থিত। সকলের চোখে মুখেই একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। আমার মুখের চেহারাটাই বোধকরি শ্লটার হাউসের অপেক্ষমান বলির পাঁঠার মত করুণ দেখাচ্ছিল।

যথা সময়ে ডাক পড়লো। ঘাবড়াবার ব্যাপার নেই। কারণ আমি

বুঝেছিলাম—হিন্দু ট্রিনিটির তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর একযোগে চেষ্টা করলেও আমার ঘাড় তাঁরা বাঁচাতে পারবেন না। ঘাড় থেকে মস্তক খণ্ডিত হবেই।

আরম্ভ হ'ল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্নত নয় যেন এক একটি ক্ষুরধার অগ্নিবান। কিরাতরূপী শিবের মত কতকগুলো বান গিলে ফেললাল আর কতকগুলো আমার দেহের বিভিন্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত করে বেরিয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এদের হাতে নিস্পেষিত হয়ে ভীম কর্তৃক নিস্পিষ্ট কীচকের মত মাংসপিণ্ডে পরিনত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে চলে এলাম।

কালীবাড়ীতে ফিরে এলাম। নিজের ঘরে গিয়ে দেখলাম সেই বৃদ্ধ তখনো তুপুরের খাওয়া খাননি। আমাকে দেখে বললেন, চল খাইয়া আসি। যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আইজ বিকালের ট্রেনেই গৌহাটি যাবা।

আমি বললাম, তাই ত যাবো দাদা।

বিকেলে তিনি আমাকে ট্রেনে তুলে দিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে তার পদধূলী মাথায় নিলাম। তিনি বললেন, চাকরি পাইলে খবরটা দিও। খুসি হমু।

বললাম, যদি পাই ত আপনাকে নিশ্চয়ই খবর দেব।

ট্রেন ছেড়ে দিল। যেতে যেতে ভাবছিলাম একটা কথা। একদিন এই বৃদ্ধের যে-ভালোবাসা তুটি নারীর মধ্যে আপন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই প্রেমের নীড় যেদিন ভেঙ্গে গেল সেদিন শুধু তাঁর নীড়টাই ভেঙ্গেছিল কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধ প্রেম সেদিন থেকে মানবপ্রীতির অজস্র ধারায় সকল সীমার বাঁধন লঙ্ঘন করে আপন সার্থকতার পানে ধেয়ে চললো।

গৌহাটি ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে কালচক্র আর একটি বর্ষ পরিক্রমা শেষ করেছে। সিমলার স্মৃতি বেমালুম ভুলে গেছি। কিছু-দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ইমফল আসছেন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ নুর সঙ্গে ইন্দোবর্মা সীমান্ত নির্দ্ধারণের বিষয় নিয়ে আলাপ

আলোচনায় বসতে। প্রধানমন্ত্রীর টুর কভার করার জন্যে যখন ইমফলে যাওয়ার তোড়জোড় করছি সেইক্ষণে একদিন পোস্টম্যান চার-পাঁচটা শিলমোহর আঁটা একটা খাকি রং এর বিশাল খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিল। খামখানা খুলে দেখলাম ইউ পি এস সির অনুমোদনক্রমে বিদেশ মন্ত্রালয় আমাকে নিয়োগ পত্র দিয়েছেন এবং অবিলম্বে কাজে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উ নুর আলাপ আলোচনা ইমফল থেকে কলকাতার অফিসে পৌঁছে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে রেজিগনেশন চিঠি পাঠিয়ে গৌহাটি ছেড়ে দিল্লীতে এসে কাজে যোগদান করলাম। শুরু হল কূটনৈতিক জীবন।

ভারতের প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে আমাদের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি বলে কিছু ছিল না। ইংরেজ তখন এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের যে বৈদেশিক নীতি তাদের ঔপনিবেশিক দেশগুলোরও তাই। স্বাধীনতার পূর্বপর্যান্ত ভারতে ইংরেজ সরকারের বিদেশ মন্ত্রালয় বলে বিশেষ কিছু ছিল না। ভারত পরাধীন দেশ বলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীন কিংবা পরাধীন দেশের কূটনীতিক সম্পর্ক বলেও কিছু ছিল না। বিদেশে ভারতের দূতাবাস স্থাপনের প্রশ্নটাই ছিল অবান্তর। ইংরেজের আমলে দিল্লীতে পলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট বলে একটা বিভাগ ছিল। কিন্তু সেই বিভাগটির সঙ্গে আজকের বিদেশ মন্ত্রালয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তখনকার এই পলিটিকাল বিভাগটির প্রধান কাজ ছিল ভারতের ছোটবড় নেটিভ স্টেটগুলোর সঙ্গে নরমগরম আচরণের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের প্যারা-মাউণ্ট ক্ষমতা বজায় রাখা, আর তাদের কাছ থেকে বিপুল রাজস্ব আদায় করা। আর এই বিভাগ থেকে প্রত্যেক নেটিভ স্টেটে একজন করে ইংরেজের পলিটিকাল এজেণ্ট নিয়োগ করা। এই পলিটিকাল এজেণ্ট অবশ্যই একজন শ্বেতাঙ্গ হত। এছাড়া ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে বিদেশের কয়েকটি দেশে ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা হ'ত। ভারতীয়দের বিদেশে যাতায়াতের ব্যাপারে

পাশপোর্ট ইত্যাদি দেওয়া এই বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। ইমিগ্রেশন ইত্যাদি বিষয়ও এই বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বপর্যন্ত এই বিভাগটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। তারপর ভারত স্বাধীনতা লাভ করবার অব্যবহিত পরেই এই বিভাগটি লুপ্ত হ'ল।

ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর যুগান্তকারী পটপরিবর্তন হ'ল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। দুশ' বছরের পরাধীনতার নির্মোখ খসে পড়লো তার গা থেকে। শুরু হলো "এ ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি।" উনিশ শ সাতচল্লিশে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অগণিত শহীদের রক্তে রাঙ্গা পথের দুধারে স্বাধীনতার রক্তকমল ফুটে উঠলো।

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সারা বিশ্বে প্রচারিত হ'ল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন, এই দারিদ্র্য জর্জরিত দেশকে অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্ত করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রত্যেক দেশবাসীর চাই কঠোর পরিশ্রম এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আর বিশ্বশান্তি। আমাদের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, আমাদের ফরেন পলিসি হবে আমাদের আভ্যন্তরীণ নীতিরই প্রতিফলন। বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে তিনি বললেন, আমরা কোন দেশের সঙ্গেই বৈরী মনোভাব পোষণ করি না। পররাষ্ট্র আক্রমণে আমাদের লোভ নেই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে এ দেশকে মুক্ত করতে হলে একদিকে যেমন চাই জনগণের নিরলস কর্মোদ্যম, তেমন চাই পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্য আর সহযোগিতা। তিনি আরো বললেন, ভারতের বৈদেশিক নীতির আরো একটি স্তম্ভ হলো বিশ্বশান্তির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া। একদিকে যেমন এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের হানাহানি বন্ধ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসর ক্রমশঃ সংকুচিত করে আনতে হবে। তাই ভারত কোন সামরিক গোষ্ঠিতে যোগ দেবে না। ভারতের বৈদেশিক নীতি হবে নিরপেক্ষ। এই

নিরপেক্ষ নীতি পর্য্যালোচনা করে তিনি বললেন যে ভারতের নিরপেক্ষ নীতি এই নয় যে সে ধ্রুবতারার মত জাগতিক শুভাশুভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। কোন সামরিক গোষ্ঠিতে যোগদানের প্রশ্নেই ভারত কেবল নিরপেক্ষ নীতি মেনে চলবে, আর পৃথিবীর যে-সকল দেশ ভারতের এই নিরপেক্ষতা অর্থাৎ সামরিক গোষ্ঠি থেকে তফাতে থাকবে, ভারত সেই সকল দেশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। নেহরু ভারতের এই নিরপেক্ষ নীতির নাম দিলেন 'নন-এলাইনমেণ্ট', 'নিউট্রালিটি' নয়, তিনি তখন বলেছিলেন, পৃথিবীতে আজ বড় রকমের তপ্ত লড়াই না থাকলেও তাঁর ঝুঁকি থেকে কোন জাতিই মুক্ত নয়। আর পরস্পর বিবদমান দেশগুলোর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর যে হাওয়া বইছে, তা যে কোন মুহূর্তে গরম লড়াইতে পরিণত হতে পারে, কিন্তু ভারতের এই নিরপেক্ষ নীতিতে অভ্রান্ত বিশ্বাস আছে বলেই আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ভারতের এই নীতি ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিসর কমিয়ে এনে শান্তির পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেবে। তিনি আরো বলেছিলেন যে ভারতের বৈদেশিক নীতির আর একটি বৃহৎ দিক হলো যে ভারত কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কখনো নাক গলাবে না, এবং সেই সঙ্গে অন্য কোন দেশের ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর অপচেষ্টাকেও বরদাস্ত করবে না।

ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যান্য দিকগুলো বিশ্লষণ করে এ কথা বলা হ'ল যে পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দিন আজ শেষ হয়েছে। পৃথিবীর কোন জাতিই আজ আর পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করবে না। প্রত্যেক জাতি আজ তার নিজের ভাগ্য বিধাতা হয়েই তার ভবিষ্যৎ গড়তে চায়।

নেহেরু আরো বললেন, বহু দুঃখ কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা আর গ্লানি সহ্য করে আজ ভারত তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভারত তার বহু যুগযুগান্তের সঞ্চিত গ্লানি মুছে ফেলে নতুন এক দিগন্তে পৌঁছুবার আশায় পদক্ষেপ শুরু করেছে। তার এই যাত্রাপথে ভারত স্বাভাবিক কারণেই আশা করবে যে পৃথিবীতে এখনো যে-সকল জাতি পরাধীনতার

নাগপাশে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই পাশ ছিন্ন করে নবজীবনের সূচনা করুক। তাই যে-কোন মুক্তিকামী সংগ্রামী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই দেশ ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে।

ভারত তার বৈদেশিক নীতিতে রাষ্ট্রসংঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলো। ভারত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করলো যে প্রত্যেক জাতির মন থেকে সমরচিন্তা দূর করতে হবে। কখনো বা রাষ্ট্রসংঘের সহায়তায়, আর কখনো বা বিবাদমান দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে।

রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও রাষ্ট্রসংঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও ভারত স্বীকার করেছিল। প্রয়োজন বোধে সে সকল বিভাগে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ভারতীয় কর্মী নিয়োগ করতেও ভারত সম্মত হ'ল।

পৃথিবীর অনেক দেশ ভারতের এই নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে অভিনন্দন জানালো। জাতিনির্বিশেষেই যে এই নীতির তাৎপর্য্য স্বীকৃত হ'ল তা নয়। এই নীতির বিরূপ সমালোচনাও হতে লাগলো কোনো কোনো দেশে। ভারতের নেতারা বললেন, যে-সকল জাতি আজ আমাদের বৈদেশিক নীতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছে না, সে সকল দেশকে আমাদের নীতির সারবত্তা ভালো করে বোঝাতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে বস্তুটি প্রয়োজন তা হ'ল সকল জাতির মনে বিশ্বাস উৎপাদন। কিন্তু অপরের মনে ত একদিনেই বিশ্বাসের শেকড় গাড়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত কাল এলে তবেই তা সম্ভব। সেই শুভমুহূর্তের জন্য আমাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্যধরে অপেক্ষা করতে হবে। তবে দৈবের হাতে আমরা কিছুই ছেড়ে দেবোনা। ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সে সকল দেশের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য আমাদের নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যে সকল দেশ আমাদের বৈদেশিক নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন, আর যারা এখনো জানাননি এই উভয় মনোভাবী জাতিগুলোর সকলের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

সেই সম্পর্ক গড়ে তোলা কি করে সম্ভব। অনেক রকমেই তা হয়ত সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এর প্রকৃষ্ট পন্থা হলো পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে আমাদের কুটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়—ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনস। এই সম্পর্কের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আমাদের দূতাবাস স্থাপন এবং এই দূতাবাসগুলোর কাজকর্মের নীতি নির্দ্ধা-রণের জন্য চাই দিল্লীতে বিদেশ মন্ত্রালয় স্থাপন।

তাই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিরবিচ্ছন্ন সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দিল্লীতে ১৯৪৭ সালেই গড়ে উঠল বৈদেশিক মন্ত্রালয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদেশমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। প্রশাসনিক বিভাগ ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিয়ে এই মন্ত্রালয় গঠিত হ'ল। যেমন ইওরোপ ডিভিসন, আমেরিকা ডিভিসন, কমনওয়েলথ ডিভিসন, চীন ডিভিসন, পূর্ব এশিয়া ডিভিসন, পশ্চিম এশিয়া ডিভিসন, প্রটোকল ডিভিসন, হিস্টোরিকাল এ্যাণ্ড রিসার্চ ডিভিসন, কনস্যুলার ডিভিসন লীগাল অ্যাণ্ড ট্রিটিজ ডিভিসন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মন্ত্রকের সর্বময় কর্তা হলেন বিদেশ মন্ত্রী আর তার সঙ্গে রইলেন সর্বোচ্চ সচিব যাকে বলা হল বিদেশ সচিব বা ফরেন সেক্রেটারি। তার নীচে আরো দু'জন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সচিবের পদ সৃষ্ঠি হল আর হল কমনওয়েলথ সচিবের পদ প্রশাসনিক ব্যাপারে একজন অতিরিক্ত সেক্রেটারির পদ তৈরী হল এ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন যুগ্ম সচিব নিয়োগ করা হল তাদের অধীনে রইলেন একজন ডাইরেক্টার এবং একজন বা দু'জন ডেপুটি সেক্রেটারি এবং তাদের অধীনে কয়েকজন আণ্ডার সেক্রেটারি তারপর অন্যান্য কর্মীগণ।

বিদেশ মন্ত্রালয় গঠন করা হল। যুগপৎ পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল আর সে সব দেশে ভারতের দূতাবাস বসল। কিন্তু এত বড় সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে অভিজ্ঞ কর্মী কোথায়? আর কূটনীতিবিদ দক্ষ দূতই বা কোথায়? স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস বলতে কিছু ছিল না। কাজেই

ভারতীয় সরকারী কর্মীদের এ কাজে কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না। কোন ভারতীয় ইতিপূর্বে সরকারীভাবে দৌত্যকর্মও করেননি। কিন্তু তা বলেতো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বৃটিশ আমলের বাঘা আই-সি-এস, স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে বিদেশ মন্ত্রালয়ের সর্বোচ্চ পদ সেক্রেটারি জেনারেলের পদে বহাল করা হল। অপর আই-সি এস অফিসার, এন রাঘবন পিল্লাই হলেন বিদেশ সচিব। অন্যান্য আই-সি-এস যেমন আর কে নেহেরু, বি কে নেহেরু, সুবিমল দত্ত, বিনয়রঞ্জন সেন, বি এন চক্রবর্তী, খুরচাঁদ, বিনয়কৃষ্ণ আচার্য, সমর সেন, কেবল সিং, কে পি এস মেনন প্রমুখ অফিসারগণ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এ ছাড়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মির যে সকল ভারতীয় অফিসার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আর্মি থেকে খারিজ হয়ে গেলেন, সেই সকল অফিসারদের অনেককে বিদেশ মন্ত্রালয়ে নিযুক্ত করা হ'ল। প্রাক্তন বিদেশ সচিব জগৎ মেহতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেনাদলে মেজর কিংবা কর্ণেল ছিলেন। এ ছাড়া কিছু কিছু শিক্ষক, আইনজীবী এবং ইকনমিষ্টকেও মন্ত্রালয়ের বিভিন্ন পদে বহাল করা হল। বিদেশে ভারতের প্রচারকার্য, জনসংযোগ ইত্যাদি কাজের জন্যে খ্যাতিমান সাংবাদিকদেরও ফরেন সার্ভিসে নেওয়া হল।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলোর রাজধানীতে ভারতীয় দূতাবাস খুলে গেছে। সেখানে রাষ্ট্রদূত চাই। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দূতের কাজ দিয়ে বিদেশে পাঠালেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে যারা বিদেশে গেলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ডকটর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীমতী বিজয়লক্ষী পণ্ডিত, ভি কে কৃষ্ণমেনন, জনাব আসফ আলি, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আই-এন-এতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পেনাং-এর প্রখ্যাত আইনজীবী নেদিয়ম রাঘবন এবং আনন্দমোহন সহায়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক সর্দার কে এম পানিকর এবং ডকটর তারাচাঁদ, অর্থনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট

শিল্পপতি গগনবিহারী মেহেতা, আইনজীবী এম কে চাগলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদের মধ্যে কেউ গেলেন লণ্ডন, কেউ ওয়াশিংটন আর মস্কো, কেউ বা গেলেন বন, প্যারিস, রোম, টোকিও, অটাওয়া আর ক্যানবেরা। শুরু হল ভারতের কূটনৈতিক ইতিহাস। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আরও বহু দেশের রাজধানীতে স্থাপিত হল ভারতের দূতাবাস। ইউরোপ, আফ্রিকা, দুই আমেরিকার অধিকাংশ দেশে আর এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রায় সকল স্বাধীন দেশে ভারতের দূতাবাসগুলিতে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা সগৌরবে উড়তে লাগল। এই পতাকা উড়ল অস্ট্রেলিয়া আর নিউজি-ল্যাণ্ডে, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে আর জেনিভার ইউ, এন-এর আঞ্চলিক দপ্তরে, ব্যাঙ্ককের ইউ এন দপ্তর ইকাফের শান্তিশালায়।

প্রথম কয়েক বছর ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে দৌত্যকার্য করালেও ভারত সরকার স্থির করলেন, বিদেশে দূতের কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করার জন্য ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের এই কাজে শিক্ষিত করে তোলা একান্ত অপরিহার্য। ঠিক হল যারা ইতিমধ্যে ভারতের ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেছেন তারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা মনোনীত হবেন তাদের একটা সর্বভারতীয় প্রতিযো-গিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রালয়ে যারা চাকুরি করবেন তাদের নিয়মাবলী, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, বিদেশে যাওয়া, তাদের সুযোগ-সুবিধে, তাদের অবশ্য করণীয় কর্ম, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় কতগুলো নিয়ম শৃঙ্খলার আওতায় এনে এই বিশেষ ধরণের সার্ভিসের নামকরণ হল ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস। এই বিশেষ সার্ভিস সম্পর্কে ভারতের পার্লামেণ্টে একটি বিলও পাশ হল।

ভারত সরকার স্থির করলেন, ভারতীয় ফরেন সার্ভিসের 'রিক্রুটমেণ্ট' হবে একান্তভাবে প্রতিযোগিতামূলক। ২৫ বছরের বেশি নয় এমন যে কোন ভারতীয় নাগরিক যে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হলে এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে

পারবেন। পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক—তুভাবেই হবে। তবে লিখিত পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী যদি ন্যূনতম যোগ্যতার পরিচয় দিতে অসমর্থ হন তবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য তিনি বিবেচিত হবেন না।

এও স্থির হল, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পরীক্ষা ইত্যাদির আয়োজন করবে। মৌখিক পরীক্ষাও পাবলিক সারভিস কমিশনের সদস্যগণই নেবেন। তবে কমিশন ইচ্ছে করলে বিদেশ মন্ত্রকের কোন উঁচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও এই মৌখিক পরীক্ষার সময় কমিটিতে রাখতে পারেন। ফরেন সর্ভিসের জন্য কোন আলাদা পরীক্ষা হবে না। আই-এ-এস এবং আই-এফ-এস'এর জন্যে একই পরীক্ষা থাকবে। গুণানুসারে সকল পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হলে বিদেশ মন্ত্রকে যতগুলো শূন্যপদ থাকবে সেগুলো পূরণের জন্যে তালিকার প্রথম দিকে যাদের নাম রয়েছে তাদেরই আই-এফ-এসে যোগদান করার জন্যে ডাকা হবে।

আমাদের দেশে প্রতি বছর আই এ এস এবং আই এফ এস-এ চাকুরি প্রার্থী হয়ে প্রায় আটাশ থেকে তিরিশ হাজার তরুণ-তরুণী পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে দেড়শো থেকে তু'শোর মতন আই এ এস-এ যাওয়ার সুযোগ পায়। আর দশ-বিশটি ভাগ্যবান পরীক্ষার্থী আই এফ এসে স্থান পায়। এ থেকে বোঝা যায় পরীক্ষার্থী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মেধাবী না হলে আই এফ এস-এ জায়গা পাওয়া অসম্ভব।

সফল পরীক্ষার্থীরা সত্য নিযুক্ত হয়েই ট্রেনিং-এর জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে চলে যান। এ সময় তাদের বলা হয় আই এফ এস প্রবেসনার। তিন বছর ট্রেনিং পাওয়ার পর এরা বিদেশমন্ত্রকে আণ্ডার সেক্রেটারি কিংবা অনুরূপ কোন পদে নিযুক্ত হন। অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করা ছাড়াও এই প্রবেসনারদের একটি বিদেশী ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক। নিজেদের রুচিমত যে-কোন একটি উন্নত বৈদেশিক ভাষা এরা বেছে নিতে পারেন। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করলে যে-কোন ভাষা শেখার দায়িত্ব যে-কোন প্রবেসনারের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারেন।

বিদেশমন্ত্রকে কিছুদিন কাজ করার পরেই ভারতের যে কোন দূতা-বাসে এদের বদলী করা হয়। যারা সবেমাত্র ট্রেনিং শেষ করে এসেছেন তাদের দূতাবাসের তৃতীয় সচিব হয়ে কাজ করতে হয়। ক্রমে ক্রমে তাদের পদোন্নতি হতে থাকে, যেমন আণ্ডার সেক্রেটারি থেকে ডেপুটি সেক্রেটারি ও পরে যুগ্ম সচিব, তেমনি দূতাবাসে তৃতীয় সচির থেকে দ্বিতীয় সচিব, প্রথম সচিব, তারপর কাউনসিলার, মিনিস্টার, সর্বোপরি এ্যামবেসেডর। কমনওয়েলথ দেশগুলোতে আমাদের দূতাবাসগুলোকে বলা হয় হাইকমিশন এবং দূতের পরিবর্তে তাঁদের বলা হয় হাইকমিশনার, ডেপুটি হাইকমিশনার ইত্যাদি।

আমাদের দূতাবাসে কী ধরনের কাজকর্ম হয় সে সম্পর্কে হয়ত অনেকেরই অল্পবিস্তর কৌতুহল আছে। আগেই বলেছি যে বিদেশে দূতাবাস স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের বৈদেশিক নীতির ভিত্তিতে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করা এবং সেই বন্ধন দৃঢ়তর করা। বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের কেবল এই কথাগুলো বলে বেড়ালেই ত আর বন্ধুত্ব হয় না বরং তাতে ফল উল্টো হতে পারে। কাজের মধ্য দিয়েই এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই দূতাবাসগুলিকে কতকগুলো বিশেষ ধরণের কাজ করতে হয়। কাজের শৃংখলার জন্যে দূতাবাসে কয়েকটি বিশেষ বিভাগ আছে। যেমন, রাজনৈতিক বিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, ব্যবসা-বানিজ্য বিভাগ, কনস্যুলার বিভাগ এবং প্রেস, জনসংযোগ সাংস্কৃতিক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি।

রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে প্রটোকল এবং প্রশাসনিক বিভাগও জড়িত থাকে। এই রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান কাজ হল যে-দেশে দূতাবাস অবস্থিত সেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বিজ্ঞজনের দৃষ্টি দিয়ে নিরাশক্তভাবে সেই পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করা আর বিদেশ মন্ত্রককে সেই পরিস্থিতি এবং এই বিভাগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেওয়া।

কোন দেশে হঠাৎ কোন রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটলে বা চট্ করে

কোন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে, সে সম্পর্কে সেই দেশের সরকারী প্রতিক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ মহলের এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণ জনমত এবং অপরাপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি এবং এই আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তন বিদেশ মন্ত্রককে জানাতে হয়। কোন কোন আশু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঠিক পূর্বাভাষ যদি বিদেশ মন্ত্রকে পৌঁছে দেওয়া হয় তবে তা সাদরে গ্রহণ করা হয়। আবার ভারতে যদি কোন বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় কিংবা কোন রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় কিংবা ভারতের সঙ্গে তার কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের হেরফের হয় এবং তা নিয়ে যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ পরি-স্থিতির উদ্ভব হয় সে ক্ষেত্রে দূতাবাসের রাজনৈতিক বিভাগ এই পরিস্থিতির সত্যনিষ্ঠ তথ্যাদি পরিবেশন করে ঐ দেশের বিদেশ মন্ত্রককে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখেন। বিরূপ প্রচারে যাতে ঐ দেশের বিদেশ মন্ত্রক বিভ্রান্ত না হন তাই এই ব্যবস্থা। এ ছাড়া পৃথিবীর কোন অংশে যদি শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রসংঘে এবং রাষ্ট্রসংঘের বাইরে ভারত যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাও ঐ দেশের বিদেশ মন্ত্রককে জানানো হয়। এ ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সরকারী-ভাবে কোন রাষ্ট্র সফর করলে কিংবা যে সকল দেশে ভারতের দূতাবাস রয়েছে সে সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন সুপরিচিত ব্যক্তি যদি সরকারীভাবে ভারত সফর করেন, দূতাবাসের রাজ-নৈতিক বিভাগ এই দুই দিকের সফর যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেদেশ সফর করবেন সেই দেশের বিদেশ মন্ত্রককে সফরসূচী তৈরী করতে সাহায্য করে। আপ্যায়ন, সরকারী ভোজের অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সংগে যে সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভ্রমণ করেন তাদের নানা প্রয়োজনেও রাজনৈতিক বিভাগ নানা ভাবে সাহায্য করে। অনুরূপ ভাবে যদি কোন রাষ্ট্রের কোন শীর্ষ নেতা সরকারী ভাবে ভারত সফর করে তবে সেই

সফর সার্থক করে তুলতে এই রাজনৈতিক বিভাগের বহু কর্ম সম্পাদন করতে হয়। কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রী ভারত ভ্রমনে এলে ঐ দেশে কর্মরত ভারতীয় দূত তাঁর সঙ্গে ভারতে আসেন। এ ছাড়া বিদেশ থেকে যদি কোন সংসদীয় ডেলিগেশন ভারত সফরে আসেন তখন এই রাজনৈতিক বিভাগ এই সফরের সমুদয় বন্দোবস্ত করেন, অনুরূপ কোন ডেলিগেশন যদি ভারত থেকে শুভেচ্ছা মূলক অথবা অন্য বিশেষ প্রয়োজনে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রে যান সে ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক বিভাগের সফরের প্রায় সব কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। এ ছাড়া ভারতের রাজনীতিবিদ হতে পারেন, দার্শনিক হতে পারেন, অধ্যাপক হতে পারেন, ধনবিজ্ঞানী হতে পারেন, যদি সরকারী বা বেসরকারীভাবে কোন দেশ ভ্রমণ করেন, রাজনৈতিক বিভাগ এদের ভ্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেন। অনুরূপভাবে বিদেশের যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারী বা বে-সরকারীভাবে ভারত ভ্রমণ করেন সে ক্ষেত্রেও এই বিভাগ নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে তাঁদের সহায়তা করেন। ভারত এবং অন্য কোন দেশের সঙ্গে যদি কোন প্রকার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক কিংবা সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, সে ক্ষেত্রেও এই বিভাগের অনেক দয়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।

রাজনৈতিক বিভাগের পরেই বলতে হয় কনস্যুলার বিভাগের কথা। এই বিভাগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। সর্বাপেক্ষা প্রধান কাজ হল, বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের আইনানুগভাবে স্বার্থরক্ষা করা। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কয়েক শ্রেণীর ভারতীয় দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী, যাঁরা বিদেশে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস করছেন। এঁদের সম্পর্কে কনস্যুলার বিভাগের বিশেষ কিছু করণীয় নেই। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর ভারতীয় বাসিন্দা আছেন যাঁরা বিদেশের নাগরিকত্ব না নিয়েই স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাস করছেন। এ ছাড়াও আছে দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী ভারতীয় বাসিন্দা। যেমন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কয়েক বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ ভারতীয়

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বশেষে আছে ভারতীয় গবেষক এবং পণ্যবাহী ভারতীয় জাহাজ সংস্থাগুলোর নাবিক। এইসব শ্রেণীর ভারতীয়দের সুবিধে অসুবিধে কনসুলার বিভাগের দেখাশোনা করতে হয়।

বিদেশে বসবাসকারী কোন ভারতীয় স্ত্রীপুরুষ যদি একে অপরকে বিয়ে করতে চান, তাহলে সেই বিয়ে আইনসিদ্ধ করার জন্যে কনসুলার বিভাগ এগিয়ে আসে। যদি কোন বিদেশবাসী ভারতীয় ঐ দেশের কোন ভারতীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও কনসুলার বিভাগের মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হয়। যদি কোন ভারতীয় বিদেশে কোন অশিষ্ট আচরণ কিংবা কোন অপরাধমূলক কাজের জন্যে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত হয়, সে সব ব্যাপারেও কনসুলার বিভাগের কিছু করণীয় আছে। এরকম নানা কাজ তাদের করতে হয়।

কনসুলার বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ হল, ভারত ভ্রমণে ইচ্ছুক বিদেশীদের ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া। একেই ভিসা দেওয়া বলা হয়। নেপাল, ভুটান এবং কমনওয়েলথ দেশগুলির নাগরিকদের ভারতে আসবার জন্যে কোন ভিসার প্রয়োজন হয় না। বিদেশে ভারতীয়দের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পাশপোর্ট নবীকরণের কাজও কনসুলার বিভাগকে করতে হয়। বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বদেশে কিংবা যে-দেশের সে বাসিন্দা সেই দেশে তার বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলপত্রাদির প্রামাণিকতা সম্বন্ধেও সার্টিফিকেট ইত্যাদি এই বিভাগ দিয়ে থাকে।

দূতাবাসের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান কাজ হল বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্র প্রসারিত করা।

ভারতকে একটি আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত হতে হলে আরো অনেক এগিয়ে যেতে হবে। এবং সে জন্যে চাই বিদেশ থেকে বড় বড় কারখানা তৈরীর যন্ত্রপাতি, পেট্রোলিয়াম এবং উন্নত ধরণের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল আমদানী করা। বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া এ

সকল অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিদেশ থেকে আমদানী খুব সহজ নয়। বিদেশের কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অবশ্য ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ আছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু কিছু দেশকে আমরা ভারতের টাকার বিনিময়ে দ্রব্যাদি আমদানি করতে পারি। কিন্তু যে সকল দেশে এ ধরণের বাণিজ্য চুক্তি নেই সে সকল দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ভারতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে হয়। তাই ভারতীয় পণ্যের বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং প্রসারণের প্রচেষ্টা এই বাণিজ্য বিভাগের করতে হয়।

বিদেশের আমদানীকারকদের সঙ্গে ভারতের রপ্তানীকারকদের যোগাযোগ এই বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমেই সাধারণত হয়ে থাকে। এ ছাড়া ভারত পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় যে সকল শিল্প-কারখানা তৈরী করেছে, সে সকল কারখানা স্থাপনের ব্যাপারেও দূতাবাসের বাণিজ্য বিভাগের অনেক কিছু করণীয় আছে।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগটি দূতাবাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারত সরকারের ক্রিয়াকর্মের প্রচার এই বিভাগের সর্বপ্রথম কাজ। এ ছাড়া ভারতীয় সংবাদ এবং ভারত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রচারও এ বিভাগের দায়িত্ব! ভারত সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী বিদেশীদের জন্যে এই দূতাবাসের একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনাও এই বিভাগের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় নেতাগণ বিদেশ সফরের সময় প্রয়োজনবোধে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন এই বিভাগকেই করতে হয়। তাছাড়া বিদেশের টেলিভিশন এবং রেডিও ইণ্টারভিউর ব্যবস্থাও এই বিভাগের প্রচেষ্টায় আয়োজিত হয়ে থাকে।

বিদেশী সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে সংবাদ বড় একটা প্রকাশিত হয় না। ভারতে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে তবে সে সংবাদ অবশ্য অবিলম্বেই সংবাদপত্রগুলোতে ছাপা হয়। কিন্তু সে সব ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। তাই ভারতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে

সম্পর্কে বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলোকে ওয়াকিবহাল রাখার জন্য দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রক প্রতিদিন রেডিও টেলিকমিউনিকেশনের সাহায্যে প্রত্যেক দূতাবাসে সংবাদ প্রেরণ করে। দূতাবাসের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ভারত থেকে প্রেরিত সংবাদগুলো প্রতিদিন সাইক্লোস্টাইল করে দূতাবাসের অভ্যন্তরে, সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রে, অন্যান্য বৈদেশিক দূতাবাসে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজের লাইব্রেরী ও পাঠাগারে, যে দেশে ভারতীয় দূতাবাস অবস্থিত সেই দেশের বিদেশ-মন্ত্রককে এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরগুলোতে এবং সেই দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বাসিন্দাদের কাছে পাঠান হয়। এ জাতীয় নানা কাজ এই বিভাগকে করতে হয়।

আমাদের দেশে আমাদের দূতাবাসগুলোর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রায়ই বিরূপ মনোভাব দেখা যায়। ভারতীয় সংসদের সদস্য থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় সংবাদপত্র এবং সাধারণ মানুষও আমাদের দূতাবাসগুলোর কাজকর্মের কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। আক্রমণটা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ হয় এই তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের বিরুদ্ধে।

বলতে পারি এই তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগই ভারতের নেতাদের আক্রমনের প্রধান লক্ষ্যস্থল। আক্রমনের খাঁড়াটা এই বিভাগের কাঁধ লক্ষ্য করেই যেন সব সময়ই উঁচিয়ে আছে। তাদের মতে এই বিভাগের তথাকথিত অকর্মন্যতার জন্যেই ভারতের প্রকৃত ভাবমূর্তিটা বিদেশীদের চোখে উজ্জল হয়ে উঠছেনা। এছাড়া এই বিভাগের 'অপদার্থতা' ও গাফিলতির দরুণ ভারতের বৈদেশিক এবং অন্যান্য নীতি যথেষ্ট সমাদর লাভ করছে না। ফলে ভারতের ভাবমূর্তি প্রতিপদে চুর্ণবিচুর্ণ হচ্ছে।

দূতাবাসের তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের বিরুদ্ধে এই সকল কঠিন এবং নির্মম সমালোচনার সবটাই যে ভিত্তিহীন এমন কথা আমি বলতে চাইনা। তবে এ সকল অভিযোগ যে অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচারের অপ্রতুলতা নিয়ে সমালোচনায় যারা মুখর, তারা একটি কথা ভুলে যান যে ভারতের

এক্সটারনাল পাবলিসিটি বা বিদেশে ভারত সম্পর্কে প্রচারের মূলগত উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয় এই প্রচারের মৌল উদ্দেশ্য একটাই। যথা, বিদেশে ভারতের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা, ভারতের ইতিহাস, তার অতীত গৌরব, তার বিজ্ঞান সাধনা, প্রাচীন এবং বর্তমান চিরায়ত ও লৌকিক সাহিত্য, যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম এবং আধ্যাত্ম চিন্তার অভ্যুদয়, প্রাচীন ও বর্তমান সঙ্গীত, চারুকলা এবং সর্বোপরি জনগণের আশা-আকাঙ্খা, এক কথায় ভারতের অতীত এবং আধুনিক কালের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্পর্কে বিদেশীদের যথাসম্ভব সচেতন করে তোলা। কিন্তু অতি প্রচারের রথ ছুটিয়ে রাতারাতি বিদেশীদের ভারতবন্ধু কিংবা ভারত প্রেমিকে পরিণত করা সম্ভব নয়। একথা ধরে নিতে হবে যে বিদেশের জনগণ স্বভাবতই ভারত সম্পর্কে অজ্ঞ। এদের মধ্যে আবার অনেকেই ভারত সম্পর্কে নিতান্তই আজগুবী ধারণা পোষন করে।

বিদেশে দীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজের ভারত সম্পর্কে দুরভিসন্ধি পরায়ন অপপ্রচারের ফলে এখনো বহু দেশের এক শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল যে ভারত একটা অর্দ্ধসভ্য দেশ। ভারতবাসীদের কোন উচ্চস্তরের সংস্কৃতি নেই। তারা সাপ আর বাঘ নিয়ে ঘর করে, তারা বাঁশী বাজিয়ে বিষধর সাপের খেলা দেখায় আর 'রোপট্রিক' জাতীয় ভানুমতীর খেল দেখাতে অভ্যস্ত। তারা এও মনে করে যে ঠগ প্রবঞ্চক জাতীয় সাধু আর ফকিরের ভীরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা দায়।

ভারত সম্পর্কে একশ্রেণীর বিদেশীদের এই জ্ঞানের বহর মাটি চাপা দিয়ে ভারতের প্রকৃত স্বরূপ তাদের সামনে তুলে ধরতে হলে প্রচুর সময় আর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

এ ছাড়া আরো একটা কথা। যে-সকল বিদেশী ভারত সম্পর্কে এ হেন অবাস্তব ধারণা পোষণ করে না তাদরেই বা ভারত সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবার প্রত্যাশা আমরা করবো কেন? এ বিষয়টা একটু অন্যভাবে চিন্তা করা যাক। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার একটি

দেশ—ধরা যাক ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। আমাদের যেমন ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস-এ দূতাবাস আছে, তেমনি দিল্লীতে ভেনেজুয়েলার দূতাবাসও রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে ভেনেজুয়েলা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। এ দেশের তৈলসম্পদ অপরিসীম। তাই সেই দেশের জনগণ দারিদ্রমুক্ত। দিল্লীতে ভেনেজুয়েলার দূতাবাসে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আছে। সেই দূতাবাসের তথ্য ও জনসংযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে সুদক্ষ পরিচালক আছেন—এ কথা মনে করাই স্বাভাবিক। কারণ, কোন দেশের সরকার সেই দেশের রামা শ্যামাকে দিয়ে তাদের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিস চালান না। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে নেওয়া হয়। এই দূতাবাসের কর্মীগণ নিরলসভাবে তাদের দেশ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের দেশের কটা লোক ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। সাধারণ লোকের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের শিক্ষিত সমাজের ক'জন ভেনেজুয়েলার দূতাবাসের প্রচার কার্যের মাধ্যমে সেই দেশ সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখেন বা রাখবার উৎসাহ প্রকাশ করেন। তখনই এই সঙ্গে এও বলতে পারি আজ যদি ভেনেজুয়েলার দিল্লীতে অবস্থিত দূতাবাসের প্রচার যন্ত্র আরো জোরদার করা হয়, তাদের প্রচার কার্যের জন্য বর্তমান ব্যয়ের উপর বাজেটে অর্থের পরিমান বাড়িয়ে দশগুন করা হয় তা হলেই কি ভারতবর্ষের জনগণ রাতারাতি ভেনেজুয়েলা প্রেমিক হয়ে উঠবে? অথচ প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে ভেনেজুয়েলা কখনই একটি উপেক্ষনীয় দেশ নয়।

বৃটেন আমাদের কাছে বহু পরিচিত দেশ। আমাদের দেশে বৃটেনের প্রচার যন্ত্রও বেশ সবল। এ ছাড়া আমাদের দেশের কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র ভারতে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে খুবই তৎপর। এ সকল সুযোগ সুবিধে থাকা সত্বেও আমাদের বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত দৈনিক কিংবা সাময়িক পত্র পত্রিকায় বৃটেন সম্পর্কে কতটুকু সংবাদ প্রচারিত হয়। বলতে গেলে এ সকল সংবাদ-

পত্রে বৃটেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর খবর ছাড়া আর বিশেষ কোন সংবাদ থাকেনা যদিনা বৃটেনে কোনো চমকদার কিংবা চটকদার ঘটনা ঘটে। বিলেতে স্থায়ী বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর ওখানকার জনগণের বিদ্বেষপ্রসূত অবাঞ্ছিত ঘটনার সংবাদ অবিশ্যি মাঝে মাঝে আমাদের দেশের সংবাদপত্রে স্থান পায়। কিন্তু সেটাত হলো ইংরেজিতে যাকে বলে নিগেটিভ পাবলিসিটি। সেটাত নিন্দাবাদ। ভারতে অবস্থিত বৃটেনের প্রচার যন্ত্র শত চেষ্টা করেও এই সংবাদ প্রচারে বাধা স্থষ্টি করতে পারেনা। কিন্তু তা নিয়ে ত বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতে বৃটেনের তথাকথিত বিফলতা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেনা আর বিলেতের সাধারণ মানুষ এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না।

ভারত স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই 'ইউ, এস, আই, এস'এর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচারের সেকি উন্মাদনা। ইউসিস-এর প্রচার যন্ত্রের সব কটি মিডিয়া মার্কিনী প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বেশ কয়েক বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কয়েক বছর পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল যে কেবল মাত্র প্রচারের জোরেই কোন একটা দেশের বন্ধুত্ব বা আনুগত্য লাভ করা যায়না। তাদের হুঁস ফিরে আসতেই প্রচারের স্রোত মন্দিভূত করতে বাধ্য হল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রচার কার্যের ব্যর্থতার দরুণ আমেরিকান সেনেটে ত আমেরিকান সরকারের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়নি।

কিন্তু আমাদের দেশের নেতাদের মুখে কিংবা অন্যান্য ভি আই পি গণ বিদেশ সফরে গিয়ে দেশে ফিরে এসে এই তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের নিন্দাচর্চ্চায় মুখর হয়ে উঠেন কেন? সংসদের বিরোধীদলের সভ্যগণও এই বিভাগের কাজকর্মের উপর নির্মম কটাক্ষ হানেন কেন?

এক কথায় এই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া বোধকরি সম্ভব নয়। তবে কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সংসদের বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন সরকারের বিরোধিতা

করবেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তা না করলে অপজিশন কথাটাই অর্থহীন হয়ে যায়। বিদেশে ভারতের দূতাবাসগুলোর কাজ কর্মের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি যে নেই তা নয়। কিন্তু অনেক সময় সরকারকে অসুবিধায় ফেলতে বিরোধীদলের সভ্যগণ তিলকে তাল করে জনসাধারণের কাছে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। তবে নীতিগতভাবে বিরোধীদলের নেতারা যদি দূতাবাসের কাজকর্মের নিন্দা করেন তবে তা সরকারকে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু অনেক সময় এই নিন্দাচর্চাটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কোন গুরুতর সমস্যা কিংবা মনোভাবের বহির্বিশ্বে যথাযথ প্রতিফলনে দূতাবাসের ব্যর্থতার সমালোচনা না হয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধরা যাক আমাদের সংসদের বিরোধী দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কোন একটা দেশে সরকারী কিংবা বে-সরকারী প্রয়োজনে পর্য্যটনে গেছেন। কোন কারণে তিনি যদি তার খাওয়া থাকা আরাম আয়েস কিংবা অন্য কোন বিষয়ে তাঁর এ ধারনা জন্মায় যে তিনি সেখানকার ভারতের রাষ্ট্র-দূত কিংবা দূতাবাসের অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মীবৃন্দ তার প্রাপ্য মর্য্যদা দিতে অক্ষম হয়েছেন তখন তিনি হয়ত সাময়িকভাবে দূতাবাসের প্রতি রুষ্ট হতে পারেন। যদিও এরূপ ঘটনা খুবই বিরল। কিন্তু এই বিরোধী দলের নেতা অনেক সময়েই সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখেননা। দেশে ফিরে এসে বিদেশমন্ত্রককে সংসদে আক্রমন করেন এবং একথা বলতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেন না যে আমাদের দূতাবাসগুলো কোন কাজকর্ম করেনা। বিদেশে দূতাবাস রাখা মানে অযথা কোটি কোটি টাকা নর্দমায় ফেলে দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় কোন মন্ত্রী যদি মনক্ষুন্ন হন তবে তিনি হয়ত তাঁর মনকষ্টের কারণটি কেবল মাত্র বিদেশ মন্ত্রালয়ের গোচরে আনবেন। পার্লামেণ্টে প্রকাশ্যে দূতাবাসের কাজকর্মের নিন্দাধ্বনী তুলবেননা। কারণটি সহজেই অনুমেয়।

দূতাবাসের কোন বিভাগের কাজকর্মই যে সমালোচনার উর্দ্ধে একথা আমি বলছিনা। সামান্য রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং তা থাকবেও

তাই এই সমালোচনা যে অকারণ তা নয়, সরকারের কোন দপ্তরে ত্রুটি-বিচ্যুতি না আছে ? তবে অনেক ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা যায় যে যতটা নিন্দা ভারতের দূতাবাসগুলোর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের প্রাপ্য, প্রায়শই প্রাপ্যের অতিরিক্ত কলঙ্ক তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী (ক্যাবিনেট মিনিষ্টার নন) লণ্ডনে এলেন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কোন একটা গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে। যেদিন তিনি লণ্ডনে পদার্পণ করলেন তার পরের দিন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে সেই সময়কার হাইকমিশনারের কাছে সরাসরি অভিযোগ করলেন, 'এ কেমন কথা ! আমি ভারতের একজন মিনিষ্টার। কাল এখানে এলাম, অথচ আজকের 'টাইমস' কিংবা 'গার্ডিয়ান' বা অন্য কোন পত্রিকায় আমার আসবার সংবাদটুকু পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।'

হাইকমিশনার একটু মুচকি হেসে বললেন, 'তাই ত, আচ্ছা আমি জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তাকে ডেকে কারণটা জানবার চেষ্টা করছি। আপনি হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাকে জানাবেন। আমি আমার অফিসারকে আপনার হোটেলে পাঠিয়ে দেব।'

অধিকর্তা যথাসময়ে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মন্ত্রী মহাশয় কোন প্রকার সৌজন্য না দেখিয়েই সরাসরি অধিকর্তাকে চার্জ করলেন, 'আমার এখানে আসার সংবাদ লণ্ডনের কাগজে প্রকাশিত হয়নি কেন তার কৈফিয়ৎ দাও।'

অধিকর্তা বললেন, 'এ সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার বিলক্ষণ কারণ আছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সংখ্যা এখন বত্রিশ। এ-সব দেশ থেকে রোজ ডজনখানেক মিনিষ্টার লণ্ডনে আসেন। এঁদের আসা-যাওয়ার সংবাদ যদি লণ্ডন টাইমস-এ প্রকাশ করতে হয় তবে তাতেই একটি পাতা ভরে যাবে। আরো একটা কথা বিলেতের সংবাদপত্রের পাঠক বৃটেনের জনগণ। তাই বিলেতের সংবাদপত্রে কেবলমাত্র সে সকল

সংবাদই ছাপা হয় যে সম্পর্কে বৃটেনের জনগণের উৎসাহ আছে। তবে আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে এসেছেন তা যদি এখানকার প্রেসকে জানাতে চান তবে আমি আজই এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কাল সকালে লণ্ডনের সমস্ত সংবাদ-পত্রের প্রথম পাতায় আপনার ফোটো এবং এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার বিবৃতি প্রকাশিত হবে।

মন্ত্রী মহাশয় একটু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'তা কী করে সম্ভব? আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তা প্রকাশ্যে বলা একেবারেই সম্ভব নয়।'

তখন সেই অধিকর্তা বললেন, তাহলে আপনি আর একটা কাজ করুন। আপনি ত সেভয় হোটেলে আছেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই কার্যরত একজন ট্র্যাফিক পুলিশ দেখতে পাবেন। আপনি সরাসরি তার গালে একটা চড় মারুন, দেখবেন কাল সকালে লণ্ডনের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে।

মন্ত্রী মহাশয় এই রসিকতা সহ্য করতে পারলেন না। এই অধিকর্তার বিরুদ্ধে হাইকমিশনারের কাছে অভিযোগ করলেন। তারপর দেশে ফিরে এসে দূতাবাসের প্রচার বিভাগের 'অকর্মণ্যতা' নিয়ে নানা মহলে অভিযোগ করে বেড়ালেন।

আর একটি ঘটনা। আমি যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন আগে অষ্ট্রেলিয়া ভিয়েৎনাম যুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সৈন্য পাঠিয়েছে। এই সৈন্য পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে ভারতের সংসদে হুলুস্থুল ব্যাপার। সরকার পক্ষ এবং বিরোধীদলের সংসদ সদস্যগণ একযোগে গলা মিলিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের এই 'অপকর্মের' বিরোধিতা করে সংসদে তুমুল হট্টগোল বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু তাদের এই প্রচণ্ড কলরব দু'চার দিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এলো। উপর্যোপরি তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে তখন খরার প্রেতনৃত্য চলেছে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে মজুত খাদ্য

নেই। কাজেই বিদেশ থেকে কয়েক লক্ষ টন খাদ্যশস্য অবিলম্বে সংগ্রহ করতে না পারলে কয়েক লক্ষ লোককে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবেনা। এ সংকট কালে যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় দেশ তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দিয়ে ভারতকে এই সংকট মোচনে সাহায্য করতে পারে অষ্ট্রেলিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। অনন্যোপায় হয়ে ভারতের একজন ক্যাবিনেট মিনিষ্টার ছুটে এলেন অষ্ট্রেলিয়ার খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায়। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতের একজন মিনিষ্টার অষ্ট্রেলিয়ায় আসবার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় বিশেষ করে সিডনী এবং ক্যানবেরার প্রতিপত্তিশালী সংবাদ পত্রগুলো এ নিয়ে নানা রকম কটুকাটব্য প্রকাশ করতে শুরু করে দিল। সিডনীর একটি সংবাদপত্র এই মন্তব্য করলো, "খাদ্যের সন্ধানে ভারত পিপিলিকাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। তা ভালই করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার নিয়ে ভারত তার পার্লামেন্টে আমাদের শ্রাদ্ধশান্তি করে আবার গলবস্ত্র হয়ে আমাদের দেশেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আসছে কেন? এটাই কি ভারতের বৈদেশিক নীতি? ব্রিসবেনের একটি দৈনিক বললো, "মাদার ইণ্ডিয়া, প্লিজ পুট ইয়োর হাউস ইন অর্ডার ফাষ্ট বিফোর ইউ পয়েণ্ট ইয়োর ফিংগার এ্যাট আদার্স।"

এ রকম একটা ভারতবিরোধিতার তাপপ্রবাহ যখন অষ্ট্রেলিয়ার জনগণের মনের মধ্যে এবং ও দেশের সংবাদপত্রগুলোর অফিসে বয়ে চলেছে ঠিক সেই উত্তপ্ত হাওয়ার মধ্যে আমাদের মিনিষ্টার মহোদয় সিডনী বিমান বন্দরে এসে পৌঁছুলেন।

এয়ারপোর্টে একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা আমাদের দূতাবাস থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু বিমানবন্দরে উপস্থিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের হাত জোড় করে বললাম, ভাইসকল, তোমরা মিনিষ্টার সাহেবের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থেকো।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তারা পালন করেছিল। ভিয়েৎনামে অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে ভারতের অপ্রসন্ন মনোভাবের কারণ

জিজ্ঞাসা করে মিনিষ্টার মহাশয়কে একটি প্রশ্নও করা হ'ল না। টেলি-ভিশন ইণ্টারভিউটাও সে দিন বিকেলে মিনিট খানেকের জন্যে দেখানো হ'ল। পরদিন সংবাদপত্রে খুব ছোট করে মন্ত্রীমহোদয়ের অষ্ট্রেলিয়ায় আগমন সংবাদ বের হলো।

পরদিন দূতাবাসে গিয়ে শুনলাম তার আগমনের সংবাদ প্রকাশের স্বল্পতায় তিনি চটে লাল হয়ে আছেন এবং আমাকে এর কৈফিয়ত তলব করার জন্যে শীঘ্রই ডেকে পাঠাবেন।

যথা সময়ে রাষ্ট্রদূতের ঘরে আমার ডাক পড়লো। মিনিষ্টার মহাশয় কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি বললাম, আমি এর কৈফিয়ৎ নিশ্চয়ই দেব। তবে তার পূর্বে আপনার এখানে আসবার আগে যে সকল মন্তব্য এখানকার সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল তার ক্লিপিংগুলো একবার পড়ুন।

এই বলে ক্লিপিংগুচ্ছ তার হাতে গুঁজে দিলাম। তিনি কোন রকমে সে গুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমি এগুলো প্রকাশ বন্ধ করতে পারলে না কেন? তুমি তাহলে এখানে আছ কি করতে। তুমি সরকার থেকে মাইনে পাও না? একগাদা ফরেন এলাউন্স কি তোমাকে অমনি অমনি দেওয়া হচ্ছে? বেশত মার্সেডিস বেঞ্জ গাড়ী হাকিয়ে বেড়াচ্ছ। ঠাটবাট ত দেখছি সবই ঠিক আছে। অথচ কাজের বেলায় ঢু ঢু।

মিনিষ্টার সাহেবের এই অশোভন কটুক্তিতে পিত্তি জ্বলে গেল। ক্রোধ সংবরণ করে বললাম, আপনার অভিযোগ কিন্তু আমি মেনে নিতে পারলাম না। তাহলে শুনুন, আপনি আসবার আগে এখানকার পত্র-পত্রিকায় যে কটুকাটব্য বেরিয়েছিল আজ তার চতুর্গুণ আক্রমণ হোত আপনার উপর এবং আমাদের দেশের উপর যদি না এ বান্দা এখানে থাকতো। আপনি হয়ত জানেন না যে আমারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তারা তাদের কলম গুটিয়ে নিয়েছে। আমার অনুরোধেই টেলিভিসন চ্যানেলগুলো আপনার সঙ্গে তাদের প্রশ্নোত্তরগুলো টেলিভাইজ করেনি। এই আমার কৈফিয়ৎ। তবে আপনি যদি একটা প্রেস কনফারেন্স

চান, আমি আজই তার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই কনফারেন্সের প্রশ্নোত্তর কালকের সংবাদপত্রগুলোতে যা বেরুবে তার দায়-দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার। বলুন আমি কি করবো?

মন্ত্রীমহাশয় রাষ্ট্রদূতের মুখের দিকে চাইলেন। বোধকরি এ প্রস্তাবে রাষ্ট্রদূতের সমর্থন আছে কিনা তা আন্দাজ করে নিতে। রাষ্ট্রদূত মন্ত্রী মহাশয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আমার মনে হয় এই প্রেস কনফারেন্সের ঝুঁকি এই মুহূর্তে না নেওয়াই ভালো। আলতু ফালতু কথা কাগজে বেরুলে ফেডারেল সরকার হয়তো আমাদের সম্পর্কে আরো বায়াস হয়ে যেতে পারে। প্রেসকে এখন আর না ঘাটালেই বোধকরি যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে। ফেডারেল সরকার যদি খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তা হলে তখন প্রেস কনফারেন্সের কথা ভাবা যাবে।

রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে মন্ত্রীমহাশয় একটু হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। আমার প্রতি একটা কটাক্ষ হেনে বললেন, আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো।

আমি জানি এই মন্ত্রীমহাশয়ের চেষ্টায় নয়, আমাদের রাষ্ট্রদূতের অসাধারণ বাকপটুতার গুণে ফেডারেল সরকার কয়েক হাজার টন গম অবিলম্বে ভারতে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তা হলে হবে কি। এই মিনিষ্টার সাহেব দেশে ফিরে এসে নিজের ব্যাণ্ড ওয়াগনে নিজেই চড়ে বসলেন আর ঢক্কানিনাদে নিজের সাফল্যের (?) বার্তা প্রচার করে দিল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিলেন। তাতে দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি বিশেষ বিশেষ মহলে আমাদের একস্‌টারনাল পাবলিসিটি যে নিতান্তই 'অপদার্থ' তা বলতে ভুললেননা।

উনিশশো বাষট্টি-তেষট্টি সালের কথা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি পরাধীন দেশের স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ট্রাস্টিশীপ কাউনসিলএ একটি প্রস্তাব পেশ করবে স্থির হ'ল। এই প্রস্তাবটি যাতে সংখ্যাধিক্য ভোটে কাউনসিলে গৃহীত হয় সেজন্যে বিভিন্ন দেশে আমাদের কূটনীতিক তৎপরতা চলতে লাগলো। যাতে করে সে-সব

দেশের ভোটগুলো আমাদের প্রস্তাবের অনুকুলে আসে। এ সম্পর্কে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন ঘনাতে এলো তদানীন্তন ঘনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেণ্ট কোয়ামে ইনক্রুমার মন ভেজাতে।

আগেই বলেছি যে ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর ইনক্রুমার ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবে বেশ খানিকটা চিড় ধরেছিল। নেহেরু ইনক্রুমার এই ভাবান্তর খুব ভরসা করেই বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই ডেলিগেশনটিকে আক্রায় পাঠালেন ইনক্রুমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাদের দলে টানতে। অনিবার্য কারণেই আলাপ আলোচনাটা হয়েছিল ইনক্রুমার প্রেসিডেণ্টস্ প্যালেসের গোপন কক্ষে। সংবাদিকদের প্রবেশাধিকারের প্রশ্নই ওঠেনা। এমনকি ঘনার বিদেশমন্ত্রী পর্য্যন্ত এই আলোচনায় যোগ দিলেন না। আলোচনান্তে প্রেসিডেণ্টের তথ্য দপ্তর থেকেও কোন প্রেস রিলিজ ইস্যু করা হোল না, তাই সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রে এ বিষয় নিয়ে একটি কথাও বেরুলনা। দূতাবাস থেকে অবিশ্যি একটা প্রেস রিলিজ আক্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো তা স্পর্শও করলোনা। কিন্তু হলে হবে কি? পরদিন সকালে দৈনিক সংবাদপত্রে এই ডেলিগেশনের আক্রায় আগমন এবং তাদের প্রেসিডেণ্ট ইনক্রুমার সঙ্গে মিটিং-এর কোন সংবাদ প্রকাশ না হওয়ায় আমাদের ডেলিগেশনের নেতা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। তিনি আমাদের রাষ্ট্রদূতকে এ বিষয়ে কটাক্ষ করতেও কসুর করলেন না। স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রদূত আমাদের তথ্য বিভাগের উপর বিরক্ত হয়ে এই ডেলিগেশনের সদস্যদের সামনেই আমার কৈফিয়ৎ চেয়ে বসলেন।

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে বললাম, ইনক্রুমার সঙ্গে এই ডেলিগেশনের আলাপ আলোচনার সংবাদ যে এখানকার সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি তা আমাদের দিক থেকে মঙ্গলের কারণ বলেই আমি মনে করি। ডেলিগেশনের নেতাকে উদ্দেশ করে বললাম, আপনারা এখানে কেন এসেছেন

তা আমি জানি। কিন্তু ইনক্রুমার সঙ্গে আপনাদের কি আলোচনা হয়েছে তা আমি জানিনা, আর তা আমার জানবার কথাও নয়। ধরে নিলাম আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ইনক্রুমার প্রতিশ্রুতি আপনারা পেয়েছেন। কিন্তু সেই গোপন প্রতিশ্রুতি সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলে তার গোপনীয়তা আর থাকে কি? আর তার মূল্যই বা তাহলে রইলো কোথায়। আর প্রেসিডেন্ট ইনক্রুমা যদি এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে থাকেন বা কোনরকম টালবাহানা করে থাকেন, সেটা যে এদেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রেসে ছাপা হবে, আপনারা তা আশা করেন কি করে? আর তাতে ত উল্টো ফল হবে। সেটা ত নেগেটিভ পাবলিসিটি হয়ে যাবে। তাহলে আপনারাই মুস্কিলে পড়বেন। আমার ত মনে হয় এখানকার প্রেস এ বিষয়ে চুপচাপ থেকে ভালই করেছে।

ডেলিগেশনের একজন সদস্য হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের এখানে আসবার সংবাদটা পর্য্যন্ত ছাপা হ'লনা কেন?

আমি বললাম, ঐ একই কারণে। ওটা বেরুলেই নানা মহলে নানা রকমের জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যেত। আমাদের উপর বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন ইনক্রুমার চেলাচামুণ্ডারা যারা সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে তারা ঝোপবুঝে কোপ মেরে ইনক্রুমাকে আগরম বাগরম পরামর্শ দিয়ে সবকিছু ভণ্ডুল করে দিতে পারতো। আমার কৈফিয়ৎ আমি দিলাম, এর পর আপনাদের যা করণীয় তা করবেন!

যাই হোক, এ নিয়ে আর বিশেষ কোন উচ্যবাচ্য হ'লনা। ডেলিগেশনটি ঘনা ত্যাগ করার পর রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন. এদের চেচামেচিতে আমি ত রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তুমি যে এদের নিরস্ত করতে পেরেছো সে জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমি বললাম, দেখুন স্যার, এখানেও সেই আত্মপ্রচারের কমপ্লেক্স। কিন্তু মোহগ্রস্থহয়ে বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেললে, প্রচার যে অনেক সময় বিপরিৎ প্রচারে পর্য্যবসিত হয় সেই জ্ঞানটুকু এদের কাছ থেকে আশা করাইত স্বাভাবিক।

রাষ্ট্রদূত একটু চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা বলত আমাদের ছেলেবেলার পাঠ্য পুস্তকে ক'টা সেনস্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে ?

ভাবলাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

তবু উত্তর একটা দিতেই হবে। তাই বললাম, যতদূর মনে আছে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না হে উত্তরটা ঠিক হ'লনা। ঐ পাঠ্য পুস্তকগুলোতে একটু ভুল আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ নয়, ছয়।

জিজ্ঞাসা করলাম এই ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের নামটি কি ?

তিনি বললেন, ওটা হল কমনসেনস্।

তবে ওটা সকলের থাকেনা। তাই লেখক নিজেকে সেফ সাইডে রেখে কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেন।

বললাম. আপনি আমার একটা ভ্রম সংশোধন করে দিলেন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি পাইপে অগুন ধরাতে ধরাতে বললেন, ফরেন সার্ভিসে এসেছো। তোমার বয়েসও খুব বেশী হয়নি। চোখ কাণ খোলা রেখো, অনেক কিছু শিখতে পারবে।

আমি বললাম, স্যার আরো একটা শিক্ষা লাভ করেছি। যে-সকল মন্ত্রীমহোদয়গণ কিংবা ভারতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ যাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় আত্মপ্রচারে বিফল হয়ে চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না, তারা বিদেশে এলেই তাদের এই ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। সংযম বোধ যেন একেবারেই হারিয়ে ফেলে।

তাই এ-ধরণের অভিযোগ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আত্ম-প্রচারে কোন রকম বাধা উপস্থিত হলেই অনেক মন্ত্রীকেই অত্যন্ত বিরক্ত হতে লক্ষ্য করেছি এবং তথ্য বিভাগকে গালমন্দ করতে শুনেছি। এ সকল মন্ত্রী ভুলে যান যে দূতাবাসে তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগের কাজ

কোন ব্যক্তির প্রচার নয়, ভারত সরকারের প্রচারের জন্যেই সেই বিভাগ কাজ করে যাচছে।

দূতাবাসের কনস্যুলার বিভাগের কাজকর্মের কথা সাধারণ ভাবে আগেই বলেছি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কাজগুলো শুনতে যত সহজ মনে হয়, সেগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করা তত সহজ নয়। তাই কনস্যুলার বিভাগের প্রায়ই বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

যে-সকল দেশে ভারতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেই অনুপাতে সমস্যাগুলো ও হ্রস্ব। কিন্তু ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া এবং আরব দেশগুলোতে যেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা খুব বেশী সে সব যায়গায় কনস্যুলার বিভাগকে নিত্যনুতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে দেশেই থাকুকনা কেন ভারত সন্তানেরা কখনই সে-সকল দেশে স্থানীয় অধিবাসীদের রুচিবোধ এবং তাদের জীবনযাত্রার নিয়মশৃঙ্খলার সঙ্গে কখনই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেননা। ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অনেক সময় অল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত ভারতীয়রাই গোলযোগ সৃষ্টি করত। একথা বলাই বাহুল্য যে বিদেশের রাস্তাঘাট খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সে দেশের অধিবাসীরা পারত পক্ষে রাস্তায় কুটোটি পর্যন্ত ফেলেনা। কিন্তু স্বদেশে আমরা রাস্তাঘাট গুলোকে আবর্জনার স্তূপে নরকে পরিণত করে রাখি। রাস্তায় চলতে চলতে যত্রতত্র থুথু ফেলি, পানের রসে বাড়ীর দেয়াল চিত্রিত করি। রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করিনা। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে গিয়েও এই নোংরামির প্রবণতা ত্যাগ করতে পারেন না। যত্রতত্র থুথু ফেলা, অনাবশ্যক কাগজের টুকরো রাস্তায় কিংবা ফুটপাতে নিক্ষেপ করা অনেক দেশেই আইনত অপরাধ। এই বিধিনিয়ম ভারতীয়রা প্রায়ই লঙ্ঘন করেন। ফলে পুলিশ এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে জরিমানা হয় কিংবা কখনো কখনো জেল খাটতে হয়। আর তখনই কনস্যুলার বিভাগের সমস্যা উপস্থিত।

যাতে লঘুদণ্ড দিয়ে ঐ অপরাধীটিকে পুলিশের কবল থেকে মুক্ত করা যায় তার জন্যে দূতাবাসের কর্মীদের ছুটাছুটির অন্ত থাকে না।

এ ছাড়া আছে ছোটখাট চুরি। বড় বড় দোকানে গিয়ে শপ লিফটিং এর অভিযোগ ও কনস্যুলার বিভাগকে সামাল দিতে হয়। তাছাড়া আছে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি যার পরিণাম কখনো কখনো হাতাহাতি। আর প্ররোচনা যদি সংযমের বাঁধে ফাটল ধরায় তবে মাথা ফাটাফাটি। এ সব ক্রিয়া কলাপ ভারতীয় ভার্সাস স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। তখনই ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে ওঠে। আর তার দুর্ভোগ ভুগতে হয় এই কনস্যুলার বিভাগকে। কখনো সখনো বিদেশে বিদেশীর হাতে কোন ভারতীয় নাগরিকের খুন হওয়ার সংবাদও আসে। তখন এই বিভাগের চোখ কপালে উঠে যায়। স্বর্গে গিয়ে নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করা এক ভয়ানক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কোন গতিকে যদি মৃত ব্যক্তির আইডেনটিফিকেশন সন্দেহাতীত রূপে প্রমানিত হয় তখন আসে ভিন্নতর সমস্যা। অন্ত্যেষ্টির খরচ তার মধ্যে একটি। ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যদি সেখানে কেউ থাকে অথবা তাঁর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যদি কেউ এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে এগিয়ে না আসে তখন এই কনস্যুলার বিভাগকেই সরকারী অর্থে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। বিদেশে স্বাভাবিক কারণে কোন ভারত সন্তানের মৃত্যু হলেও মাঝে মাঝে এ সকল সমস্যা দেখা দেয়। তারপর বিদেশে স্বল্পকালের জন্য ভ্রমন-রত কোন ভারতীয়ের বিদেশে হঠাৎ মৃত্যু হলে হয় তার মরদেহ বিমানযোগে দেশে ফেরৎ পাঠানো হয় নয়ত ওখানেই অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা এই কনস্যুলার বিভাগকেই করতে হয়।

এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে। যে সকল ভারতীয় বিদেশে অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে আছেন তাদের মধ্যে অনেকেই কোন উইল করার ধার ধারেন না। ফলে সেই সম্পত্তির মালিকের দেহান্তর ঘটলে একগাদা ওয়ারিশ ঐ সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে সারমেয় বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তারপর কোর্ট

কাছারী আদালত। সেই সঙ্গে কনস্থলার বিভাগের এই বিবাদ বিসং-বাদের ঘোলা জলে অবগাহন করতে হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে বিদেশীদের জন্যে যে 'ইমিগ্রেশন' এবং নাগরিকত্ব লাভের নিয়মকানুন রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে পালন না করলে সমস্যার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। কনস্থলার বিভাগকে তখন এসব ব্যাপারেও নাক গলাতে হয়।

এ ছাড়া অন্যান্য ঝুট ঝামেলা ত লেগেই থাকে কনস্থলার বিভাগে। কার বৌ কার সঙ্গে পালিয়েছে, কে কার বৌ কিংবা মেয়েকে কিডনাপ করে বেপাত্তা, কে মাতাল হয়ে রাস্তায় অশালীন আচরণ করেছে, কে কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, পাঠ্যরত কোন ছাত্রের দেশ থেকে টাকা আসছে না, কোন ছাত্র পরীক্ষায় ফেল ক'রে নিখোঁজ হয়েছে এই সব ঝক্কি ঝামেলা পোয়ানো কনস্থলার বিভাগের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সকল সমস্যাসংকুল পথে বিচরণ করেও দূতাবাসের কনস্থলার বিভাগ সমালোচনামুক্ত নয়। যদিও কনস্থলার বিভাগকে বিদেশে বাসরত ভারতীয় নাগরিকদের শুভাশুভ দেখতে হয়, তবুও মাঝে মাঝে ভারতীয়দের কাছ থেকে এমন সব চাহিদা উপস্থাপিত হয় যা নিতান্তই হাস্যকর।

লেখক তখন পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশে। সেখানকার দূতা-বাসের কনস্থলার বিভাগের প্রথম সচিব লেখককে একদিন বললেন, কাল রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমার বাড়ির টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'ইয়ে ইণ্ডিয়ান হাইকমিশন হ্যায়।

কনস্থলার বিভাগের প্রথম সচিব বললেন, ইয়ে হাইকমিশন নেহি। কনস্থলার ফার্স্ট সেক্রেটারিকা কোঠি হ্যায়।'

তিনি বললেন, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। শুনিয়ে, আজ শুবা পাঁচ বাজে মেরী পত্নী মর্নিং ফ্লাইট মে ইহা আয়েগী। ম্যয় মেরী পত্নীকো মিলনেকে লিয়ে নেহি যা সাকতা। আপ উনীকো এয়ারপোর্ট মে রিসিভ কিজিয়ে। আউর মেরে পাস ভেজনেকো বন্দোবস্ত কিজিয়ে।'

প্রথম সচিব তাঁকে বললেন, দেখুন এসব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে হাইকমিশনের কিছু করবার নেই। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

এই উত্তর শুনে তিনি রেগেমেগে বললেন, 'ক্যা, আপ কুছ নেহী করেঙ্গে। আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। ম্যায় আপকো খেলাপ প্রধানমন্ত্রীকো পাস শেকায়েৎ করেঙ্গে।

প্রথম সচিব টেলিফোনের রিসিভারটা ক্রেডেলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, প্রধানমন্ত্রী ত এখন দিল্লীতে। আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে আটহাজার মাইল যেতে পারবেন আর আপনার স্ত্রীকে এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ী নিয়ে আসতে দু'মাইল যেতে পারবেন না?

আর একটি ঘটনা। আমি তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে। একদিন সকালে কনসুলার বিভাগের প্রথম সচিবেয় ঘরে ঢুকেই দেখলাম তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে বসে আছেন। জিজ্ঞাস করলাম, ব্যাপার কি। এত চুপচাপ কেন? তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, আর বলবেন না মশাই। যত পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

তিনি বললেন, আজ সকালে একটি ভারতীয় যুবক একটি ভারতীয় যুবতীকে নিয়ে আমার অফিসে এসে উপস্থিত। আমাদের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী একে অপরকে বিয়ে করতে চায়। বিয়ের কাগজ-পত্র সব ঠিকঠাক করছি, এমন সময় ছেলেটি আমাকে বললো, দলিলে একটা বিষয় স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে। আমি বললাম, কি বিষয়। ছেলেটি বললো, আমার ভাবী স্ত্রী পাঁচ মাস গর্ভবতী। ও বলছে, এই সন্তানের পিতা নাকি আমি নই। অপর কেউ। তাই এই গর্ভজাত সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ও ঐ শিশুটিকে অপর কাউকে দিয়ে দিতে চায়। আমি কিন্তু তাতে রাজী নই। আপনি দলিলে লিখে দিন যে আমার ভাবী স্ত্রীর সন্তান আমারই থাকবে।

কনস্যুলার সেক্রেটারী বললেন, আমি যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি আপনার শর্ত মেনে নিয়েছে ?

যুবকটি এর উত্তরে বললো, মেনে নিলে ত আর কোন ঝঞ্ঝাট হত না। আর সে জন্যেই ত আমার ভাবী স্ত্রীর অজ্ঞাতে আপনাকে আমার ইচ্ছেটা বিয়ের দলিলে তুলে দিতে বলছি। সেক্রেটারী বললেন, এ বিষয়ে দুজনে একমত না হলে আমি কিছুই করতে পারবোনা। আমার কথা শুনে ছেলেটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দূতাবাস থেকে চলে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিশ-পঁচিশজন ভারতীয় জুটিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে ফিরে এল এ্যামবেসডরের কাছে।

কনস্যুলার সেক্রেটারীর কথা শুনে আমি বললাম, লোকগুলো এ্যামবেসেডরের কাছে যাক আর যেখানেই যাক তাতে আপনার কি আসে যায়।

তিনি বললেন, যাবে আসবে না কিছুই। তবে সব ক্রিয়ারই ত একটা প্রতিক্রিয়া আছে। এখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দূতাবাস থেকে সুযোগ সুবিধা পান না বলে আক্ষেপ করেন তারা এ নিয়ে একটা মুখরোচক গল্প তৈরী করবেন।

আমি বললাম, তাতে আপনার বয়েই গেল।

আর একটি ঘটনা। বার্মায় এখনও যে দু'দশ ঘর ভারতীয় আর নেপালী পরিবার আছে, এরা কেউ কেউ নানা কারণে বার্মা ছেড়ে আসতে চায়। কখনও কখনও তারা অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে বার্মার সীমান্ত পার হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে বেআইনী অনুপ্রবেশ করে। এ নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের বিশেষ মাথা ব্যথার কারণ নেই। কারণ এরা ভারতীয় নাগরিক নয়। কিন্তু মুশকিল হয় তখন যখন এ সকল অনু-প্রবেশকারীদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের দ্বারস্থ হয়। একদিন ঐরূপ একটি অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় দূতাবাসে এসে তার স্ত্রী এবং একজন যুবক অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। সে বললো যে তার বয়েস বত্রিশ আর তার স্ত্রীর ছাব্বিশ।

তার নালিশের বিষয় সেই যুবক একদিন তার স্ত্রীকে নিয়ে সটকে পড়ে। অনেকদিন তাদের কোন হদিস পাওয়া গেল না। বহু খোঁজখুঁজির পর সেই যুবক আর তার স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তার স্ত্রী তার কাছে ফিরে যেতে নারাজ। এই নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা আর রাগারাগির পর যুবকটি তাকে বললো, এত ঝগড়া-ঝাটির প্রয়োজন কি। তোমার স্ত্রী যেমন স্বইচ্ছায় আমার সঙ্গে থাকতে রাজি, তেমনি আমার স্ত্রীও তোমার সঙ্গে থাকতে রাজী আছে। আমি আমার স্ত্রীর সম্মতি পাওয়ার পরেই তোমাকে একথা জানাচ্ছি। তুমি ভাই আমার স্ত্রীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাও। খামোকা ঝুটঝামেলার দরকার কি। আর এতে তোমার রাজী না হওয়ারও কোন কারণ নেই। কেননা আমাদের কারুরই ত বড় একটা লোকশান হচ্ছে না। তুমি এক আওরতের পরিবর্তে আর এক আউরত পাচ্ছ, আমার বেলায়ও তাই। শুধু বৌ বদল হল এই যা।

আমাদের কনসুলার বিভাগের প্রধান সচিব ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি তোমার ঐ বন্ধুর প্রস্তাব মেনে নিয়েছো?

সে বললো, আজ্ঞে, সেটা মেনে নিতে পারলে তো আপনার কাছে আসার দরকারই হত না।

প্রথম সচিব বললেন, দেখ বাপু, তোমার স্ত্রী স্বইচ্ছায় তোমার কাছে ফিরে না এলে আমি কিছু করতে পারবো না।

প্রথম সচিবের কথা শুনে লোকটা লাফিয়ে উঠে বললো, ইয়ে আপসে নেহি হোগা ত কিসসে হোগা? ইয়ে ত আপকাই কাম হ্যায়। মেরা আউরৎ কিসিকো সাথ ভাগ যায় তো আপকোই ওহি আওরৎকো পাকড়কে মেরে হাতমে ডাল দেনা পড়েগা।

প্রথম সচিব ঐ লোকটিকে বললেন, তুমি কতদিন এদেশে আছো? তোমার পাসপোর্ট কোথায়?

লোকটি বললো, তার পাসপোর্ট নেই। কিছুদিন পূর্বে সে আর তার ঐ বন্ধু বর্মায় ছিল। সুযোগ বুঝে সীমান্ত পার হয়ে এদেশে চলে এসেছে।

ওর কথা শুনে প্রথম সচিব বললেন, দেখ এ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এসব ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। আর তাছাড়া তুমি ভারতের নাগরিক নও। ভারতে তোমার জন্ম হলেও আইনত তুমি এখনও বার্মার নাগরিক। বিদেশী নাগরিকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। তুমি এদেশের পুলিশকে একথা জানাতে পারো। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হবে। তোমার স্ত্রীর উদ্ধার ত হবেই না বরঞ্চ তুমি জেলে যাবে।

লোকটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, ও কেইসে?

প্রথম সচিব বললেন, তুমি এদেশে বেআইনী অনুপ্রবেশ করেছো। এদেশের পুলিশ তা জানতে পারলে হয় তোমাকে বার্মায় ফেরৎ পাঠাবে নয়ত এখানকার জেলে পুরে দেবে। যাবে পুলিশের কাছে?

লোকটা গলার স্বর নরম করে বললো, মুঝে আওর কুছ রাস্তা বাৎলাইয়ে।

প্রথম সচিব বললেন, তুমি তোমার ঐ বন্ধুর প্রস্তাব আপাতত মেনে নাও। হলোইবা ঐ বউটির নাকটা একটু চাপা। নাক ধুয়ে ত আর জল খাবে না। যাও, যা বললাম তাই কর গে। আর একটা কাজ করো। এই দূতাবাসে যত কম আসবে ততই মঙ্গল।

হতাশা ভরা একটা দৃষ্টি দিয়ে লোকটা বিদায় নিল।

এই ঘটনার পর ছ-সাত মাস চলে গেছে। একদিন সকালে অফিসের গ্যারেজে গাড়ী রেখে দূতাবাসের ভিতরে যাচ্ছি হঠাৎ গেটের কাছে কামিনীফুলের গাছটার দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম গাছটার সঙ্গে একটা বিরাট মোষ বাঁধা রয়েছে। আর এই যমের বাহনটি মাটিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জাবর কাটছে। দূতাবাসের ভিতরে মোষ? আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার বটে! ভাবলাম আমাদের মোষে কি প্রয়োজন? স্বদেশে চালান দেওয়া হবে হয়ত! তারপর ভাবলাম তা কি করে হবে। আমাদের দেশে কি গরু মোষের অভাব। মনে হল অন্য কোন ব্যাপার। যা হোক, এই মোষের শুভা-

গমনের কারণটি জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। অফিসে ঢুকে একজন কনস্থলার অ্যাসিস্টেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, দূতাবাসের ভেতরে মোষ কেন? কি ব্যাপার।

অ্যাসিস্টান্টটি একটু হেসে বললো, কনস্থলার ফার্স্ট সেক্রেটারীর ঘরে যান, সব জানতে পারবেন।

কনস্থলার ফার্স্ট সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকে দেখলাম তাকে ঘিরে দু'জন ভারতীয় আর একটি ছোটখাট থাই কিংবা লাও মেয়ে বসে আছে। ফার্স্ট সেক্রেটারী সেই দু'জন ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? দূতাবাসের মধ্যে একটা মোষ কেন?

তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, আপনি ত দেখেছেন একটা মোষ। আমি দেখছি তিনটে। একটা বাইরে আর দুটো আমার ঘরে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি?

তিনি তেমনি বিরসবদনে বললেন, আর বলবেন না, যত সব ঝুটঝামেলা।

এরপর তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। তিনি বললেন, আমার সামনে এই যে লোক দুটো বসে আছে তার মধ্যে একটি হ'ল ঐ মোষের মালিক। আর অপর লোকটি হল ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী। মোষের মালিক একদিন ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীকে গিয়ে বললো, দেখ ভাই, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার জমি আছে, স্ত্রী আছে। আমার স্ত্রী নেই, জমিও নেই। কিন্তু একটি ভাল মোষ আছে। মোষ ছাড়া ত তুমি জমিতে হাল দিতে পারবে না। তাই একটা কাজ কর। আমার মোষটি তুমি নাও আর তার পরিবর্তে তোমার স্ত্রী রত্নটি আমাকে দাও। তুমি মনের খুশিতে জমিতে হাল দাও আর আমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসার জমিতে হাল চাষ করি। ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামী এই প্রস্তাবে খুশি মনে রাজি হয়ে গেল। প্রস্তাবটি তার স্ত্রীর কাছে পেশ করতে সেও বিনা দ্বিধায় এই ব্যবস্থা মেনে নিল। মোষের মালিক মোষের বদলে

বৌ পেল আর ঐ লোকটি বৌ-এর বদলে মোষ।

তিন মাসও কাটে নি। একদিন সকালবেলা মোষের প্রাক্তন মালিক ঐ স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে তার পূর্বতন স্বামীর কাছে এসে বললো, না ভাই, এ ব্যবস্থা চললো না। তুমি তোমার বৌ ফিরিয়ে নাও আর আমার মোষটি আমাকে দিয়ে দাও।

ঐ স্ত্রীলোকটির পূর্বেকার স্বামী এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হ'ল না। সে বললো, তা কেমন করে হবে। একবার যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বার বার এ বদলাবদলী করা আমার অভিপ্রায় নয়। তুমি ফিরে যাও। মোষের পূর্বতন মালিক অনেক চেষ্টা করেও ঐ স্ত্রীলোকটির পূর্বেকার স্বামীকে এই প্রস্তাবে সম্মত করতে না পেরে সবাই মিলে [illegible] এসেছে একটা মিটমাট করতে।

[illegible] কনসুলের সেক্রেটারি স্ত্রীলোকটির নতুন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি তোমার নতুন বৌকে [illegible] দিতে চাও কেন?

সে একটু উত্তেজিত হয়েই ছিল। সেক্রেটারির প্রশ্নে ফেটে পড়লো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললো, বদলাতে চাইবো না? এরকম বজ্জাত স্ত্রীকে নিয়ে কি ঘর করা যায়?

সেই ছোটখাট স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে এই অশালীন মন্তব্য শুনে হঠাৎ জ্যা মুক্ত তীরের মত লাফিয়ে উঠে তার নতুন স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, কি বললি রে ছুঁচো। আমি বজ্জাত না তুই বজ্জাত? রোজ রাত্তিরে আমাকে একা ফেলে তুই যাস না সাংমার ঘরে। তিন মাস ধরে তুই রোজ এই করছিস। আমি অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়।

এই বলে সেই স্ত্রীলোকটি অফিসের চেয়ার টেবিল প্রায় উল্টে দিয়ে ঝড়ের বেগে কনসুলের সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলাম [illegible] মহিলাটি তার মরদকে শাপশাপান্ত করতে করতে একটা চলন্ত রিকশায় [illegible] মেরে উঠে বসলো।

নিজের অফিসে যাবার মুখে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, যে-জন্তুটিকে

নিয়ে এই বিয়োগান্ত নাটকের খাপছাড়া পরিসমাপ্তি সেই যমদূতপ্রায় মোষটি এত কিছু কাণ্ডের উপর একটা উপেক্ষা ভরা নিস্পৃহ দৃস্টি দিয়ে তখনও পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জাবর কেটে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ কূটনীতিকের কথা মনে পড়ছে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ড থেকে থাইল্যাণ্ডের ব্রিটিশ দূতাবাসে সামান্য চাকুরি নিয়ে আসেন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি হয়ে তিনি ঐ দূতাবাসের কনসাল জেনারেল হন। তিনি তাঁর 'কনসাল ইন প্যারাডাইস' গ্রন্থে তাঁর কনসাল জীবনের অভিজ্ঞতার অনেক কৌতুককর কাহিনী লিখে গেছেন এ [illegible] দু-একটা ঘটনা তুলে [illegible]চ্ছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ দূতাবাসের কনস্যুলার বিভাগে একটি বিচার বিভাগ ছিল। খাস ইংলণ্ডের নাগরিক ছাড়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের অপরাধের বিচার থাইল্যাণ্ডের সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে [illegible] তাদের বিচার-আচার এই কনস্যুলার আদালতেই হত। বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমানিত হলে এই কনস্যুলার আদালত অপরাধীদের দণ্ড দিত। অপরাধের গুরুত্বানুসারে কখনও কখনও অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। সে ক্ষেত্রে অপরাধীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার আগে বিলাতের প্রিভিকাউনসিলের অনুমোদন নিতে হত। কনসাল লিখছেন যে থাইল্যাণ্ডে স্থায়ী বাসিন্দা খাস ইংলণ্ডবাসীদের নিয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসের বড় বেশী বিব্রত হতে হতো না। কিন্তু মুস্কিল হতো বৃটিশ জাহাজ কোম্পনীগুলোয় ইংরেজ কিংবা স্কচ নাবিকদের নিয়ে আর থাইল্যাণ্ডের পার্শ্ববর্তী বার্মা আর মালয়ের অধিবাসী ব্রিটিশ সাবজেক্টদের নিয়ে। এদের নানা রকম অদ্ভুত এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরনের অভিযোগ প্রায়ই আসতো কনসালের আদালতে। একবার কনসালের কাছে খবর এলো, একটা ব্রিটিশ জাহাজের একজন ইংরেজ নাবিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে কনসাল থাইল্যাণ্ড পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। পাঁচ-সাত দিন পর পুলিশ ব্রিটিশ দূতাবাসে এসে

কনসালকে জানালো সেই পলাতক নাবিকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে তাকে ব্রিটিশ দূতাবাসে এনে হাজির করা তাদের অসাধ্য। কারণ জিজ্ঞেস করতে পুলিশ বললো, পলাতক ইংরেজ নাবিকের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমন একটি লোককে ব্যাঙ্কক থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি বৌদ্ধ মঠের প্রাঙ্গনে দেখতে পাওয়া গেছে। তার মাথা কামানো, গায়ে জাফরাণী রংয়ের অঙ্গবাস, মঠে সে বৌদ্ধ শ্রমণের মত আচরণ করছে। খবর পেয়ে কনসাল ছুটে গেলেন সেই মঠে। লোকটা যে জাহাজ থেকে পলানো সেই নাবিক তাতে কনসালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কনসাল তাকে বললেন, 'তোমার এসব কী হচছে? সন্ন্যাসীর পোশাক বদলে আমার সঙ্গে দূতাবাসে চল।'

পলাতক নাবিক শান্তভাবে বললে, 'নাথিং ডুইং। আমি আর এখন নাবিক নই। আমি এখন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তোমার দেশের আইনকানুনের এক্তিয়ারের বাইরে। আমি এই মঠেই থাকবো। তুমি আমাকে অযথা বিরক্ত না করে চলে যাও।'

কনসাল দেখলেন এ তো এক মহা ফ্যাসাদ। যখন তাঁর সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হলো, তখন তিনি পুলিশকে বললেন, 'লোকটাকে ধরে-বেঁধে দূতাবাসে নিয়ে এসো।'

পুলিশ জিভ কেটে বিনীতভাবে বললো, 'আর যা করতে বলেন করবো, কিন্তু ওটি পারবো না স্যার। কোন গেরুয়াধারী ব্যক্তির গায়ে হাত দেওয়া এদেশের আইনবিরুদ্ধ। বেআইনি কাজ করলে আমাদেরই সাজা হবে। আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা দেখুন।

নিরুপায় হয়ে কনসাল তখন শ্রমণবেশী নাবিককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা কী শর্তে তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে?'

নাবিক কিছুই বলতে চায় না। অনেক সাধ্যসাধনার পর বললো সে তার জাহাজের এক সহকর্মীর কাছ থেকে বেশ কয়েক মাস আগে দশ পাউণ্ড ধার করেছিল। কথা ছিল ব্যাঙ্ককে পৌঁছে

ওভারসীজ ভাতা পেয়ে তা থেকে এই ধারটা শোধ করে দেবে। ভাতা সে ঠিকই পেয়েছিল, কিন্তু ব্যাঙ্ককের এক বারবণিতার ঘরে গিয়ে পানাহারে সে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে সে আর জাহাজমুখো না হয়ে সেই মেয়েটির ঘরে দু'দিন কাটায়। মেয়েটি তার ঘরে অহেতুক দিনযাপনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে তাকে সত্যি কথাটাই বলে। তখন মেয়েটি তাকে পরামর্শ দেয় যে সে যদি মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে কিছুদিনের জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যায় তবে ঋণ শোধ না করার পাপ তাকে স্পর্শ করবে না। যে কথা সেই কাজ। পরদিন থেকে নাবিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

দূতাবাস থেকে ঋণ শোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কনসাল তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

এবার অন্য একটি ঘটনা। এক ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনের হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কয়েকজন নাবিক অভিযুক্ত হ'ল। তাদের বিচার শুরু হ'ল কনসালের বিচার বিভাগের আদালতে। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই ঐ খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

নাবিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিঃসন্দেহে নিতান্তই গুরুতর। তাই স্থির হলো ইংলণ্ডের সাধারণ আদালতে এদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এও স্থির হলো এদের কোন বৃটিশ জাহাজে করে ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার আগে কনসালের অফিসের হাজতে এদের কড়া পাহারায় আটকে রাখা স্থির হলো যতদিন না এদের ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়।

তিন-চার দিন পর কনসালের কাছে খবর এলো, কয়েদীরা হাজত ভেঙে পালিয়েছে। এ-খবরে দূতাবাসের সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো, একমাত্র রাষ্ট্রদূত ছাড়া। তিনি কনসালকে তাঁর ঘরে ডেকে এনে বললেন, 'কয়েদীরা ভেগেছে, একপক্ষে এ ভালোই হয়েছে। ওদের চার বেলা করে খাওয়াবার পয়সা কোথায়। আসামী খাওয়াবার বার্ষিক

ব্যয়-বরাদ্দ যা ছিল তা তো কবেই শেষ হয়েছে। তোমার আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে কতদিন চালাবে? আমাদের ফরেন অফিসে বরাদ্দ বাড়াবার আবেদন করে কোন লাভ হবে না। অতিরিক্ত বরাদ্দ ত হবেই না। উপরন্তু অপমানজনক চিঠিপত্র পাবে। তার থেকে ঘটনাটা বরং চেপে যাও।'

এরপর সেই ব্রিটিশ কনসাল লিখছেন, তিনি যখন চিয়েংসাই শহরে তখন মাঝে মাঝে তিনি খনি অঞ্চল পরিদর্শনে যেতেন। খনি অঞ্চলের তুংলে নামে একটি ছোট শহরে একবার তিনি গিয়েছেন। কনসালের উপস্থিতির খবর পেয়ে খনির মজুরদের সর্দার গোছের একটা লোক কনসালকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এলো। লোকটা ভারতীয়। এই লোকটাকে একনজর দেখেই কনসালের যেন মনে হ'ল একে আগে কোথায় দেখেছেন। কনসাল লক্ষ্য করলেন যে লোকটার মাথায় একটা প্রকাণ্ড সাইজের পাগড়ী। আর মাথার ডান দিকে পাগড়ীটা কান ঢেকে আরো নিচে ঝুলে পড়েছে। কনসালের কেমন যেন সন্দেহ হলো। তিনি তখুনি ওর পরিচয় নেবার চেষ্টা করলেন না। একটু সময় নিলেন ভেবে দেখার জন্যে। দিনদুই পর কনসাল তাঁর আর্দালীকে বললেন, ঐ সর্দারকে পাগড়ী খোলা অবস্থায় একবার দেখা দরকার। আমি চেষ্টা করলে হয়ত সন্দেহ করবে। রাত্তিরের দিকে একবার তুই চেষ্টা করিস ত। আর্দালী কনসালের নির্দেশ মত কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সর্দারকে পাগড়ী বিহীন অবস্থায় দেখে কনসালকে খবর দিল, সর্দারের ডান দিকের কানটা নেই। খবরটা শুনে কনসাল নিজের মনেই বলে উঠলেন, আন্দাজটা তাহলে ঠিকই করেছিলাম। লোকটা আগে ছিল এক দুর্ধর্ষ খুনী। আট দশটা লোককে খুন করার পর চার পাঁচ বছর আগে ও ধরা পড়ে ধনবুড়ি নামে একটা ছোট শহরে। এই শহরটা ব্যাঙ্কক থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে। খুনীটাকে আনতে হবে ব্যাঙ্কক শহরের কনসাল অফিসে। তখনকার দিনে থাইল্যাণ্ডে এখনকার মত দূর পাল্লার হাইওয়ে ছিল না। ভালো রাস্তাও ছিল না।

জনসাধারণ নৌকো বা স্টিমারে করে যাতায়াত করতো। ঠিক হল, ধৃত ব্যক্তিকে স্টিমারে করে ব্যাংককে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু রাত্রিতে লোকটাকে পাহারা দেবার কি বন্দোবস্ত হবে? অনেক চিন্তাভাবনা করে পাহারাওলারা ঠিক করলো যে, চার পাঁচটা ইয়া বড় বড় পেরেকে এই লোকটার ডান দিকের কান ভেদ করে একটা বড় গাছের গুড়ির মধ্যে সেঁদিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে লোকটা কোন মতেই পালাতে পারবে না। হাতপা অবশ্য বাঁধা থাকবে। যা ভাবা তাই কাজ। কিন্তু পরদিন সকাল বেলা বিস্ফারিত চক্ষু মেলে পাহারাওলারা দেখল যে আসামী নেই। তবে পালিয়ে যাওয়ার সময় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সে তার ডান কানটা রেখে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর লোকটাকে পাওয়া গেল। বিচারও হলো। কিন্তু জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে তার কোন কষ্টই হ'ল না।

কনসাল লিখছেন, লোকটা আমার সঙ্গে খুবই ভদ্রতা করলো। বুনো মুরগী শিকার করে এনে খাওয়ালো। চিয়েংসাই ফেরবার পথে ডজন কয়েক ভাল জাতের আনারস যোগার করে আনলো আর কয়েক পাউণ্ড হরিণের মাংস। ন্যায্য মূল্য থেকে অনেক কম টাকা আমার কাছ থেকে থেকে নিল। বললো, এই বস্তুগুলো এখানে ভীষণ সস্তা। আমি যে ওকে চিনেছি বিন্দুমাত্র আভাসও ওকে দিলামনা। দেখলাম ও এখানে ভাল ভাবেই আছে। এখন ওকে জোর জবরদস্তি ধরে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? হয়ত এ্যামবেসাডর বলবেন, ফাও নেই জেনে শুনেও লোকটাকে ধরে আনল কেন? এখন নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে চারবেলা পিণ্ডি গেলাবার ব্যবস্থা করো। এই ভয়েও চুপ মেরে গেলাম।

আর একটা ছোট কাহিনী বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। আজ যেমন ব্যাংককে কম হলেও বিশ পঁচিশ হাজার ভারতীয় বাস করে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে ভারতীয়দের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তখনকার দিনেও ভারতীয়দের মধ্যে তেজারতী ব্যবসা চালু ছিল। রামদাস নামে এক ব্রাহ্মণ এক ভারতীয় মহাজনের কাছ থেকে দলিলপত্রাদি সই না

করেই দুশ টাকা ধার নিয়েছিল। রামদাস ধার শোধ না করায় মহাজন তার বিরুদ্ধে কনসালের আদালতে মামলা করলো। আদালতে নানা রকম হলপ পড়েও রামদাস এই ঋণ স্বীকার করল না। দলিলপত্র নেই, কাজেই ঋণ প্রমাণ করাও একরূপ অসাধ্য। তখন মহাজনের উকিল কনসালকে বললো, স্যার আজকে মামলা মুলতুবী রাখুন, কাল আমার মক্কেল প্রমান করে দেবে যে ঐ রামদাস ঋণ নিয়েছে এবং তা অস্বীকার করছে। পরদিন আদালতে মামলা উঠতেই বাদী পক্ষের উকিল রামদাসকে বললো, আচ্ছা রামদাস তুমি কি গঙ্গাজল স্পর্শ করে হলপ করতে পারো যে, তুমি আমার মক্কেলের কাছ থেকে দুশ টাকা ধার নাওনি? রামদাস চটপট জবাব দিল আমি গঙ্গাজল ছুঁয়ে একশবার শপথ করে বলতে পারি যে ঐ মহাজন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করেছে। রামদাসের উত্তর শোনামাত্র উকিল সাহেব তার কালো কোটের ভিতরের পকেট থেকে ঘোলা জলপূর্ণ একটি ছোট বোতল বার করে তা থেকে খানিকটা জল নিজের হাতে ঢেলে রামদাসকে বললো, এই দেখ গঙ্গাজল। এটা ছুঁয়ে বলো ত তুমি আমার মক্কেলের কাছ থেকে দুশ টাকা ধার নিয়েছো কিনা? রামদাস কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে ঠিক আছে আমি আপনার মক্কেলের টাকা শোধ করে দেব।

আদালতের ছুটি হয়ে গেলে কনসাল ঐ উকিলকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি গঙ্গাজল কোথায় পেলে? উকিলসাহেব একটু হেসে বললেন, কেন আপনার কোর্টের পেছনে যে খাল আছে, তা থেকে।

ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে কনসালের বিচার বিভাগ অনেককাল হল উঠে গেছে। কিন্তু বিদেশে যে-কোন দূতাবাসের কনসালকে তার দেশের প্রবাসী নাগরিকদের নালিশ ইত্যাদি এখনও শুনতে হয়। লেখকের সহকর্মী একজন ভারতীয় কনসাল তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে নিযুক্ত ছিলেন। একাদন সকালের দিকে এক ভারতীয় প্রৌঢ় এসে কনসালকে বললো, স্যার আমার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী।

কনসাল জিজ্ঞেস করলেন, কি করে জানলে।

প্রৌঢ় বললো, এটি আমার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। বয়েস অল্প। কাল আমার শহরের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ী থেকে রওনা হয়েছিলাম ঠিক সময়ে। কিন্তু কি একটা গোলযোগে আমার যাওয়ার ট্রেন আট ঘণ্টা লেট শুনে, রাত্রিতেই বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম, আমার স্ত্রীর মশারীর ভেতর আর একটা লোক।

কনসাল বললেন, তা তুমি এখন কি করতে চাও।

লোকটি বললো, আপনি যদি ওদের একটু জিজ্ঞাসাবাদ করেন তো ভালো হয়।

কনসাল সম্মত হলেন। লোকটির স্ত্রী এবং সেই মশারীর ভেতরকার যুবকটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা দুজনে মশারির ভেতরে কি করছিলে।

যুবকটি উত্তর দিল, আজ্ঞে, আমি মশারীর ভেতরে মশা ঢুকেছিল, তাই মারছিলাম।

হাসি চেপে কনসাল জিজ্ঞাসা করলো, তা কটা মশা মেরেছো?

যুবকটি বললো, আজ্ঞে আর একটাই পেয়েছি। দ্বিতীয়টা মারবার চেষ্টা করছিলাম, সেই সময় এই লোকটি ঘরে ঢুকে আমার কাজে বাধা দিল।

লোকটির দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী আর সেই যুবকটিকে বিদায় দিয়ে কনসাল সেই প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কি করতে চান।

লোকটি বললো, আপনি কি করতে বলেন?

কনসাল গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আপনি তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করুন।

এই কনসালের অফিসে একদিন ডানহাতে প্লাস্টার করা একটি ভারতীয় এসে কনসালকে বললো, স্যার, কপিল তেওয়ারী নামে একটা লোক আমার এই হাল করেছে।

কনসাল লোকটির বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো কপিল তেওয়ারা কি করেছে?

লোকটি তার ডানহাতটি কনসালের টেবিলের উপর রেখে বললো, তেওয়ারী আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে।

কনসাল বিরক্ত হয়ে বললে, এতে আমার কি করবার আছে। তেওয়ারী তোমাকে মেরেছে ত তুমি থানায় গিয়ে নালিশ কর।

লোকটি একটু ইতস্তত করে বললো, স্যার কপিল আমার শালা, ওর নামে বিদেশের আদালতে নালিশ করলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মনান্তর হয়ে যাবে। আপনি যদি কপিলকে ডেকে একটু ধমকে দেন ত ভালো হয়।

কনসাল বললো, আচ্ছা কপিলকে নিয়ে এসো।

পরদিন কপিলকে কনসাল জিজ্ঞেস করলো, তুমি এই লোকটাকে মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়েছো কেন?

কপিল শান্তভাবে বললো, স্যার ওর হাত ভাঙ্গবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। ওটা নিতান্তই আকস্মিক। আমি মুগুর দিয়ে ওর মাথাটা দু-ফাঁক করতে চেয়েছিলাম। মুগুর তুলে ওর মাথায় যখন এক ঘা বসাতে যাচ্ছি তখন ও তড়িঘড়ি ওর হাত দুটো মাথার উপর তুলে ধরলো। তাইত ওর ডান হাতটা মুগুরের ঘায়ে জখম হয়ে গেল। এতে আমার দোষ কি বলুন?

কনসাল ওর জবাব শুনে চুপ মেরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, না, তোমার কোন দোষ নেই। তবে এদেশে যদি থাকতে চাও ত তোমার ঐ মুগুরটুগুরগুলো নদীর জলে ফেলে দিতে হবে।

দুজনে চলে যেতে যেতে কপিল বললো, তাই হবে স্যার। তবে ছুরিকাঁচিগুলো যেন ফেলে দিতে বলবেন না স্যার।

দূতাবাসের কনসাল জেনেরাল কিংবা কনসালের কর্মজীবনে এমন বহু ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ কেউ এগুলোকে বাড়তি উপদ্রব মনে করে বিরক্ত হন আবার কেউ কেউ এই সকল অভিযোগগুলো সহজভাবে গ্রহণ করে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করেন।

ভারতের কোন কোন দূতাবাসে মিলিটারী এ্যাটাসের একটি পদ থাকে। তিনটি সেনা বিভাগের (আর্মি নেভি ও এয়ার ফোর্স) যে-

কোন বিভাগের কোন একজন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী এই মিলিটারী এ্যাটাসের পদে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিভূ হিসেবে এই মিলিটারী এ্যাটাসের নানাবিধ কাজ করতে হয়। যেমন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, শান্তির সময়ে জনকল্যাণমূলক কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে আপদকালীন অবস্থাকে আয়ত্বে আনার জন্যে তথ্যাদি সরবরাহ, এই মিলিটারী এ্যাটাসেকেই করতে হয়। তাছাড়া কোন দেশের সামরিক বাহিনী যদি কোন বিশেষ ধরণের ট্রেনিং-এর জন্যে সেই দেশের সামরিক শিক্ষার্থীদের ভারতে পাঠানো স্থির করেন, তাহলে এই মিলিটারী এ্যাটাসেকে মধ্যস্থতা করতে হয়। ভারতের নৌবাহিনীব কোন সামরিক জাহাজ যদি কোন দেশে শুভেচ্ছামূলক পরিদর্শনে যায় তখন এই জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে জাহাজের সকলের দেখাশোনা, আদর আপ্যায়নের গুরুভার এই মিলিটারী এ্যাটাসেকেই বইতে হয়। এ ছাড়াও অনেক খুঁটিনাটি কাজ আছে।

সকলের শেষে আসছে রাষ্ট্রদূতের কথা। একটি জাহাজে ক্যাপ্টেন যেমন সর্বেসর্বা এবং জাহাজ চালনা এবং পরিচালনায় সর্বশেষ দায়িত্ব যেমন তার, তেমনি দূতাবাসের সর্বময় কর্তা হলেন রাষ্ট্রদূত। কোন একটি দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতিব প্রতিভূ। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যতপ্রকার চুক্তি সম্পাদনেব জন্য যে মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় তা এই রাষ্ট্রদূতকেই করতে হয়। পূর্বেই বলেছি যে ডিপ্লোম্যাসী বা কূটনীতির মৌল উদ্দেশ্য হ'ল ভারতের আভ্যন্তরীন এবং বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করা, আন্তর্জাতিক কোন দুর্যোগ বা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় প্রস্তাবের পক্ষে সেই দেশের ভোট সংগ্রহ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তির প্রচার, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং কারিগরিবিদ্যার লেন-দেন এ সবই রাষ্ট্রদূতেই করণীয়! তাছাড়া, বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদিদের ভারত সফর, এবং সেই

সফরের সমস্ত কর্মসূচী নির্ধারণ ইত্যাদি তো আছেই। বিদেশী ছাত্রদের স্কলারশিপ কিংবা শিক্ষকদের ফেলোশিপ দিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কিংবা অধ্যাপনা করার সুপারিশ ইত্যাদি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কূটনীতিক পণ্ডিত কার্ডিনাল রিচল্যু বলেছেন, 'এ্যান এ্যামবেসেডর ইজ এ সেলসম্যান অব হিজ কানট্রি ইন এ ফরেন ল্যাণ্ড।' কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দূত যদি শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নত না হন বিচার-বিবেচনায় পারদর্শিতা দেখাতে না পারেন এবং প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন না হন, তবে দৌত্যকার্যে আশানুরূপ ফললাভ তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দূতের দৌত্যকার্যের সাফল্য অর্জনের প্রথম সোপান হল, দূত যে দেশে নিযুক্ত সে দেশের জনপ্রিয়তা অর্জন। এই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হলে চাই সে দেশের সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আর তা রক্ষা করে চলা। সংযোগ রক্ষা করার প্রশস্ত উপায় তাদের আদর আপ্যায়নের ঢালাও ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, দরাজ হস্তে অতিথি সংকারের মাধ্যমে অভ্যাগতদের মনোরঞ্জন করতে পারলে অনেক সময় হাতে হাতেই সুফল পাওয়া যায়।

জনপ্রিয়তা অর্জনের অপর একটি পন্থা হলো বিদেশীদের কল্যাণ-মূলক জনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা, বিদেশী দেশগুলোর জাতীয় উৎসবে যোগদান করা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিভিন্ন জ্ঞানপীঠে, রোটারী এবং লায়ন্স ক্লাবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়া।

জনপ্রিয়তা অর্জনের আর একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হলো, হোস্ট কানট্রির খেলাধূলোয় উৎসাহ দেখানো। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানু-ষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা। ইটনের খেলার মাঠে যেমন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয়ের প্রথম সোপান তৈরি হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে, তেমনি বিদেশের গল্‌ফ খেলার মাঠে অনেক রাষ্ট্রদূত তার সাফল্যের বীজ বপন

করতে পারেন। বিদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করা, জাতীয় আর্টগ্যালারীর সভ্য হওয়া, জাতীয় নাট্যমঞ্চের খ্যাতনামা কলাকুশলীদের এবং চিত্রজগতের পরিচালক ও চিত্রতারকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা দূতের জনপ্রিয়তা লাভের আর একটি পন্থা। সর্বোপরি হোস্ট কানট্রি'র বিদেশমন্ত্রী এবং সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আস্থা ভাজন হতে না পারলে দূতের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এছাড়া সেই দেশে অপরাপর বৈদেশিক রাষ্ট্রের কর্মরত দূতগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাও এক অত্যাবশ্য কর্ম। অনেক মূল্যবান তথ্য অপরাপর দূতগণের সহায়তায় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। যে সকল ভারতীয় দূত এসকল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তারা সকলেই কম-বেশী সাফল্য লাভ করেছেন।

একদা ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যিনি তাঁর দক্ষতার এবং কৃতকার্যতার অম্লান সাক্ষর রেখে গেছেন, সেই একধারে সুদক্ষ কুটনীতিক সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার এবং সরস প্রবন্ধকার প্রাক্তন আই, সি, এস এবং অবসর প্রাপ্ত বিদেশ মন্ত্রালয়ের প্রধান সচীব শ্রী কে, পি, এস মেনন তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, দৌত্যকর্মে সাফল্য অর্জন একটি দুরূহ আর্ট। দৌত্যকর্মে নিযুক্ত একজন কুটনীতিকের কি কি আচরণ বর্জনীয় তা বলা যতটা সহজ, তাঁর সাফল্যের পথে কি কি আচার আচরণের অধিকারী তাকে হতে হবে তা বলা ঠিক ততটাই দুস্কর। তবে কয়েক শ্রেণীর লোক, তারা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই কৃতবিদ্য হোন না কেন, কূটনীতিক হিসাবে তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছেন। তিনি বলেছেন লর্ড কার্জন হয়ত ভারতে ইংরেজের ভাইসরয় হিসেবে খুবই সাফল্য লাভ করেছেন, অন্তত তদানীন্তন ইংলণ্ড সরকারের চোখে। কিন্তু সেই লর্ড কার্জন কিন্তু বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী হয়ে নিস্প্রভ হয়ে গেলেন।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের দৌত্যকর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীমেনন বলেছেন যে, এ বিষয়ে দু' একজন সাফল্য লাভ

করলেও আইনবিদেরা প্রায়ই দূত হিসেবে সাফল্য লাভ করেন না। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে আইনজ্ঞদের প্রধান কাজ হ'ল বাকচাতুর্যে আসামী কিংবা ফরিয়াদীকে ঘায়েল করা। বুদ্ধির খেলায় তারা এক নিপুন কারিগর। কিন্তু কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কিংবা কট্টর লজিকের অবতারনা করে অনেক সময় বিদেশী সরকারের মাথা গুলিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রার্থিত বস্তুটি তাতে লাভ করা যায় না। বাকপটুতার 'ডোপ'-এর কার্যকরীতার সময় উত্তীর্ণ হলেই বিদেশী সরকার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন এবং তাদের 'ডীপ ডিকেনস' আরো সুদৃঢ় করে সেই কুটনীতিকের ব্যূহ ভেদের চেষ্টা নিস্ফল করে দেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে ইংলণ্ডের প্রখ্যাত আইনবিদ স্যার জন সাইমন ব্যবহারজীবি হিসেবে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ফরেন সেক্রেটারি হিসেবে তিনি বিফল হলেন।

শ্রীমেননের মতে অনেক সময় কৃতবিদ্য এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদগণ ও কুটনীতিক হিসেবে বিফলতার কালি গায়ে মেখে ফিরে আসেন। রাষ্ট্রদূত হিসেবে যখন তাঁরা বিদেশে যান, তখন অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে তাদের জ্ঞানগম্যির অহংকারটুকুও সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলেন না। পাণ্ডিত্যের প্রচ্ছন্ন দম্ভ এবং শিক্ষকতা সুলভ জ্ঞানদানের প্রবনতা সেই শিক্ষাবিদ-কুটনীতিক আর বিদেশী সরকারের মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল গড়ে তোলে। ফলে কেউ কারো মুখ দেখতে পায়না দুই পক্ষই তখন নেপথ্যচারী হয়ে বাতাসে ভেসে আসা খণ্ডিত স্বর শুনতে পান। ফলে হাওয়ায় ভেসে আসা স্বর হাওয়াতেই ভেসে যায়। কানের ভিতর দিয়ে কোনো শব্দই কারো মরমে প্রবেশ করে না। সোজা বাংলায় আলাপ আলোচনা—কুটনীতিক ভাষায় যাকে বলা হয়, 'নেগোসিয়েশন', সেটি ভেস্তে যায়। ফল-অষ্টরম্ভা।

কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে কূটনীতিকের ব্যক্তিগত আকর্ষণ দৌত্যকর্মে সাফল্যের এক প্রধান স্তম্ভ। কথাটা আংশিকভাবে

সত্য হলেও কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আকর্ষণের গুণেই দৌত্যকার্য্যে সাফল্য লাভ করা যায় না। দূতের কথাবার্তায়, আচার আচরণের অন্তরালে যদি সারবস্তু না থাকে তবে কেতাদুরস্ত ভঙ্গীমায় কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কূটনৈতিক জগতের কঠিন প্রস্তরকে গলানো সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত আকর্ষণ চিরস্থায়ী বস্তু নয়, গ্র্যামারের হলো শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রবিরশ্মির মত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যে-সকল সদগুণের অধিকারী হলে দৌত্যকর্মে অধিক-তর সাফ্যলাভের সম্ভাবনা তা কালের নির্মম আঘাতেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এ সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর একটা কথা মনে করা যাক। যদিও নিজের চরিত্রের কপটতা, ছলনা এবং নিষ্ঠুরতা দিয়ে অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের ইতিহাসের কয়েকটা পাতা কলঙ্ক কালিমায় লেপে দিয়ে গেছেন তবুও ভূতের মুখে রামনামের মত ক্যাথরিনের কাছে হেনরীর একটি উক্তি আজ পর্য্যন্ত অম্লান হয়ে আছে। ক্যাথেরিনকে বিয়ে করার আগে তিনি বলেছিলেন, দেখ ক্যাথেরিন যে বাগ্মিতার স্রোতে একদিন হাজার হাজার লোক ভেসে যায় সেই স্রোত কিন্তু একদিন সেই বক্তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যুবতীর অনিন্দ্যসুন্দর পদযুগল একদিন চুপসে গিয়ে বাদুড়ের পাখার মত হয়ে যায়, উন্নত বিশাল বক্ষ, ঋজুকঠিন শিরদাঁড়া জীর্ণ প্রাসাদের মত নুব্জ্য হয়ে হেলে পড়ে। নিতম্বলম্বিত পিঙ্গল কেশ কালের এক ঝাপটায় উড়ে যায়, কৃষ্ণভ্রমরের মত কুঞ্চিত শ্মশ্রুদাম সমুদ্রের ফেনার মত শুভ্রবেশ ধারণ করে। সরোবরের জলে ভাসমান নয়নাভিরাম একজোড়া পদ্মপলাশলোচন একদিন চক্ষুকোটরের অন্ধকারে 'নাইট আউল'-এর মত আত্মগোপন করে। অপরূপ লাবণ্যময় দেহকান্তি জরার আক্রমণে মরুভূমির রুক্ষতায় ডুবে যায়, কিন্তু একটি মহৎ প্রাণ! সে ত অক্ষয় সূর্য্যের মত অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর অম্লান আলোয় তমোনাশী হয়ে মধ্যাহ্ন গগনে চির ভাস্বর। উদয় আর অস্তরাগে সমান অমলিন।

তাই "পার্সোনাল চার্ম" যতই থাক, সততা, বিনয়, উন্নত রুচি এবং উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি গুণাবলী বর্জিত কোন কূটনৈতিক তার দেশের হয়ে কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

এ সম্পর্কে একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য এখনো চালু আছে। প্রবচনটি হলো, দেশের স্বার্থে একটি সদাশয় ব্যক্তিকে ডিপ্লোম্যাট করে বিদেশে পাঠানো হয় দেশের হয়ে মিথ্যে কথা বলতে।

এ প্রবাদ বাক্যটি দ্বর্থব্যঞ্জক হলেও এর মধ্যে কূটনীতিকেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর একটি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ রয়েছে। অনেকেই এক ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করেন যে রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য কূটনীতিক কর্মীদের জীবনযাত্রা খুবই আরাম আয়েসের। তাঁরা আলস্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে মধ্যযুগের সামন্তরাজদের মত বিলাস ব্যসনের কুহকে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যান। সমালোচকের দল এও ভাবেন যে স্যুটবুট, বাইরের ঠাঁটবাট ঔপনিবেশিক যুগের লাটবেলাটের জীবনযাত্রাকেও হার মানায়। রাষ্ট্রদূত চলাফেরা করেন 'প্রেষ্টিজিয়াস লিমোজিন'-এ চড়ে, যাঁর বনেটে রাষ্ট্রদূতের স্বদেশের পতাকা প্রতিনিয়ত পথচারী এবং রাস্তায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে একজন কেউকেটা ব্যক্তি গাড়ীর ভেতরে রয়েছেন, আর সেই ট্রাফিক পুলিশ যখন গাড়ীতে রাষ্ট্রদূতের দেশের জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করেন তখন আত্মগরিমায় রাষ্ট্রদূত স্ফীত হয়ে উঠেন। ভ্রান্তদর্শীরা আরো মনে করেন যে রাষ্ট্রদূত অফিসে গিয়ে অফিসের কাজকর্ম কোন রকমে নমঃ নমঃ করে সেরে চটপট অফিস থেকে হাওয়া হয়ে যান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দিবানিদ্রা সুখ উপভোগ করে সন্ধ্যায় দামী স্যুটে দেহাবৃত করে হয় ককটেল অথবা ডিনার পার্টির শোভা বর্দ্ধন করেন। ককটেলে গিয়ে যতটা মদ্যপান করা উচিত তার অতিরিক্ত পান করে ফেলেন এবং পার্টিতে আহূত সুন্দরী রমণী পরিবৃত হয় তাদের প্রিয় সম্ভাষণে মুগ্ধ করে অনর্গল অর্থহীন প্রলাপ বকে যান এবং কদাচ কখনো দু'একটা সাংকেতিক ভাষায় নিজের বিদেশমন্ত্রকে তারবার্তা পাঠিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। এই ভ্রান্ত ধারণার তালিকা আর দীর্ঘ করলাম না।

একজন কূটনীতিকের কর্মে সিদ্ধিলাভ খুব সহজলভ্য নয়। যে-সকল গুণাবলীর অধিকর্তা হলে একজন কূটনীতিক তার মিশন সাকসেস-

ফুল করতে পারেন, কূটনীতি বিশারদদের মতে তার অন্যতম গুণ হল যে-দেশে সেই কূটনীতিক কাজ করবেন সেই দেশের সকল চিন্তা এবং ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে পরিচিত করা। কেবলমাত্র সেই দেশের রাষ্ট্রগুরু কিংবা রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলেই চলবে না, সেই দেশের সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ধারণা থাকা অপরিহার্য, কারণ যে-কোন দেশেই এই সাধারণ মানুষই শেষ পর্য্যন্ত সেই দেশের নীতি নির্দ্ধারণ করে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে।

সাধারণ মানুষ ছাড়া সেই দেশের সৃষ্টিধর্মী এবং বিভিন্ন জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীদের চিন্তাধারা জানবার এবং বুঝবার চেষ্টা করাও একজন কূট-নীতিবিদের পক্ষে এক অপরিহার্য কর্ম। এই শ্রেণীগোষ্ঠিদের মধ্যে রয়েছেন, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁরা একাধারে স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। তারা তাদের সৃষ্টি এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির মধ্যদিয়ে তাঁদের যুগের একটা সর্বব্যাপী অস্ফুট অব্যক্ত যুগচেতনাকে বাঙ্ময় করে তুলতে পারেন, যা যুগবাণী হয়েও কালের প্রহরী এড়িয়ে একদিন সর্ব যুগের বাণী হয়ে অনাগত মানুষের চিত্তলোক উদ্ভাবিত করতে পারে। এদের উপেক্ষা করে চলা একজন কূটনীতিকের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি ভ্রমাত্মক কর্ম। তবে এঁদের চিন্তাধারাকে ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত দাম দিলে অনেক সময় বাস্তবতার সঙ্গে একটা অনাবশ্যক দ্বন্দের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। তাই বোধ করি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত বার্লিনে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার প্যাট্রিক লরেন্স তাঁর 'দি ফেইলিওর অব এ মিশন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন যে "আমরা হিটলারকে যুদ্ধ নামা থেকে নিরস্ত করতে পারিনি তার কারণ এই নয় যে আমরা হিটলারকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে অবহিত করতে পারিনি। কিন্তু একটা কথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে সে সময়-কার জার্মেনীর জাতীয় জীবনে যে ভ্রান্ত আদর্শবাদ গড়ে উঠেছিল তা খণ্ডন করতে আমাদের যুক্তির শানিত তলোয়ার কিন্তু খাপেই ঢাকাপড়ে ছিল।

এই ত গেল সরকার নিয়োজিত রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য কূটনীতিকদের কথা। এই সঙ্গে বে-সরকারী দূতদের সম্পর্কেও দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এ সকল বেসরকারী দূতগণ স্বইচ্ছায় এবং স্বকীয় প্রয়োজনই হয়ত অনেক সময় বিদেশে যান কিংবা বিদেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। কিন্তু এ সকল প্রবাসীদের মধ্যে এমন কিছু উচ্চস্তরের প্রতিভশালী ব্যক্তি থাকেন যাঁরা নিজেদের কর্মের দ্বারা তাঁদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তুলনামূলক ভাবে তাদের অবদান সরকারী রাষ্ট্রদূতের থেকে কোন অংশে কম নয়। ভারতের বেসরকারী দূত হয়ে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করবো রাজা রাম মোহন রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের। এঁদের পরেই যাঁদের নাম স্মরণে থাকে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, ডক্টর তারকনাথ দাস, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, উদয়শঙ্কর ইত্যাদি। [illegible] স্বাধীনতা লাভের পর হাজার হাজার ভারতবাসী আজ পৃথিবীর [illegible] দেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত [illegible] সক, প্রযুক্তি [illegible] শিল্পবিদ, অধ্যাপক, অগণিত ছাত্র [illegible] এবং [illegible] তাই লোককবি জওহরলাল নেহেরু [illegible] ভারত সন্তানই ভারতের এক একটি [illegible] বিদেশীদের ভারতকে জানাতে বোঝাতে এ[illegible] অবহেলার [illegible] নয়।

[illegible] পরিচ্ছেদ

এবার 'ডিপ্লোম্যাটিক [illegible]' বা 'কূটনৈতিক নিষ্কৃতি' সম্পর্কে কিছু বলছি।

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত আন্ত[illegible]ক কূটনৈতিক চুক্তি অনুসারে পরদেশে নিযুক্ত কূটনীতিকগণ এই কূট[illegible]ক [illegible]ষ্কৃতি পেয়ে থাকেন। যেমন কোন রাজদূত কিংবা দূতাবাসের অন্যান্য কূটনৈতিক পদমর্যাদাসম্পন্ন

কর্মীরা পরদেশের আইনের আওতায় পড়বেন না। এমন কি দূত কিংবা অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মী যদি কোন জঘন্য রকমের অপরাধও করে বসেন, তাহলেও না। সেই ক্ষেত্রে ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে অভিযুক্ত কূটনৈতিককে তার দেশে পাঠিয়ে তার দেশের আদালতের উপর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে পরদেশে নিযুক্ত কোন কূটনীতিক যদি কোন আপত্তিকর কর্মে লিপ্ত হন তাহলে সে দেশের সরকার সেই কূটনীতিককে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করে দু-চার ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন।

এছাড়া কূটনীতিকেরা পরদেশে থাকাকালীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে থাকেন। যেমন পরদেশে কোন কর প্রদানের আওতায় তাঁরা পড়েন না। আবগারী এবং অন্যান্য শুল্ক তাঁদের দিতে হয় না। অন্যান্য দেশ থেকে কোন ভোগ্যপণ্য আমদানী করলে আমদানী শুল্ক দিতে হয় না। এ জন্যই কূটনীতিকদের সাধারণত বলা হয় 'প্রিভিলেজড সিটিজেন ইন এ ফরেন কান্ট্রি'।

মনু তাঁর সংহিতায় বলে [illegible] তার নিরাপত্তা [illegible] পরিস্থিতিতে বহুদেশে [illegible] নিরাপত্তা ক্রমশ কমে আসছে। গত [illegible] পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সময়ের ম[illegible] অন্ততপক্ষে দশ-পনেরজন দূত এবং অন্যান্য কূটনীতি[illegible] ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস-বাদীদের দ্বারা প্রথমে অপহৃত হয়েছেন, তারপর তাঁরা তাদের হাতে নিহত হয়েছেন।

ভারতীয় কূটনীতিকগণও এই লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পান নি। কয়েক বছর আগে আটোয়াতে ভারতীয় হাইকমিশনে এন আর পিলাই কনস্যুলার বিভাগের প্রথম সচিব হিসেবে কাজ করছিলেন। যুগোশ্লাভিয়া থেকে আগত এক রিফিউজী যুবক প্রায়ই ভারতীয় হাইকমিশনে আসত ভারতে আসবার ভিসার জন্য। বিশেষ কারণে তাকে ভিসা দেওয়া সম্ভব

হয়নি। ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন হাইকমিশনের রক্ষীদের অগোচরে পিলাইয়ের ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। কয়েক বছর আগে ক্যানবেরায় ভারতীয় হাই-কমিশনের মিলিটারী এ্যাটসে এবং তাঁর স্ত্রী একদল সন্ত্রাসবাদীর হাতে গুরুতরভাবে আহত হন। বছরখানেক আগে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের কয়েকজন কর্মচারী সন্ত্রাসবাদীদের ছোরার আঘাতে জখম হন। মেলবোর্ন শহরেও দুর্বৃত্তদের হাতে ভারতীয় কূটনৈতিক নিগৃহীত হন।

এই গেল কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর অপকর্মের কথা। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটলো পূর্ব পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খানের গণহত্যার সময়ে। ইয়াহিয়া সরকার সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের সকল কর্মচারীদের চার মাসের মত গৃহবন্দী করে তাঁদের কূটনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করলেন। অপরিসীম লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগ ভোগ করে এই সকল কর্মী শ্রান্তদেহে ক্লান্ত মনে দেশে ফিরে এসেছিলেন সেবার। এই লেখকও সেই বন্দীদের মধ্যেএকজন।

উনিশশ একাত্তর সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ডেপুটি হাইকমিশনার সহ ভারতের অন্যান্য কুটনীতিক এবং অন্যান্য সকলস্তরের কর্মীবৃন্দের সপরিবারে ঢাকায় নিজেদের গৃহে অন্তরীন থাকার দুঃসহ দিনগুলির তিক্ত স্মৃতি এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেই সময় বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁনের সন্ত্রাসের রাজত্ব, শেখ মুজিবুর রহমানের অভ্যুদয়। ঘৃণ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের বলি হাজার হাজার বাঙালীর রক্তে খাত বঙ্গভূমী, বাঙ্গালার মুক্তিসংগ্রাম, ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পন এবং পরিশেষে বাংলাদেশে স্বাধীনতার নবসূর্যোদয়ের আনুপুর্বিক কাহিনী আজ ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ। কিন্তু সে ক্রান্তিকালের জঠরে ইতিহাসের যে ভ্রুনটি দিনের পর দিন তার যে আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে তার পূর্ণায়বয় লাভ করেছিল তার মুষ্টিমেয় সাক্ষীর মধ্যে সেদিন এই লেখক ও ছিল

একজন। মদ্যপ অপরিনামদর্শী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অস্থির চিত্ত এবং দাম্ভিক ইয়াহিয়া খাঁন হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কলঙ্কমুক্ত হয়েই ইতিহাসে আপন স্থান করে নিতে পারতো, যদিনা তার ভাগ্যাকাশে মারণ রাহুর মত জুলফিকার আলী ভুট্টোর অশুভ উদয় না হতো। উনিশশো একাত্তর সালের ২৩শে মার্চ ভুট্টোর কুপরামর্শে ইয়াহিয়া খাঁন শেখ মুজিবের হাতে তার প্রার্থিত পাত্রটি এগিয়ে দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত ইয়াহিয়া তার হাত গুটিয়ে নিল। এ প্রসঙ্গ দীর্ঘ করবোনা। একাত্তর সালের ২৫শে মার্চ রাত্রি বারোটা থেকে ১২ আগষ্টের দিনটি পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যে সেসময় ঢাকায় যা জুটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করবো।

উনিশশো সত্তর সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে তাঁর আওয়ামী লীগ দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। যে ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। সেই দাবীর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করলো আওয়ামী লীগের সংসদীয় সদস্যদল। ইয়াহিয়া খাঁন ঘোষণা করলেন যে পাকিস্তানের কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমলীর প্রথম অধিবেশন বসবে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ। বলা বাহুল্য, জুলফিকার আলীর বিরোধীতায় এই অধিবেশন মুলতুবী হয়ে গেল। নির্ধারিত দিনে অধিবেশন স্থগিত হওয়ার ফলে ঢাকায় ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হল। উত্তেজনা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলস্বরূপ মিলিটারীর গুলিতে কয়েকটি তরুণ বাঙালীর তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইয়াহিয়া খাঁন এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা ১৪ই মার্চ ঢাকা এলেন শেখ সাহেবের সঙ্গে পুনরায় আলাপ আলোচনা করতে। ভুট্টো এলেন ২২শে মার্চ। তিনি ও আলোচনায় বসলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কিন্তু ভুট্টো শেখ সাহেবের সঙ্গে আপোষ মিমাংসার জন্যে ঢাকায় আসেনি। এসেছিল এক গভীর দুরভিসন্ধি নিয়ে। তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ইয়াহিয়া খাঁনকে বললেন, আরে প্রেসিডেণ্ট সাহাব—ইয়ে বাঙ্গালী কুত্তালোগনকে

সাথ বকবক করনেসে কুছ ফয়দা নেহি হোগা। রাইফেলকা গোলীসে বাত কিজিয়ে, দেখেঙ্গে দোরোজ কে অন্দর ইয়েসব আপকা পায়ের চাটনা শুরু করেগা।

ভুট্টোর পরামর্শে বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করবার 'সহজ' পথ বেছে নিল ইয়াহিয়া যার ভয়াবহতার প্রথম প্রকাশ ২৪শে মার্চের মধ্যরাত্রে। এই পৈশাচিক ধ্বংসলীলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার পরিসর এখানে নেই। তাই আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাটাই বলছি। ২৬শে এপ্রিল সকালে দূতাবাসে গিয়ে দেখলাম সারা অফিসটি পাকিস্তান মিলিটারী ঘিরে আছে। মেন গেট দিয়ে গাড়ী নিয়ে ঢুকতে যাওয়ার মুখে পাকিস্তানের একজন মিলিটারী অফিসার আমার পরিচয় পত্র দেখতে চাইলো। সব ব্যাপারটা এক লহমায় বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলনা। পরিচয় পত্র দেখিয়ে অফিসের ভেতরে এলাম এবং সরাসরি ডেপুটি হাইকমিশনারের ঘরে গেলাম। দেখলাম তিনচারজন পাকিস্তানী মিলিটারী অফিসার তারে ঘিরে বসে আছেন। সঙ্গে পাকিস্তান ফরেন অফিসের একজন কর্মকর্তা। ডেপুটী হাইকমিশনারকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই তিনি বললেন, আজ থেকে আমাদের ঢাকা অফিস বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সকলে আগামী ৬ই মে দু'খানা রুশ বিমানে দিল্লী ফিরে যাবো। তিনি আরো বললেন, সঙ্গে মালপত্র সামান্যই নেবেন। ভারী ব্যাগেজ ভালো করে প্যাক করে আপনার বাড়তেই রেখে যান, পরে ওগুলো চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরে আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনের সকল কর্মীবৃন্দ অফিসের ছাতে গেলাম এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নামিয়ে নিয়ে এলাম। আমাদের ঢাকার অফিস বন্ধ হয়ে গেল। পাকিস্তানের মিলিটারীর অধিকারে চলে গেল অফিস ঘরটা।

এবার যতশীঘ্র দিল্লীতে ফেরা যায় সকলের সেই ভাবনা। কি কি সঙ্গে যাবে আর কি কি ভারী লগেজ কাঠের বাক্সে মজবুত করে প্যাক

করে রেখে যাওয়া হবে তা ঠিক করে প্যাকারদের খবর দিলাম। প্যাকাররা এসে কাজ শুরু করে দিল। ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। তার বাড়ীর গেটের সামনে গাড়ী থেকে নেমে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখলাম, বাড়ীর কম্পাউণ্ড ওয়ালের চারপাশে সশস্ত্র মিলিটারী সেপাই মোতায়েন করা হয়েছে এবং গেটের সামনে একজন মেজর কিংবা কর্ণেল গোছের অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাড়ীর অঙ্গনে ঢুকতে যাওয়ার মুখে তিনি বাধা দিলেন।

বললেন, আপনি ভেতরে যাবেন না।

যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হলাম।

তিক্ত কণ্ঠে ঐ মিলিটারী অফিসারটিকে বললাম, ডেপুটি হাইকমিশনারের আবাস আন্তর্জাতিক আইন ও ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে ভারতীয় এলাকা। আমি একজন ভারতীয় কুটনীতিক। ওখানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি পথ ছাড়ো আমি ভেতরে যাবো।

মিলিটারী অফিসারটি বোধকরি বেলুচিস্তানের লোক। একটু ঝুঁকে পড়ে যেন মিনতির সুরেই আমাকে বললো, আমাদের উপর যে নির্দেশ রয়েছে তা অমান্য করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি ফিরে যান।

নিষ্ফল আক্রোশে সারা শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। বাড়ী ফিরে এসে গৃহিণীকে বললাম, আমার মনে হয়না আগামী ২ই মে দিল্লী ফিরে যেতে পারবো। ওরা মিলিটারী বসিয়ে ডেপুটি হাইকমিশনারকে ইতিমধ্যেই গৃহবন্দী করেছে। আমার কথা শুনে অনাগত বিপদের আশঙ্কায় আমার স্ত্রীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। একটা চরম ঔদাস্য আমার মনে একটা ভারী বোঝার মত চেপে বসলো এবং সেই সঙ্গে ২ই মে দিল্লী ফিরে যাওয়ার আশায় জলাঞ্জলী দিতে হ'ল।

তবুও ক্ষীণ আশায় ভর করে ঐ দিন দুপুরে প্যাকার ডাকতে বাড়ীর বাইরে আসতেই সাধারণ পোশাক পরা একটি লোক গাড়ীর

সামনে এসে বললো, স্যার আপনি বাইরে যাবেননা। গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ীর ভেতর যান।

জিজ্ঞাসা করলাম, মহাশয়, আপনি কে? আর আমাকে এই নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিল?

গোয়েন্দা বিভাগের ঐ চরটি কোন প্রকার মৌখিক ভাবান্তর প্রকাশ না করেই বললো, আমি কে তা জেনে আপনার লাভ নেই, তবে এটা 'মার্শাল ল'-এর অর্ডার। আপনি ভেতরে যান।

আমি রুক্ষ কণ্ঠে বললাম, আমাকে এ সম্পর্কে লিখিত অর্ডার দিতে হবে। তা সে 'মার্শাল ল'ই হোক আর মার্শাল-ল লেসনেসই হোক।

চরটি মৃদু হেসে বললো, আমাদের ডি, এস, পি সাহেব এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আপনি বাড়ীতেই অপেক্ষা করুন।

আমাদের গতি কি হতে যাচ্ছে বুঝতে কষ্ট হলনা, বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললাম, দিল্লী যাওয়ার কথা আপাতত ভুলে যাও। এবার আমাদের হাতেও হাতকড়া পরলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে?

বললাম, মানে অতি সহজ। ডেপুটি হাইকমিশনারের যে গতি আমাদের সকলকারই বোধ করি সেই একই গতি হল।

আমার অন্যান্য সহকর্মীদের খবর নেবার ইচ্ছায় টেলিফোনের রিসিভারটা কানে লাগিয়ে দেখলাম সেটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, সকাল বেলাও ওটা কাজ করছিল। বুঝলাম আয়োজন সবই সম্পূর্ণ হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় একদল সশস্ত্র বাঙ্গালী পুলিশ এলো আমার বাড়ীতে। ওদের দলপতি আমাকে বললেন, আপনার "প্রোটেকশনের" জন্যে ওরা দিনরাত আপনার বাড়ী পাহারা দেবে।

বললাম, আপনার রসিকতাটা কিন্তু উপভোগ করতে পারলাম না।

দলপতি চলে গেলেন। সশস্ত্র পুলিশ ছেলেরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

তোমাদের ডিউটিটা কি?

একটি যুবক মৃদু হেসে বললো, ও কথা আর জিজ্ঞেস করছেন কেন, স্যার। সবই ত শুনলেন, আপনি ও বাইরে যেতে পারবেননা। বাইরে থেকে কেউ আপনার বাড়ীতে ঢুকতেও পারবেনা।

জিজ্ঞেস করলাম, যদি মিলিটারী ঢোকে।

যুবকটি এর কোন জবাব দিল না।

বুঝলাম এই আমার "প্রোটেকশনের" ব্যবস্থ।

অফিস বন্ধ হওয়ার পাঁচসাতদিনের মধ্যেই দিল্লী ফিরে যাব এই প্রত্যাশায় ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য কিছুই মজুত করিনি। আমার স্ত্রী জানালেন ঘরে চালডাল যা আছে তাতে বড় জোর তিন চার দিন চলতে পারে।

চারপাঁচ দিন চাল-ডাল সেদ্ধ করে চললো, কিন্তু পঞ্চম দিনে ঘরে কিছুই নেই। অথচ সামান্যতম চাল সংগ্রহ করার কোন উপায়ই খুঁজে পেলাম না। কারণ বাড়ীর বাইরে একলা বেরুবার উপায় নেই। আমাদের অনাহারের আশু সম্ভাবনার আতঙ্কে আমার স্ত্রীর মুখ পাণ্ডর হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে কি কিছুই নেই?

তিনি বললেন, চা আছে, কিছু গুড়ো দুধের টিন আছে আর কর্নফ্লেকস্ আছে।

বললাম, আর যখন কোন উপায় নেই তখন অনেকটা দুধ দিয়ে কর্নফ্লেকস্ খাওয়া যেতে পারে।

সাতদিন ঐ কর্নফ্লেকস্ আর দুধ খাওয়া চলল। সকালে, দুপুরে, রাত্রে ঐ একই পথ্য। তিনচার দিন পর ঐ কর্ণফ্লেকস আর দুধ দেখলে গা গুলিয়ে উঠতো। কিন্তু নিরুপায় হয়ে সেই গুলোই দিনে তিনবার করে তিনজনে গিলে ফেলতাম। কিন্তু সাতদিনের মাথায় সেই গুড়ো দুধ আর কর্ণফ্লেকসও শেষ হয়ে এলো। তারপর উপায়।

প্রাঙ্গনে প্রহরারত একটি বাঙ্গালী সেপাইকে আমাদের এই

দুরবস্থার কথা বললাম, সে বললো, যদি কয়েকটা টাকা আমাকে দিতে পারেন তবে কিছু চাল ডালের সংস্থান করে দিতে পারি।

আমি বললাম, আমার হাতে ত একটি পয়সাও নেই, দিল্লী ফিরে যাবো বলে অফিস থেকে পাকিস্তানী টাকার বদলে ডলার চেক নিয়েছি। ও টাকা ত তুমি ভাঙ্গাতে পারবেনা। তার থেকে তুমি এক কাজ কর। তোমাদের সুবেদারকে আমাদের খাদ্যাভাবের কথা জানাও আর তাকে বল যে বাইরে যাওয়ার অনুমতি না দিলে আমরা কিন্তু না খেয়ে মরবো, তার পরিণাম কিন্তু তোমার দেশের সরকারের পক্ষে শুভ হবেনা।

সেপাই ছেলেটি বললো, আপনাদের কথা, গতকাল সুবেদার সাহেবকে জানিয়েছি, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য না করে তিনি চলে গেলেন।

সেপাই ছেলেটির কথায় একটা বিষয় আমার কাছে যেন আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে এরা আমাদের হাতে না মেরে ভাতে মারার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

সহসা একটা দুর্জয় ক্রোধ যেন আমাকে পেয়ে বসলো। কে-যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠলো, এই জঘন্য অন্যায়কে কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না। এই শৃঙ্খল আমি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো, তা কপালে যাই থাক না কেন। গেটের তালা ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বো এই অন্যায় অবরোধের প্রতিবাদে। এভাবে আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া থেকে এর সমুচিত প্রতিবাদ করতে গিয়ে মেশিন-গানের বুলেটে মরাও অনেক শ্রেয়। আমার স্ত্রী এবং কন্যা আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝেই বিনা প্রতিবাদে এই বাধ্যতামূলক অনশনের শরিক হয়েছেন। কিন্তু যাদের ভরণপোষনের সমস্ত দায় শুধু আমারই, তারা আমারই চোখের সামনে ক্ষুধার জ্বালায় মরবে, সেই দৃশ্যটা কল্পনা করে আমি যেন মরীয়া হয়ে উঠলাম। ধৈর্য্যের সমস্ত বাঁধ যেন এক নিমিষেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

চিৎকার করে বলে উঠলাম, আমি বাইরে যাবই। দেখি কার সাধ্য আমাকে আটকায়।

চিৎকার শুনে আমার স্ত্রী দৌড়ে এলেন। উৎকণ্ঠাগ্রস্থ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে। এত চেচাচ্ছ কেন ?

বললাম, এই অবরোধ আমি মানি না। আমি বাড়ীর বাইরে যাব।

এই বলে যেই উঠতে গেছি, আমার স্ত্রী ও কন্যা যুগপৎ আমাকে ধরে ফেললো। প্রবল ক্রন্দনের বেগ দমন করে আমার স্ত্রী বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? তুমি বাইরে যাবে কি ? বাইরে যাবার বিপদ জান ? না খেয়ে আমরা তিনজনে যদি এখানে মরি তবে আমরা ত একাই মরব না, আরও ২৫০ জন ভারতবাসীও মরবে। আমরা সবাই এভাবে নিঃশেষ হলে তুমি কি মনে কর পাকিস্তান সরকারের এই জঘন্য অপরাধের নিরব দর্শক হয়ে থাকবে আমাদের সরকার। তা কখনই হতে পারে না। আমাদের সরকার গুনে গুনে এর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু তুমি যদি ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এদের নির্দেশ অমান্য কর তবে ভারত সরকারের হাতও দুবল হবে। ও তুমি করতে যেও না। দু'দিন অপেক্ষা করে দেখনা কি হয়। তুমি না একজন কূটনীতিক, তোমার কি ধৈর্যহারা হলে চলে ?

বললাম, ঠিক আছে, আমাকে ছেড়ে দাও। বাইরে যাব না।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান ফরেন অফিসে আরো একখানা চিঠি পাঠিয়েছি। সুবেদারের হাতেও চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তারা নিশ্চল, নির্বিকার। ডেপুটি হাইকমিশনার এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীদের অবস্থা কি তাও জানবার উপায় নেই। কারণ আমার টেলিফোনটা অচল করে দেওয়া হয়েছে। পরে শুনেছিলাম ডেপুটিকমিশনার সাতদিন শুধু চা খেয়ে বেঁচেছিলেন। আটদিনের মাথায় একজন মিলিটারী অফিসার তার জন্যে খাবার এনেছিলেন, তিনি লাথি মেরে সেই খাবার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমার অফিসের প্রত্যেকটি কর্মচারীর

খাওয়ার ব্যবস্থা করে তারপর আমার কাছে এসো। যাও, এখুনি এখান থেকে বিদেয় হও।

সেদিন বন্ধনদশার নবম দিন। সারাদিন বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয়নি। বাগানে কয়েকটা ঢ্যাড়স আর কাঁকরোল হয়েছিল। সেগুলো সেদ্ধকরে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম।

তখন সূর্য ডুবে গেছে, সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে নদীর বুকে। ঘর ছেড়ে প্রাঙ্গনে এলাম। ঘুরতে ঘুরতে পেছনের কম্পাউণ্ড ওয়ালের ধার ঘেসে একটু এগিয়ে গিয়ে নদীটার দিকে তাকালাম। দেখবার মত কিছুই নেই। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়াল সংলগ্ন ঘাসের উপর চোখ বুলোচ্ছি, হঠাৎ ঝোলার মত কি একটা বস্তু নজরে এলো। কাছে গিয়ে দেখি বাজার করার মত একটা চটের ব্যাগ। তুলতে গিয়ে দেখি বেজায় ভারী। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ব্যাগটা টেনে তুলে তার ভেতরে নজর পড়তেই যা দেখলাম, তাতে করে গ্রীক দার্শনিকের মত আমারও গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে হ'ল—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি।

ঝোলাটাকে টেনে এনে বারান্দায় উবুড় করতেই দেখতে পেলাম, তারমধ্যে পাঁচ-ছয় কিলো সরু চাল, কিলো দুই ডাল, তেল, নুণ, কিছু মশলার গুঁড়ো, আলু, পটল আর একটা প্রকাণ্ড ইলিশ মাছ। বিস্ময়ের তখনো বাকি ছিল। মাছটার পেটের নিচে এক বাণ্ডিল নোট। গুণে দেখলাম পাঁচশো টাকা।

চিৎকার করে স্ত্রীকে ডাকলাম, শীগগীর দেখবে এসো। তিনি দৌড়ে এসে ঐ দৃশ্য দেখে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জিজ্ঞেস করলেন এগুলো পেলে কোথায়?

আমি বললাম, লনের শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেসে একটা ঝোলার মধ্যে।

আমার স্ত্রী এক এক করে দ্রব্যগুলো রান্নাঘরে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, কে দিয়ে গেল এগুলো। এর মধ্যে কারও কোন দুরভিসন্ধি নেইত?

আমি বললাম, তোমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারবো না, কারণ আমি এর কিছুই জানি না।

চা খেতে খেতে ভাবলাম, কার এই সহৃদয়তা? অসীম ঝুঁকি নিয়ে কে এই আহার্য-দ্রব্য ফেলে দিয়ে গেল। সে এলই বা কোন পথে, গেলই বা কোন পথে? নিজেকে আবার প্রশ্ন করলাম, চারিদিকে শত্রুববষ্টিত এই পুরীতে কে আমার এমন অকৃত্রিম সুহৃদ, যে নিজের বিপদ তুচ্ছ করে এই আহার্য সামগ্রী আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল।

এই প্রশ্নের জবাব বোধকরি কোনদিনই পাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার সুযোগও বোধকরি জীবনে আর পাবনা।

বার তেরদিন প্রায় অনশনের পর একদিন সকালে সেই বহু প্রতীক্ষিত সুবেদার উদয় হলেন। তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে আমি হাটবাজারে যেতে পারবো সপ্তাহে দু'দিন করে, তাও দু'ঘণ্টার জন্যে। ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হলে একটা বিশেষ ওষুধের দোকানেও যেতে পারবো ওষুধ কেনার জন্যে। যেতে হবে পুলিশের জীপ গাড়ীতে সশস্ত্র পুলিশগার্ড পরিবৃত হয়ে। তিনি বিদায় নেবার আগে এই আশ্বাসও দিয়ে গেলেন যে ইচ্ছে করলে আমি ঐদিন থেকেই এই সুবিধে টুকু গ্রহণ করতে পারি। এই বলে একটা কাগজে আমার একটা দস্তখৎ আর টীপ সই নিয়ে আমার হাতে তিনশ টাকা দিয়ে গেলেন।

অনাহারের দুর্ভাবনা থেকে বাঁচলাম। কিন্তু দিল্লী ফিরে যাওয়া? যেই অনিশ্চয়তার মধ্যে এই দশবারো দিন কাটলো সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই একটি একটি করে দিন কাটতে লাগলো। এক একবার দিল্লীতে ফিরবার সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার দু'একদিনের মধ্যেই তা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বাইরের জগতের সঙ্গে একমাত্র সংযোগ রেডিওটি। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সবগুলো সংবাদ বুলেটিন শুনি, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার খবর পাই। কিন্তু আমাদের দেশে ফেরা সম্পর্কে আকাশবাণীও চুপ। পাকিস্তান রেডিও খুশিমত সংবাদ

প্রচার করে। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। এর মধ্যে বন্দীজীবনের আড়াই মাস সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। হঠাৎ একদিন আকাশবাণী থেকে বলা হল ঢাকায় বন্দী ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারত সরকার সুইস সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করেছে। সুইস সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

খবরটা শুনে ক্ষণিকের জন্যে মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। বিপদক্লিষ্ট মন বেশীক্ষণ আশাবাদী হয়ে থাকতে পারে না। তাই পরক্ষনেই মনে হল এ সব প্রচেষ্টা ফলবতী হবে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু অন্য ব্যবস্থাটা যে কি নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কেও কোন স্পষ্ট ধারনা মাথায় এলনা আর এলেই বা তখন কি করতে পারতাম।

সাতআট দিন আশা নিরাশার দোলায় পাক খাচ্ছিলাম। আট দিনের মাথায় পাকিস্তান রেডিও বললো, সুইস সরকারের মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে ভারত সরকার যে শর্তাবলী আরোপ করেছে তা পাকিস্তান সরকার মেনে নেয়নি, তাই আলাপ আলোচনার এখানেই ইতি।

যে আশানিরাশার দোলায় এ কদিন ঘুরপাক খাচ্ছিলাম হঠাৎ যেন সেই আশার দড়িটা ফটাং করে ছিঁড়ে গেল। ছিটকে পড়ে গেলাম এক নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবার আর যেন কোন উপায় নেই। অনন্তকাল যেন এই আলোহীন বায়ুহীন গহ্বরে পড়ে থাকতে হবে। কোন পথিক যেন এই গহ্বরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবেনা। তাদের চোখে পড়বেনা কতকগুলো মৃত্যুপথযাত্রীর ঘোলাটে চোখের অসহায় ভাষা, শুনতে পাবেনা তাদের মুক্তির সকরুণ আবেদন।

রেডিওটা আর শুনতে ইচ্ছে করে না। প্রাঙ্গনের শেষে নদীর ধারে গিয়েও দুদণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। বাগানে কাকরোল আর ঝিঙ্গে লতায় অপর্য্যাপ্ত ফল ধরেছে। কিন্তু ফসলের প্রাচুর্য মনে আর কোন প্রফুল্লতা আনে না। সেপাই ছেলেরা তেমনি করে আগের মতই

শুকনো পাঁউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তা দেখে মনে কোন দুঃখ বোধ নেই। অশীতিপর বয়সের এক বৃদ্ধা শতছিন্ন বস্ত্রে কোন রকমে তার শীর্ণ দেহটা ঢেকে গেটের বাইরে একমুঠো অন্নের জন্য কাকুতিমিনতি করতে থাকে। তাকে দেখেও মনে কোন অনুকম্পা জাগে না। দূর থেকে একটা আধুলী ছুঁড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে যাই। বোবা দৃষ্টি নিয়ে আমার মেয়ে আমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! তাকে যেন দেখেও দেখি না। গাড়ীটার গায়ে সহরের সমস্ত বেকার ধুলো এসে জমেছে। ঝেড়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করি না।

এমনি করেই আগস্ট মাসের ৯ তারিখ এলো। তখন অপরাহ্ণ। সময় বোধ করি পাঁচটার কাছাকাছি। ক্লান্ত মন নিয়ে বাইরে এসে সেপাই ছেলেদের তাস খেলা দেখছি। হঠাৎ বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড কালো রঙ-এর গাড়ী মন্থর গতিতে আমার বাড়ীর দিকে এগুচ্ছে, আর গাড়ীটার বনেটে যেন আমাদের জাতীয় পতাকা উড়ছে।

তড়াক করে লাফ দিয়ে গাড়ীবারান্দার দিকে এসে দাঁড়ালাম। বহুদিনের পরিচিত গাড়ী। চিনতে ভুল হল না যে ওটি আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনারের গাড়ী। পাহারারত সেপাইটি গেটের দরজা খুলে দিল। গাড়ী ধীরে ধীরে অঙ্গনে প্রবেশ করলো।

প্রথমেই ডেপুটি হাই কমিশনার গাড়ী থেকে নেমে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে চোখে জল আসার উপক্রম। শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছেন।

একটু ম্লান হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সবাই ভাল আছেন তো?

বললাম, ভাল, কিন্তু আপনি কেমন আছেন?

একথার উত্তর তিনি দিলেন না।

গাড়ী থেকে আরো তিনজন আরোহী নেমে এলো। এদের মধ্যে একজন ইয়োরোপীয়। বাকি দুজনকে আমি চিনি। পাকিস্তান ফরেন অফিসের বাঙ্গালী অফিসার।

এঁদের সবাইকে নিয়ে ডেপুটি হাই কমিশনার ঘরের মধ্যে এলেন। তিনি বললেন, আমরা সবাই আগামী ১২ই আগস্ট দিল্লী ফিরে যাব। ঐ ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, ইনি সুইস সরকারের প্রতিনিধি। আমাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে এসেছেন। তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। সকলকে নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বললেন, মালপত্র সামান্যই সঙ্গে নেবেন। বাকি জিনিষপত্র পরে জাহাজে যাবে। এই বলে ডেপুটি হাই কমিশনার চলে গেলেন।

যে সংবাদটা পাবার জন্যে আজ দীর্ঘ চার মাস আকুল আগ্রহ নিয়ে অসীম প্রতীক্ষায় প্রতিটি প্রহর গুনেছি, সেই সংবাদটি পেয়েও কেমন যেন জড়বুদ্ধি হয়ে গেলাম। এত বড় একটা সুসংবাদ দৌড়ে গিয়ে যে স্ত্রী ও কন্যাকে জানাবো তাও যেন ভুলে গেলাম।

আমার দৃষ্টি তখন সায়াহ্নের আকাশে। তখন সূর্য্যাস্ত হয় হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টুকরো টুকরো মেঘের গায়ে সূর্য্যের সাত রং যেন চৌষট্টি রং ধরেছে। জীবনে অনেক রঙীন সূর্য্যাস্ত দেখেছি। মেঘের গায়ে রং-এর খেলাও কম দেখিনি। অষ্ট্রেলিয়া আর আর্জেন্টিনার পথে-প্রান্তরে কতবার গাড়ী থেকে নেমে মেঘের গায়ে এই অপূর্ব বর্ণালীর রঙীন ছবি তুলেছি। সেদিন এই বর্ণচ্ছটা মনকে মুগ্ধ করেছে। সৌন্দর্য্যানুভূতিতে হৃদয় উদ্ভাষিত হয়েছে। কিন্তু আজ মেঘের কোলে এই রং-এর ছটা যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে জীবনে একটা পরম পাওয়ার পথকে আলোকময় করে দিল।

বাড়ীর ভেতর থেকে একটা কলরব শুনতে পেলাম। ভেতরে যেতেই বুঝলাম সুখবরটা ইতিমধ্যে তাদের কানে পৌঁছে গেছে। আমার মেয়ে একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে পা-দুটোকে দ্রুতবেগে দুলিয়ে যাচ্ছে। পেছনের শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম আমার স্ত্রী গৃহদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছেন।

প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে বললাম, সব শুনেছো? তিনি

মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ। আর দুটো দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি।

মনে হল অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থেকে তিনি তখনো তাঁর মনকে মুক্ত করতে পারেননি।

কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে আর কি কি ফেলে যেতে হবে তাই নিয়ে আলোচনান্তে বাঁধাছাঁদা আর প্যাকিং-এ একটি দিন চলে গেল।

১১ই আগস্ট বিকেলে সুইস কনসাল জেনেরাল আমার বাড়ীতে এলেন। বললেন, ঐদিন রাত্রি ১টার সময় গাড়ী আসবে আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যেতে। আমরা যেন তৈরী হয়ে থাকি।

জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি এখান থেকে সরাসরি এয়ার-পোর্টে যাবো।

তিনি বললেন, না, প্রথমে আপনাদের সবাইকে রমনা থানায় যেতে হবে। তারপর সবাই একসঙ্গে এয়ারপোর্টে যাবেন। এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর পেছনের দেয়ালের কাছে দাঁড়ালাম। নদীটাকে শেষবারের মত দেখে নেব বলে। মনে হ'ল, ক্ষীণস্রোতা হলেও এই নদী দিয়ে ১০৮ দিনে অনেক জল বয়ে গেছে। আর মনে হল এই নদীটাও যেন আমাদের দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন কর্মহীন কারাবাসের প্রতীক। এই নদীটার মত আমাদের জীবনেও ছিলনা "হাঙর কুমীরের নিমন্ত্রণ, না ছিল রাজহাঁসের।" বৈচিত্রহীন জীবনটা শুধু ব্যাং-এর একটানা ডাকের মত গোঁ গোঁ করেছে এত দিন।

দেখতে দেখতে যাওয়ার লগ্ন উপস্থিত হল। ড্রাইভওয়ের উপর অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলাম। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত্রি একটা বেজে পনের মিনিট।

কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বড় বাস বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেতরে বসে ছিলেন আমারই সহকর্মীরা।

একজন পুলিশ অফিসার বাড়ীর ভেতরে এসে বললেন, আপনারা গাড়ীতে উঠুন। মালপত্র গাড়ীতে তুলবার ব্যবস্থা আমি করছি।

বাসে উঠবার আগে বাড়ীটার দিকে শেষবারের মত তাকালাম। এক সময়ের নিভৃত সুখগৃহ আজ আমার কাছে শুধুই পরিত্যক্ত কারাগৃহ। গাড়ীতে উঠতে উঠতে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার একটি চরণ মনে পড়লো—"হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড অব ম্যান"।

বাসে উঠতেই আমার সহকর্মীরা সোল্লাসে আমাকে অভ্যর্থনা করলো। সে এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা। কতদিনের চেনা মানুষগুলোর সঙ্গে যেন আবার নতুন করে পরিচয় হল।

গভীর রাত্রে জনপ্রাণীহীন বহুদিনের পরিচিত প্রায়ান্ধকার পথ ধরে বাস এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে রইলো মৈমনসিংহ রোড, এয়ার পোর্ট রোড। শাহবাগ রোড। দূর থেকে দেখতে পেলাম রমনা ঘোড় দৌড়ের মাঠের সাদা সাদা রেলিংগুলো। শাহাবাগ হোটেল ছাড়িয়ে যেখানে গলফ ক্লাবের সীমানা শুরু সেখানে এসে হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। যান্ত্রিক গোলযোগ। ড্রাইভার গাড়ীথেকে নেমে গাড়ীর বনেটটা খুলে এটা ওটা পরীক্ষা করতে লাগল। অত রাত্রিতেও মোসুমী আদ্রতায় বাতাস গরম আর একটা অসহ্য শ্বাস রোধকারী গুমোটভাব। গাড়ী থেকে আমিও রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

রমনার ঘোড়দৌড়ের বিশাল মাঠটাকে মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারের খাপে ঢাকা এক বিরাট নদী। জনহীন শব্দহীন, বায়ুলেশহীন এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশটাকে একবার দেখে নিলাম। ঠিক মাথার উপর বৃশ্চিকরাশিটা জ্বজ্জ্বল করছিল। কতক্ষণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জানিনা, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কলরবে মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হল। যেন দেখলাম অন্ধকার আর নেই। স্বচ্ছ দিনের আলোয় সারা মাঠটা ভরে গেছে। মাঠ লোকে লোকারণ্য। বোধকরি তিনচার লক্ষের অধিক জনসমাগম হয়েছে। মাঠের মাঝখানে নৌকাকৃতি একটা বিরাট মঞ্চ। সেই মঞ্চের ঠিক মাঝখানে প্রায় দশবার হাত

দীর্ঘ বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা উড়ছে! ঠিক তারই নিচে প্রায় আট দশটা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অমিতবিক্রমশালী মহাতেজা এক যোদ্ধা। গারিবল্ডি কিংবা মাৎসিনি যেন শেখ মুজিবুরের দেহ ধারণ করে বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন এই দুর্ভাগা দেশের বন্ধনের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিতে।

সহসা তাঁর বজ্রকণ্ঠ শুনতে পেলাম—"এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনাদের কাছে আমার এই অনুরোধ রইলো, আপনারা ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলুন। আর আপনাদের যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করুন।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "তোমরা মনে রেখো সাতকোটি মানুষের দাবী বন্দুক কামান দিয়ে তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবানা। আমাদের যা ন্যায্য দাবী তা আমরা আদায় করে ছাড়বো। তোমরা যদি আমাদের উপর মেশিনগান চালিয়ে আমাদের হত্যা কর, তবে তোমরাও রেহাই পাবা না। আমরা তোমাদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।"

সহসা সবকিছু যেন কোন এক ইন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে শূন্যে মিলিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোকের এই বিরাট জনসমুদ্র এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। দেখলাম যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

মোটরের ইঞ্জিনটা গড়গড় শব্দ করে উঠলো, পুলিশ অফিসারটির ইঙ্গিতে গাড়ীতে উঠে বসলাম। বাসটা রমনা থানার চত্বরে এসে থামল। দেখলাম ইতিমধ্যে আরো সাত আট খানা বাস এসে গেছে। কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করতে হল। এরপর আমাদের উপর নির্দেশ হল বাইরে বেরিয়ে এসে প্রত্যেক পরিবারের একসঙ্গে সারবন্দি হয়ে দাঁড়াতে। পাইকাররা হাটে মুরগী কিনে যেমন একটি একটি করে গুণে গুণে খাঁচায় ভরে, আমাদেরও তেমনি করে গুণে গুণে আবার বাস ভর্তি করা হল। আমাদের বাসগুলো এবার ধীরে ধীরে এয়ার পোর্টের দিকে অগ্রসর হতে

লাগল। বাসগুলোর সামনে ও পেছনে সশস্ত্র পুলিশের জীপগুলো আমাদের এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছিল। পথঘাট তেমনি জনহীন। মাঝে মাঝে দু'একটা মিলিটারী জীপ উল্কাগতিতে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে।

এয়ারপোর্টের টারমিনাল বিল্ডিংএ এসে যখন পৌঁছুলাম তখনো রাত্রির অন্ধকার দূর হয়নি। সবাই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম! প্রায় ১ ঘণ্টা পর গেট খোলা হল। গেটে দু'জন সশস্ত্র সৈনিক। প্রথমে মেয়েরা গেল। সৈনিকযুগল তাদের ভ্যানিটি ব্যাগ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র দিল। আমাদের ব্রীফকেস পরীক্ষার পর সবাই ভেতরে এলাম।

সারা রাত্রি অনিদ্রায় শরীর ক্লান্ত। এক পেয়ালা চায়ের প্রয়োজন প্রায় সকলেরই। ভাবলাম পাকিস্তান ফরেন অফিস এটুকু সৌজন্য বোধকরি নিশ্চয়ই দেখাবে। কিন্তু এই প্রত্যাশাটুকুও যে ভ্রম হতে পারে তা পরে বুঝলাম। সেই ভোর পাঁচটা থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সকলেরই অভুক্ত অবস্থায় বসে থাকতে হয়েছিল আমাদের সকলের। অথচ আমরা যেখানে বসে আছি তার পাশেই রেষ্টুরেণ্ট। কিন্তু আমাদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি মিলল না। সর্বাপেক্ষা পীড়া দিচ্ছিল ছোটছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষুৎপিপাসার কাতরতা। ওরা এক ফোঁটা দুধ পেলনা, একমুঠো খাবার ওদের দেওয়া হল না। এয়ারপোর্টের বাইরের দোকান থেকে যে কিছু কিনে এনে এদের খাওয়াবো তার উপায় নেই। কারণ বাইরে বেরুনো নিষেধ।

পৃথিবীতে সব কিছুরই নাকি শেষ আছে। তাই এই অসহনীয় প্রহরগুলোও একসময় শেষ হল।

বেলা এগারোটার সময় মাইকের ঘোষনা আমাদের নির্দেশ দিল নিচে যেতে। সবাই হুড়মুড় করে নিচের লাউঞ্জে এলাম। দেখলাম দুটি বাস দাঁড়িয়ে আছে টার্মিনাল পয়েন্টে। আমাদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার সুইস বিমানটিকে টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে অনেক দূরে রান-

ওয়ের উপর রাখা হয়েছে। যেন অস্পৃশ্যের মত তারা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি ওরা এদিকে এলে টার্মিনাল পয়েন্টের শুচিতা যদি বা নষ্ট হয়।

সবাই বাসে গিয়ে বসলাম এবং অনতিবিলম্বে বিমানে চড়লাম। প্লেনদুটো মিনিট পনের ঝিম ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সিংহ-বিক্রমে গর্জন করে উঠল।

প্লেনদুটো ঢাকার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেল। পেছনে পড়ে রইলো অর্দ্ধমৃত ঢাকা নগরী, আর আমাদের দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসের নরকবাসের কলঙ্কিত ইতিহাস।

প্রায় পনের মিনিট পর বিমানের ক্যাপটেনের কণ্ঠস্বর মাইকে শুনতে পেলাম। তিনি ঘোষনা করলেন, "মে আই হ্যাভ ইয়োর এ্যাটেনশন প্লীজ। উই আর নাউ ফ্লায়িং ওভার ইণ্ডিয়ান টেরিটরি।"

অতগুলো যাত্রীর সম্মিলিত স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্লেনটা যেন একবার একটু দুলে উঠলো।

আমাদের এই কাহিনীর পরেও অনেক কাহিনী আছে। গত দশ বছরে অনেক কূটনীতিক বিদেশী আততায়ীর হাতে হয় নিগৃহীত, লাঞ্ছিত কিংবা হত হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে বাহান্নজন মার্কিন কূটনীতিকের তেহেরাণে প্রায় বৎসরকাল আটক অবস্থায় তাদের লাঞ্ছনার কথা সকলেই জানেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগেই লিখেছি যে সব দেশে ভারতীয় দূতাবাস রয়েছে, সেখানকার সরকারী মহল এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সময়ে সময়ে আদর আপ্যায়ন করা ভারতীয় দূত এবং দূতাবাসের অন্যান্য কূট-নীতিকদের একটি অত্যাবশ্যক কর্তব্য। 'ককটেল' কিংবা ডিনার পার্টির মাধ্যমে পরদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়, যার ফলে একদিকে যেমন কূটনীতিকদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় অপরদিকে তেমনি তাদের মনে ভারত-চিন্তার বীজ বোনা যায়, যার ফল প্রায় ক্ষেত্রেই শুভ হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিদেশে সফরকালে কখনও কখনও গণ্যমান্য ভারত সন্তানদের রুচির যে পরিচয় পেয়েছি তাতে লজ্জায় মাথা হেঁট করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না।

একবার আমাদের দেশের একজন মন্ত্রী ইওরোপের একটি দেশের সরকারী আমন্ত্রণে সেই দেশ সফর করতে যান।

সেখানে সেই দেশের এক মন্ত্রী এই ভারতীয় মন্ত্রীকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি যথারীতি খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন। ভারতীয় মন্ত্রীর ডানদিকে বসলেন ঐ দেশের মন্ত্রীর স্ত্রী আর বাঁদিকে সে দেশের মন্ত্রী মহোদয়। যথাসময়ে পরিবেশক ভারতীয় মন্ত্রীর পাতে দুটো বড় সাইজের 'ফিশফ্রাই' দিয়ে গেল। ভাজা মাছের পরিমাণটা প্রয়োজ-নাতিরিক্ত মনে হওয়ায় ভারতীয় মন্ত্রীমশাই ধাঁ করে একটা ভাজা মাছ হাত দিয়ে তুলে সেই দেশের মন্ত্রীপত্নীর ডিশে ফেলে দিলেন। লক্ষ্য করলাম তা দেখে আমাদের দূতের কর্ণমূল লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী নির্বাকার।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছিল পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশে। এ ব্যাপারও অপর এক ভারতীয় মন্ত্রীকে নিয়ে। ওদেশের এক মন্ত্রীর বাড়িতে তাঁর নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ। ভারতীয় মন্ত্রী চুড়িদার পাজামা আর শেরোয়ানী পরে এসেছেন। সৌজন্য বিনিময় হওয়ার পর সবাই এসে সোফায় বসলেন। বসেই আমাদের মন্ত্রীমশায় এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে নিয়ে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে তাঁর পা দোলাতে লাগলেন। আমাদের দূত তাঁকে ঐ গর্হিত কর্ম থেকে চোখের ইসারায় নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। তাতে যখন ফল হল না তখন তিনি আর থাকতে না পেরে বেশ জোরের সঙ্গে হিন্দীতে বললেন, স্যার এতক্ষণ পা দোলানোর ফলে আপনার পা নিশ্চয়ই ব্যথা করছে, এবার ওটা বন্ধ করুন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিনি ঐ দেশের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় এতই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে দূতের সতর্কবাণী কানেই তুললেন না। এরপর খাওয়া-দাওয়া ত কোনরকমে শেষ হলো। তারপর সবাই লাউঞ্জে এসে বসলো কফি পানের উদ্দেশ্যে। বেয়ারা আমাদের মন্ত্রীর হাতে কফি-পূর্ণ কাপ ধরিয়ে দিলেন। সামনে এগিয়ে ধরলেন দুধ আর চিনির পাত্র। গুড়ো চিনি নয়, চিনির চৌকা ডেলা। পাত্র থেকে চিনির ডেলাটি তুলবার জন্যে তার পাশে একটি মাঝারি সাইজের 'টং'। পরিবেশক মন্ত্রীমশায়ের হাতে সেই টংটিও ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু মন্ত্রীমহোদয় ঐ টং দিয়ে চিনির ডেলা না তুলে সেটি প্রায় পাঁচ মিনিট হাতে ধরে রইলেন তারপর কথাবার্তার মাঝখানে সেই টংটির অগ্রভাগ তাঁর নাকের ভেতর চালিয়ে দিয়ে টংটির টেনসন বারবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। টংটি মন্ত্রীর হস্তগত হওয়ায় অন্য অতিথিরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে নিরুপায় অবস্থায় একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে আমাদের দূতের ত ধৈর্যচ্যুতির অবস্থা। কোনরকমে টংটি মন্ত্রীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হল। ততক্ষণে অন্য অভ্যাগতদের কফি জুড়িয়ে জল।

আমাদের আর একজন মন্ত্রী অন্য একটি দেশ সফরে গিয়েছেন। তিনিও সেই দেশের এক মন্ত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছেন তাঁর

বাড়িতে। সঙ্গে আমাদের এ্যামবেসাডর রয়েছেন। আমাদের মন্ত্রী মশাই খুব সম্ভব 'ড্রিংকে' বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন না। এক গ্লাস হুইস্কি গলাধঃকরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সোফার একপ্রান্তে তাঁর মাথা এলিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় নাসিকা গর্জন শুরু করে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। আমাদের এ্যামবেসেডারের পরিস্থিতিটা অসহ্য হওয়ায় তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে গিয়ে সেই মন্ত্রীকে একটা ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলে বললেন, এ আপনি করছেন কী? উঠুন, ঠিক হয়ে বসে কথাবার্তা বলুন। বললে হবে কি? মন্ত্রীমহোদয়ের যোগনিদ্রা কি সহজে ভাঙতে চায়? আরো দু'চারটে গুঁতোগাতা দেওয়ার পর তিনি গায়ের আড়মোড়া ভেঙ্গে, ডজন খানেক হাই তুলে, ডানহাত মুখের কাছে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমাকে সংযুক্ত করে গোটা কয়েক তুড়ি মেরে, চোখ কচলাতে কচলাতে জবাকুসুমসঙ্কাশং চক্ষু যুগল উন্মিলিত করে কিছুক্ষণ সবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তারপর স্থান কাল পাত্রের ভৌগলিক অবস্থান ঠাওর করতে না পেরে এ্যামবেসেডরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ম্যায় কাঁহা হু঱়্ঁ?"

এ্যামবেসেডর বোধ করি মনে মনে বললেন, তুম তুড়ীয়লোকমে হো, কিন্তু প্রকাশ্যে বললেন, আপনি অমুক মন্ত্রীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। এতক্ষণ কারণবারি প্রাসাদাৎ একজন সংশপ্তকের মত নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এক্ষণে তন্দ্রার জড়তা বিমুক্ত হইয়া অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে বিশ্রামালাপে যুক্ত হোন।

মন্ত্রী মহাশয় তদুত্তরে বললেন, "ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। মেরে লিয়ে থোড়া নিম্বুপানি লাও।"

রাষ্ট্রদূত দাঁতে দাঁত ঘসে মনে মনে বোধ করি বললেন, তোমার নিম্বুপানিতে কাজ হবে না। তোমার দরকার হাইড্রোক্লোরিক এসিড। প্রকাশ্যে বললেন, জরুর জরুর, আভি লাতা হু঱়্ঁ।

ইণ্টারনেশনাল লেবার অফিসের এক আঞ্চলিক কনফারেন্স বসেছে

ব্যাঙ্কক সহরে। ভারতের ডেলিগেশনের নেতা হয়ে সেই কনফারেন্সে যোগ দিতে ব্যাংককে গেছেন অপর একজন মন্ত্রী। আই. এল. ও'র একজন কর্মকর্তা তাঁকে এবং আমাদের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতসহ অন্যান্য কূটনীতিকদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর বাড়ীতে। এই কর্মকর্তাটি অবিশ্যি ভারত সন্তান। আমরা যথাসময়ে সস্ত্রীক সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে সমবেত হয়েছি। রাষ্ট্রদূত বিশেষ জরুরী কাজে রাত্রি দশটার প্লাইটে দিল্লী যাবেন। তিনি অল্পক্ষণের জন্যে এসে চলে গেছেন। রাত্রি ৯টা নাগাদ এই মন্ত্রীমহাশয় তাঁর দলবল নিয়ে মহা কলরব করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি লাউঞ্জে প্রবেশ করা মাত্র আমরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানালুম। তিনি একনজরে আমাদের দেখে তার দলবল নিয়ে বসে পড়লেন। 'হোস্ট' ভদ্রলোক মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে বিনয়াবনত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি ড্রিঙ্কস্ দেব স্যার?

মন্ত্রী মহোদয় জানতে চাইলেন, জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কিটা আছে কিনা? যদি থাকে তবে তাই নিয়ে এসো। তবে তাতে জল কিংবা সোডা দেবে না। যাকে বলে 'হুইস্কী অন দি রক্স'।

তাকে তাই দেয়া হলো। তিনি চুমুকে চুমুকে সেই নীট হুইস্কী গলাধঃকরণ করতে লাগলেন, আর সঙ্গে মুঠো মুঠো কাজুবাদাম মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। মন্ত্রী মহাশয় একটার পর একটা গ্লাস নিঃশেষ করতে লাগলেন।

ক্রমশঃ আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। রাত্রি যখন প্রায় বারোটার কাছাকাছি এবং তখনো যখন মন্ত্রী মহাশয়ের খাওয়ার টেবিলে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলাম না তখন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আর নয়। ভোজ খাওয়া মাথায় থাক। চল এবার বাড়ী যাই। তিনি একটু ইতস্ততঃ করে উঠে পড়লেন। আমরা 'হোস্ট'কে বললাম, এবার আমরা বাড়ী যাবো। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, তা কি করে হয়। আপনারা খেয়ে যাবেন।

আমি বললাম, দেখুন আপনার বাড়ীর ডিনারের মেনু যতই লোভনীয় হোক, তার জন্যে ত সারা রাত জেগে বসে থাকতে পারবো না। আমাদের এখন আর তেমন আহারের প্রয়োজন নেই। আমাদের সত্যিই খুব ঘুম পাচ্ছে। আমরা চুপ করে চলে যাবো। মন্ত্রীমহল টের পাবেন না।

তবু তিনি বাররবার অনুরোধ করাতে বসে পড়তে হল।

যখন খাওয়ার ডাক পড়লো তখন ডিনার খাওয়ার জন্যে আর কেউ জেগে নেই। রাত্রি তখন প্রায় দুটো। দেখলাম সবাই সোফায় মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের হাতে তখনো হুইস্কির গেলাস এবং তখনো তিনি বেসামাল হননি। 'ড্রিংকিং লাইক এ ফিস' কাকে বলে সেদিন সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। আর মনে হল ইনিই হয়ত দেশে ফিরে গিয়ে মাদকদ্রব্য বর্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর ব্যাপারে সংসদে মুলতুবী প্রস্তাব আনবেন।

এক মন্ত্রী এক গেলাসেই কাৎ, আর অপরজন এক পিপে উড়িয়ে দিয়েও নির্বিকার। মন্ত্রী মহাশয়ের একপুকুর হুইস্কী হজম করার অলৌকিক ক্ষমতার কথা রাষ্ট্রদূতকে বলতেই তিনি বললেন, হবেনা কেন? এই ভদ্রলোক গীতার অভ্যাসযোগ ভাল করে পড়েছেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে অনুশীলন করেছেন। তোমরাও পারবে যদি অভ্যাসটা জিইয়ে রাখো। এরপর তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দূর ছাই, তোমাকে বলে কি হবে। তুমি ত আবার একজন পিউরিটান, কারণ-বারিতে অনাসক্ত।

মাত্রাতিরিক্ত এই পানাসক্তি ভারত থেকে বিদেশে সফররত সরকারী এবং বেসরকারী এই উভয় মহলের ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। তবে সকলেই যে বলগাছাড়া হয়ে যান তা আমি বলছিনা। অনেককে দেখেছি যে তারা মদ স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। কিন্তু তারও বিপদ আছে। সে কথা এই অধ্যায়ের শেষে বলবো।

বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে দু'একজন

সাংবাদিক যেন এ বিষয়ে একটু বেশীমাত্রায় বেহিসেবী। দেশে থাকা কালীন তারা কি করেন তা আমি জানিনা। কিন্তু বিদেশে দু'একজন সাংবাদিকের মধ্যে এই মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়েছি।

তখন আমি পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশে। একদিন দূতাবাসে গিয়ে খবর পেলাম ভারতের এক নামজাদা ইংরেজি পত্রিকার একজন লব্দ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী সাংবাদিক আক্রা (ঘনার রাজধানী সহর) আসছেন। রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন, আপনি এয়ার 'পোর্টে' গিয়ে তাকে 'রিসিভ করুন। ভালো হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে দিন। আর 'তিনি যে-কদিন এখানে থাকবেন তাকে একটু দেখাশোনা করবেন।

যথা সময়ে সেই সাংবাদিক ভদ্রলোককে বিমানবন্দরে স্বাগত জানালাম।

ভদ্রলোক খুবই সুপুরুষ। বেশবাসে একটা আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু দু'চার মিনিট কথাবার্তার পরেই বুঝলাম তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক। টার্মিনাল লাউঞ্জে এসে আমাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন তার জন্যে হোটেল ঠিক করা হয়েছে কিনা।

ইংরেজিতেই তার কথার উত্তর দিয়ে বললাম, আমি কিন্তু বাঙালী। অসুবিধে না হলে আপনি বাংলাতেও আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

ভদ্রলোক আমার কথাটা যেন শুনেও শুনলেননা। গাড়ীতে আসতে আসতে তার যা যা জিজ্ঞাস্য তা ইংরেজিতেই ব্যক্ত করলেন।

আমি খুবই বিরক্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু আমার কথাবার্তা বা হাবভাবে তা তাকে বুঝতে দিলাম না।

হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবার সময় তাকে বললাম, আমি আগেই বলেছি যে আমি বাঙালী। বাড়ীতে ডাল ভাত মাছের ঝোল ইত্যাদি খাই। যদি বাঙালীর খাদ্যে আপনার অরুচি না থাকে তবে খাবেন ঝোলভাত আমার বাড়ীতে আজ রাত্রে?

তিনি সেই রকম একটা তাচ্ছিল্যভাব দেখিয়ে বললেন, ইয়েস, উইথ প্লেসার, বাট আই ডোণ্ট লাইক দ্যাট ঝোলটোল।

আমি বললাম, বেশ, আর যা হয় খাবেন। রাত আটটার সময় হোটেল থেকে তাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

তিনি আমার বাড়ীতে এসেও সেই ইংরেজিতেই কথা বলতে লাগলেন এমনকি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও।

আমরা কিন্তু ইচ্ছে করেই তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বাংলাতেই দিলাম।

এর পর তার জন্যে ড্রিংকস আনা হল। সেকি মদ খাওয়ার ঠেলা; ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে চব্বিশ আউন্স বোতলের এক বোতল হুইস্কি একদম সাফ।

রাত প্রায় এগারোটা। তাকে খাওয়ার টেবিলে যাওয়ার জন্যে আমার স্ত্রী তাকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি অত সহজে উঠবার পাত্র নন। আরো ড্রিংকস চাইলেন। না দিলে অতিথির অসম্মান করা হয় তাই আরো হুইস্কি আনা হল। রাত বারোটা বেজে গেছে দ্বিতীয় বোতলেরও অর্দ্ধেক যখন তার পেটে গেছে তখন আমরা পুনরায় তাকে আহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু তখনো তিনি গ্লাস ছেড়ে উঠতে রাজী নয় দেখে আমার ধৈর্যচ্যুতি হল।

বেশ কঠিন গলায় বললাম, দেখুন মশায় আপনাকে খাওয়ার জন্যে ডেকেছি, বোতল বোতল মদ গেলার জন্যে নয়। আর আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, শুঁড়িখানা নয়। মদ্যপানে আপনি যদি এখনো পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকেন তবে গা তুলুন, শহরে অনেক 'পাব্' এখনো খোলা আছে। ওর যে কোন একটায় আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমাকে নিরস্ত করে আমার স্ত্রী সেই সাংবাদিক ভদ্রলোকের হাত ধরে অনুনয়ের স্বরে বললেন, আসুন ভাই। যা হয় একটু মুখে দিন, রাত অনেক হয়েছে। খাওয়ার পর আমার স্বামীকে আবার আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে।

আমার স্ত্রীর অনুরোধেই হোক, বা অন্য যে-কোন কারনেই হোক

ভদ্রলোক গুটগুটি খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন। কিন্তু কিছুই খেলেন না। এটা ওটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ সেই ভদ্রলোক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাষ্ট্রদূত আমাকেও তাঁর ঘরে ডেকে নিলেন।

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর তিনি বিদায় নিলেন।

উনি চলে যেতেই রাষ্ট্রদূতকে বললাম, স্যার, এই ভদ্রলোক গতকাল রাত্রে আমাকে একেবারে জানেপ্রাণে মেরে গেছেন।

বিষয়টা আন্দাজ করতে না পেরে তিনি কৌতুহল ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম।

আমি বললাম, ইনি আমার প্রায় দু বোতল হুইস্কী এক লহমায় পেটে চালান করে দিয়েছেন।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, বল কি। দু'দু বোতল হুইস্কি এক সিটিংএ।

আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার, তাই।

এর পর তিনি ঠাট্টা করে বললেন, দেখ, সরকার প্রতিমাসে বাইরের লোকদের আদর আপ্যায়ন করার জন্যে তোমাকে যে-টাকা দেয় তা থেকে পঁচিশ টাকা কাটা যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন স্যার, আমার অপরাধ? তিনি বললেন, যে পরিমান হুইস্কি দিয়ে তুমি বাইরের দশজন অতিথিকে আপ্যায়ন করতে পারতে, তা একটি লোকের গলায় ঢেলেছো, এই তোমার অপরাধ।

রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে হাসতে হাসতে বললাম, ওটা এবারের মত মাফ করে দিন, সংসারে খুব টানাটানি চলছে।

এই সাংবাদিক ভদ্রলোক অতঃপর তিনদিন আমার গাড়ী চড়ে যত্র তত্র ঘুরে বেড়ালেন, আমার পয়সায় রেস্টুরেণ্টে খেলেন, রাষ্ট্রদূতের বাড়ীতেও এক সন্ধ্যায় পানাহারে পরিতৃপ্ত হলেন। কিন্তু হলে হবে কি। এদের মনের রং এত পাকা যে দু'চার বোতল হুইস্কির ভাটিতে তা মুছে যাবার নয়।

দেশে ফিরে গিয়ে ইনি এঁর কাগজে আমাদের পশ্চিম আফ্রিকার দূতাবাসগুলোর 'অব্যবস্থা' নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। রাষ্ট্রদূত সেই সাংবাদিকের প্রবন্ধ পড়ে আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার বাঙালীবাবুর রুচিবোধটা কিন্তু খুব উচু স্তরের। লজ্জায় মাথা হেট করে তার ঘর থেকে চলে এলাম।

আবার এর বিপরিত দিকটাও কখনো সখনো কম পীড়াদায়ক হত না। একদা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং পশ্চিম ভারতেব একটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীবাদে ঘোর বিশ্বাসী একজন সর্বভারতীয় নেতা ঘনায় এলেন কি একটা কর্মোপলক্ষে। শান্তশিষ্ট অমায়িক লোক। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। কিন্তু ছ'একটা কথা থেকেই বুঝা যায় মহাত্মা গান্ধীর উপর তাঁর কি গভীর শ্রদ্ধা। পরিধানে শুভ্র মিহি খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধীটুপি আর পায়ে সাধারণ একটি স্লিপার।

হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ছ'চার কথার পর তাঁকে বললাম, যদি আমার বাড়ীতে একবার পদধূলী দেন ত কৃতার্থ হব। আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে তিনি বললেন, অতি বিনয়ের ভান করোনা। কবে যেতে হবে বল। তবে জানত আমি সামান্য আহার করি। তাও নিরামিষ। আমি বললাম, আমার বাড়ীতে সব ব্যবস্থাই আছে। আপনার বোধকরি অসুবিধা হবেনা।

তিনি বললেন, বেশ। কিন্তু আরো একটি শর্ত আছে।

—কি শর্ত বলুন।

তিনি বললেন, তোমার চেহারা আর হিন্দি বলার কায়দা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বাঙালী। আমাকে তোমার বাড়ীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে পারো বিশেষ করে ঐ গানটি,

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"।

আমি বললাম, আমার মেয়ে খুব ভালো গাইতে পারে। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতও শোনাবো।

তিনি বললেন, তবে আর যাওয়ার অসুবিধে কি। আমার সব

শর্তই যখন মেনে নিলে।

কিন্তু পরে জেনেছিলাম এছুটো শর্ত থেকে আরো একটা কঠিন শর্ত তাঁর ছিল। সেটা তখন কেন যে তিনি বললেন না তা বুঝলাম না।

শহরের দশবারোজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নৈশ ভোজনে ডাকা হল। তারা এলেন। রাষ্ট্রদূত, ঘানার অন্যান্য কুটনীতিক সহকর্মীগণ সবাই উপস্থিত। যথা সময়ে ভারতের এই নেতাও এসে পড়লেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে সকলের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পর ঘরের এক কোণে আমাকে ডেকে নিয়ে তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, দেখ তোমাকে একটা কথা বলতে আমার ভুল হয়ে গেছে। এধরনের পার্টিতে তোমরা সাধারনত মদ পরিবেশন কর। জানত আমি মদ্য পানের ঘোর বিরোধী। আজ আমার সামনে তোমার অতিথিদের ঐ বস্তুটি কিন্তু দিওনা।

তিনি যখন আমাকে এই নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তারমধ্যে পরিবে-বেশকগণ প্রত্যেক অতিথির হাতে একটি করে হুইস্কীর গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই গ্লাসে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে গলা ভেজাতে শুরু করে দিয়েছে। ঐ দেখে আমার মাথায় বজ্রাঘাত। চেয়ে দেখি রাষ্ট্রদূত তখনো গ্লাশ ধরেননি। ছুটে গিয়ে তাকে বিষয়টা বললাম। তিনি তড়াক করে আসন ছেড়ে উঠে ঐ ভারতীয় নেতার কাছে চলে গেলেন। এক মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে রাষ্ট্রদূত তাকে বললেন, আমার সঙ্গে এক মিনিটের জন্যে পাশের ঘরে একটু আসুন, একটা বিশেষ জরুরী কথা আপনাকে এখুনি বলা দরকার। নেতামহাশয়কে একরকম পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যাওয়ার মুখে রাষ্ট্রদূত চোখের ইসারায় আমাকে যেন কিছু বললেন। মনে হলো তিনি আমাকে বলে গেলেন, এঁকে আমি আটকে রাখবো, তুমি অতিথিদের উপর নজর রেখো।

এক ফাঁকে আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি যতশীঘ্র পার ডিনার টেবিল রেডি কর, অতিথিদের তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলে বসিয়ে দিতে হবে। এদিককার গতিক ভালো নয়। তিনি আমার কথার তাৎপর্য বুঝলেন না, কিন্তু তৎক্ষনাৎ ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পানপর্ব শেষ হয়ে গেল। আমি সকল অতিথিদের নিয়ে খাওয়ার টেবিলে বসিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে রাষ্ট্রদূতকে বললাম, সবাই টেবিলে বসেছেন, আপনারাও আসুন।

খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথিরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর রাষ্ট্রদূতও বিদায় নিলেন। তারপর বসলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর। আমার মেয়ে অনেকগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো। তিনি তন্ময় হয়ে শুনলেন। "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" গানটা তিনবার গাইতে হল। হোটেলে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে মাথায় হাত রেখে আশীবাদ করে গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

তিনি চলে যেতেই দৌড়ে এসে রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোন করে বললাম, কি ফাঁড়াটাই না কাটিয়ে দিলেন স্যার। আপনি না থাকলে আজ কপালে যে কি ছিল তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

তিনি টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। তবে মনে রেখো আমি শুধু তোমার ফাঁড়া কাটিয়েই আসিনি, তোমার অদৃশ্য ফোঁড়াও কেটে এসেছি। কাল তোমার অতিথিদের মদ্যপান দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি যদি ঐ সভা ত্যাগ করে চলে যেতেন তবে কালকের সংবাদপত্রে ঐ খবর ছাপা হলে তোমার গায়ে বেশ কয়েকটা বিষ ফোঁড়ার আবির্ভাব হত।

পরদিন হোটেলে নেতা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একথা সেকথার পর তিনি বললেন, তোমাদের রাষ্ট্রদূত খুব বুদ্ধিমান লোক। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি তোমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মদ দিয়েছিলে কিন্তু তোমাদের রাষ্ট্রদূত ওদের থেকে আমাকে আড়াল করে এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন।

অফিসে ফিরে এসে রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সম্পর্কে ঐ নেতা মহাশয়ের মন্তব্য বলতেই তিনি হেসে বললেন, এ সব মন্তব্য সিরিয়াসলি নিওনা। আমি, তুমি, আমরা সবাই কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট। ওরা আমাদের কখনই

সুনজরে দেখেনা। তিনি হলেও হয়ত এর ব্যতিক্রম হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই। বহু ঘাম ঝরিয়ে আমরা অর্থাৎ ভারতীয় কুটনীতিকরা বিদেশে ভারতের যে ভাবমূর্তি তৈরী করতে চাই, বিদেশে ভ্রমণরত অনেক গণ্যমান্য ভারত সন্তানও বিভিন্ন দেশের জাতীয় চিন্তাধারা, তাদের সামাজিক রীতিনীতি রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল না থাকার জন্যে তাঁরা এক এক সময় এমন সব বেখাপ্পা আচরণ করে বসেন যার ফলে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিটার অঙ্গহানি ঘটে যায়। অনেক সময় সেই ভগ্নাংশটি জোড়া লাগানো খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এ সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন নামজাদা অধ্যাপক ব্যাংককে এলেন আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা দিতে। অনেকেরই জানা আছে যে ব্যাংকক সহরে এবং সহরের আশে পাশে প্রায় পাঁচসাত হাজার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার গোয়ালাদের বসবাস। দীর্ঘকাল ধরে প্রবাসী হয়েও এই গোয়ালারা তাদের স্বদেশের জীবনযাত্রার হালচাল একটুও বদলাতে পারেনি। সেই হাটুর উপরে মালকোঁচা মেরে আধ-ময়লা ধুতি এবং প্রায় তেমনি মলিন ফতুয়া পরে এরা ব্যাংকক সহরের মত সৌখীন এবং কেতাদুরস্ত সহরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এদের সহজেই সনাক্ত করার জন্যে এক শব্দ চালু আছে। সাধারনত 'ভেইয়া' বললেই এই গোয়ালাদের বোঝায়। স্বাভাবিক কারনেই থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে এরা অপাংক্তেয় এবং এদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেই তারা অভ্যস্ত। যে কোন কারনেই হোক থাইরা এই ধুতি বস্তুটিকে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারে না। অথচ অনেক বলা কওয়া সত্বেও 'ভেইয়া'রা ঐ হাটুর উপরে তোলা খাটো ধুতি বিসর্জন দিতে নারাজ।

এই কৃতবিদ্য অধ্যাপকের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের খরচ ভারত সরকার বহন করবেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতাদি সেসব দেশে

অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের আয়োজন করতে হবে এবং তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও তাদেরই করতে হবে। ভারত সরকার তাঁর হোটেল খরচ দেবেন না।

রাষ্ট্রদূতকে বললাম, অধ্যাপক মশায় এসে থাকবেন কোথায় ?

তিনি বললেন, কেন, থাই-ভারত কালচারাল লজে তাঁর থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দাও। ওখানে থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে না।

থাই ভারত কালচারাল লজের গেষ্টরুম বলে কিছু নেই। একটা খালি ঘর আছে, তার মধ্যে ছাড়পোকা কণ্টকিত একটি তক্তপোষ এবং একটি শতছিন্ন নারকেলের ছিবড়ে বের করা জাজিম পাতা আছে। ব্যস, আর কোন আসবাব নেই। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। নিকটে থাই হোটেল আছে। সেখানে মশলা বিহীন আধা সেদ্ধ মাছ খেতে হবে।

এই সব শুনে এসে আমার মনে হল এমন একজন বিশিষ্ট অধ্যাপককে এখানে কিছুতেই রাখা চলবে না। তিনি বাঙ্গালী অতএব তাঁকে আমার বাড়ীতে দু'চার দিনের জন্য রাখতে কোন অসুবিধে নেই। থাই ভারত লজের দৈন্যাবস্থা শুনে এবং আমার বাড়ীতে অধ্যাপককে রাখবার ইচ্ছা জেনে তিনি আপত্তি করলেন না।

যথা সময়ে অধ্যাপক মহাশয়কে এয়ারপোর্ট থেকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল আমার অফিসের একজন এ্যাসিস্টেন্ট। অধ্যাপকের পড়নে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে গেরুয়া রংয়ের পাঞ্জাবী, পায়ে নিউকাট পাম্পসু। অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এলাম। এই অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের খবর জানতাম কিন্তু কখনো তাকে দেখিনি। ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর সম্পর্কে আমার এই ধারনা হল যে তিনি নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের পণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অহংকার একেবারেই নেই। সব থেকে ভালো লাগলো তাঁর লঘু পরিহাস করে অপরকে আনন্দ দেওয়ার দক্ষতা। তাঁর কার্যসূচী আগেই নির্দ্ধারিত করে রেখেছিলাম। বললাম, আগামী কাল বেলা দশটায় মহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে

আপনার বক্তৃতা। পরশু বিকালে থাইল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা নামজাদা চুকালংকরন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ এবং তার পরের দিন সন্ধ্যায় থাইল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত জ্ঞানালোচনার সংস্থা "রয়াল শ্যাম সোসাইটি"তে বক্তৃতা। এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং থাইল্যাণ্ডের রাজা এবং এর প্রেসিডেন্ট সমকালীন থাইল্যাণ্ডের জ্ঞানবৃদ্ধ রাজকুমার ধানী। সকলের কাছে ইনি প্রিন্স ধানী বলে পরিচিত। এরই প্রচেষ্টায় এবং আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ব্যাঙ্ককে এসেছিলেন এবং এই ব্যাংককে বসে রবীন্দ্রনাথ থাই-ল্যাণ্ড সম্পর্কে যে অসামান্য কবিতাটি লিখেছিলেন তার অরিজিনাল কপিটি প্রিন্স ধানী তার বাড়ীর বসবার ঘরে ফ্রেমে এঁটে আজো বাঁধিয়ে রেখেছেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ভালো ভাবেই উৎরে গেল। তারপরের দিন শ্যাম সোসাটিতে বক্তৃতা। সকাল বেলা অফিসে কাজ করছি। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। শুনতে পেলাম মহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার পরিচিত ইংরেজীর এক অধ্যাপক আমাকে বলছেন, ওহে তোমাদের ভেইয়া প্রফেসরের বক্তৃতা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল আর ইংরেজীটা বলেন একেবারে টপ্। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা ক্রেডেলে রেখে দিলাম। কিন্তু আমি অধ্যাপকের উপর ভীষন বিরক্ত হলাম। তাঁর এই ধুতি পরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর জন্যই ত আমার এই ব্যঙ্গোক্তিটা শুনতে হলো।

বাড়ী ফিরে এসে অধ্যাপককে বললাম, আজ বিকেলে শ্যাম সোসাইটির বক্তৃতায় আপনাকে স্যুট পরে যেতে হবে।

তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমার ত স্যুট নেই। কিন্তু স্যুট পরে যেতে হবে কেন? তখন আনুপূর্বিক ঘটনা তাকে বললাম। তিনি খুব বিমর্ষ ভাব দেখিয়ে বললেন, তাহলে উপায়?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনারা এ সব ধুতি ফুতি পরে বিদেশে আসেন কেন? বর্তমান জগতে আন্তর্জাতিক পোষাকই হল

স্যুট। আপনারা পণ্ডিত লোক। স্বদেশের ভাবমূর্তি বিদেশীদের চোখে ফুটিয়ে তুলতে আপনাদের মত আর কে আছে। কিন্তু এই চটের মত হাটুর প্রায় ওপরে তোলা ধুতি আর ঐ রং চটা একটা বাদামী রংয়ের পাঞ্জাবী চড়িয়ে শ্যাম সোসাইটিতে গেলে আপনার মূর্তিটা যে আগে ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাবে তার খবর রাখেন কি? সেই সঙ্গে ভারতের ভাব মূর্তিটা কি আস্ত থাকবে বলে আপনি মনে করেন? আজ ঐ বক্তৃতা সভায় প্রিন্স ধানী উপস্থিত থাকবেন। এমনকি থাইল্যাণ্ডের রাজা পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে পারেন।

আমার কথা শুনে অধ্যাপকের মুখ শুকিয়ে আমসী হয়ে গেল।

তিনি শুধু বললেন, যা হয় একটা উপায় করে দিন। স্যুট কেনার পয়সা আমার নেই॥

আমি বললাম, সে জন্যে ভাববেন না। ব্যবস্থা করছি। আমার পার্সোনাল সেক্রেটারির দৈহিক উচ্চতা প্রায় অধ্যাপকের মতো। তাকে টেলিফোন করে বললাম, পাণ্ডে, তোমার ত চুড়িদার পাজামা আর শেরোয়ানী আছে। ওগুলো এক্ষুনই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে পারো। আর তোমার নতুন বুট জুতো তো আছে কালো রংয়ের।

পাণ্ডে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওগুলো আমার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেল। প্রফেসর কে ওগুলো পরিয়ে ট্রায়াল দেওয়া হল। মোটামুটি ফিট। জুতোটাও বেমানান হলনা। বিকেল চারটের সময় প্রফেসরকে এই নবসাজে সাজিয়ে দিলাম। আমার ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবাব দেখে নিয়ে বললেন, মন্দ দেখাচ্ছে না কিন্তু, কি বলেন?

আমি বললাম, আপনার ধুতি পাঞ্জাবী থেকে অনেক ভালো।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্যাম সোসাইটিতে বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের অস্তিত্ববাদ নিয়ে এক তুলনামূলক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপকমহাশয়। বলা বাহুল্য, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলো।

গাড়ীতে ফিরে আসতে আসতে অধ্যাপক বললেন, 'ভেইয়া'

পোষাক পরে গেলে হয়েছিল আর কি। মেরে বোধ হয় তক্তা করে দিত।

আমি বললাম, আপনার আর কি, আপনি ত কাল সকালেই ফুরুৎ করে এখান থেকে পালাতেন। তক্তা বার করতো ত আমার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন ;

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

কবির এই উক্তির সঙ্গে এক যায়গায় বোধ করি আমার কূটনৈতিক জীবনের সামান্য একটু মিল আছে। প্রেমাকাঙ্খী কবি প্রেমহীন জগতের অন্ধকার পথে চলতে চলতে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মনে করেছিলেন তিনি বুঝি হাজার বছর ধরে প্রেমের অন্বেষণে এই অবিরাম পথ পরিক্রমা করে চলেছেন এক ধূসর জগৎ থেকে আরো এক গভীর অন্ধকারময় জগতে, কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারেই তিনি একদিন তাঁর আকাঙ্খিত প্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন।

মনোজগতের এই যাযাবর কবির মত আমিও এই পৃথিবীর অনেক মহাদেশ, অনেক নগর, অনেক রাজধানী, অনেক জনপদ, অনেক প্রাচীন সভ্যতার, মানুষের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখেছি; কিন্তু আমার এই বিশ্বপরিক্রমা ঠিক শান্তি কিংবা প্রেমান্বেষণ নয়। পথ চলতে চলতে

কখনো বা দু'একটা অব্যক্ত বেদনা আমার মনের আকাশের প্রফুল্লতাকে নৈরাশ্যের কালো মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলত, যখন সুদূর প্রবাসে বসে ভাবতাম আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা।

আমার মনের এই বিষাদময়তা ঠিক 'নস্তালজিয়া' নয়, কিংবা দেশের মাটিতে ফিরে যাওয়ার আকুলতাও নয়। এই বেদনার রূপটা ছিল আলাদা। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে লিখেছিলেন,—তুমি ওদেশে বেশ আছ। চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হলে বিদেশেই থেকো। দেশে ফিরবার কল্পনাও করোনা। এখানে খালি দীনতা, হীনতা, পরশ্রীকাতরতা আর কুটিল রাজনৈতিক আবর্তে আমরা নিমজ্জমান। আমরা পঙ্কে ডুবে আছি। তুমি ফিরলে তুমিও ডুববে। অতএব সময় থাকতে সাবধান হও।

আমার বন্ধু দেশের যে-ছবি এঁকে পাঠালেন, এটাই কি ভারতের সনাতন রূপ? যদি এই কদর্যতাই দেশের চিরকালের রূপ হ'ত তবে ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝায় আজ তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।

আমার চোখে আজ আর গ্রীস নেই, রোম নেই, মিশর নেই, ব্যাবিলন নেই, বাইজেনটিয়াম নেই, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো আছে। যদি বিদেশে কখনো না যেতাম তবে বোধ করি এই সত্যটা আবিষ্কার করতে পারতাম না। কবি জীবনানন্দ দাশ যেমন বনলতা সেনের সাক্ষাৎ পেয়ে দু'দণ্ডের জন্যে শান্তি পেয়েছিলেন আমিও তেমনি একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম আমার নিজস্ব উপলব্ধিতে।

আজ যে রোম নেই, গ্রীস নেই, মিশর নেই, ব্যাবিলন নেই তার কারণ রোম একটাই, গ্রীস একটাই, মিশর একটাই, কিন্তু ভারতবর্ষ একটা নয়, দুটো। একটা ভারতবর্ষ মরে গেলেও আর একটা আছে। যেটা বেঁচে আছে, তাকে চোখে দেখা যায় না। সে ভারত, অদৃশ্য ভারত। অদৃশ্য হয়েই সে বেঁচে আছে। বাতাস অদৃশ্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। মানুষের চিন্তার জগৎ অদৃশ্য। কিন্তু এই চিন্তাই আমাদের কর্মকে পরিচালনা করে। কিন্তু এই অদৃশ্য ভারত বোধ

করি আমাদের কাছে চিরদিনই অদৃশ্য থেকে যাবে। দিনের আলোয় তাকে টেনে এনে তার স্বরূপ বোধ হয় আর কোন দিনই আমরা দেখতে পাব না।

কিন্তু আমি এক অপরিসীম আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি যখন দেখেছি যেকয়েকটি খ্যাত এবং অখ্যাত বিদেশীর কর্মে, চিন্তায় এবং তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এই অদৃশ্য ভারতাত্মার চিন্ময় রূপ তাঁদের মধ্যে মৃন্ময়রূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তাদের সে কাহিনীই এবার বলব।

অফিসের পিয়ন টেবিলের উপর একপাঁজা চিঠি রেখে গেল। ওরই মধ্যে একখানা খাম দেখলাম খুবই সুদৃশ্য। খামটিকে কাছে টেনে এনে দেখলাম সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে হাল্কা গোলাপী রংয়ের একই আকৃতির আট-দশটি ফুলের ছবি, ফুলটি আকারে বেশ বড়, পাপড়িগুলো অনেকটা শিমূল ফুলের পাপড়ির মত।

এই বিভূঁই-বিদেশে এমন একটি বর্ণাঢ্য খামে কে আমাকে চিঠি লিখতে পারে? কৌতুহলাবিষ্ট হয়ে চিঠিখানা খুললাম। না, আবেদন-নিবেদনের ব্যাপার নয়, ব্ল্যাকহীথ শহরের পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়রের ওখান-কার বাৎসরিক রডোডেনড্রন ফুল উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পত্র। চিঠির কাগজেও অনুরূপ ফুলের ছবি রয়েছে। বুঝলাম এই ফুলটিই রডোডেনড্রন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খামটিকে বারবার দেখলাম। মনে হল আসন্ন উৎসবের বার্তাবহ এই খামটি শুধুমাত্র উৎসবের বার্তা বহন করেই আনেনি, এই খামটিকে দিয়েই যেন উৎসবের শুভারম্ভ হয়েছে।

ব্ল্যাকহীথ পার্বত্য শহর। নীলগিরি পর্বতের সানুদেশে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে এই শহর। শহর ছোট, লোকসংখ্যা নগন্য কিন্তু তার উৎসবের ঘটা আর আয়োজন পর্বতের মত বিশাল। এই নীল-গিরি আমাদের দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি নয়, অস্ট্রেলিয়ার ব্লু মাউনটেনস। কুইন্সল্যাণ্ডের পূর্বসীমা থেকে শুরু করে আড়াআড়ি ভাবে নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেলেদুলে ভিকটোরিয়া

রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এ সেই নীলগিরি। আমাদের দেশের নীলগিরি পাহাড়ে হয় চা আর অস্ট্রেলিয়ার নীলগিরিতে রয়েছে উন্নত ধরনের হাজার হাজার ফলের বাগান। আপেল, ন্যাসপাতি পীচ, প্রুন আর খুবানীর অজস্র বাগিচা। এছাড়া ব্লু মাউনটেনস বিখ্যাত হয়ে আছে আরো দুটি কারণে। এরা হলো জগৎপ্রসিদ্ধ জেনোলান কেভস আর বেল বার্ডস।

এখন যেখানে ব্লু মাউনটেনস, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ওখানে ছিল উথাল-পাথাল সমুদ্র। সমুদ্রগর্ভে নিদারুণ ভূকম্পনের ফলে একদিন সেখানে গজিয়ে উঠল পাহাড়। আর সমুদ্র গেল অনেক দূরে সরে। কিন্তু সমুদ্রের কিছু কিছু নোনাজল আটকে রইলো নবজাতক পাহাড়ের ফাঁকে-ফোঁকড়ে। অবরুদ্ধ সেই নোনাজলে মিশলো কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। এই সংমিশ্রণে জলের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটলো। ক্রমশ এই জল চুনোপাথরের সংস্পর্শে এলো। তৈরী হলো অজস্র স্ফটিক। এই স্ফটিক পাহাড়ের গুহায় বিশ্বকর্মার নিপুণ হাতের মত তৈরি করলো বিচিত্র রংয়ের, বিচিত্র ধরনের আর বিচিত্র অবয়বের মন্দির, ঝালরের পর্দা, পশুপক্ষী, ছোট ছোট টিলাপাহাড় আর উপত্যকা। নয়নাভিরাম দৃশ্য।

নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত আণবিক বৈজ্ঞানিক স্যার ফিলিপ ব্যাকস্টার একদিন আমাকে বললেন, তোমাদের দেশে ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতি পূজা হয়, আর সেই পুরোহিত হন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমাদের দেশেও প্রকৃতি পূজা হয়, যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়। আর এই প্রকৃতি পূজার পুরোহিত কোন ব্রাহ্মণসন্তান নন, কয়েকশ ছোট ছোট পাখী। এই পাখীরা প্রতিদিন উষাকালে অবিশ্রাম ঘণ্টাধ্বনি করে এই পূজো সাঙ্গ করেন। এই পাখীগুলোর নাম বেল বার্ড অর্থাৎ ঘণ্টা পাখী।

রডোডেনড্রন পুষ্পোৎসবে যোগদান ছাড়াও এই জেনোলান কেভস আর বেল বার্ডদের ঘণ্টাধ্বনি শোনার আকাঙ্খায় একদিন রাত্রে সিডনী থেকে ব্লু মাউনটেনস-এর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

এখন শরৎকাল। কিন্তু শেষরাত্রিতে চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট নির্জন আর ভালো করে কিছু দেখা যায় না। সহরের বাইরে এসে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিতে হল। কুয়াশা বিদীর্ণকারী একজোড়া তীব্র পীতাভ আলো ক্ষেপণকারী হেডলাইট গাড়ীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। কুয়াশার আবরণ একটু স্বচ্ছ হয়ে আসতেই গাড়ীর গতি আবার বাড়িয়ে দিলাম। কারণ আলো ফোটার পূর্বেই পৌঁছুতে হবে বেলবার্ডের আস্তানায়। আঁকাবাঁকা পথে মোচড় খেতে খেতে গাড়ী এবার উপরে উঠতে লাগলো। আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট চড়াই পার হয়ে এলাম।

এখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত। পূর্বাকাশে তাম্রাভ আলোর রেখা। বনস্থলীতে তখনও অন্ধকার। মনে হল রাত্রির তমসা বিদায় নেবার আগে বনস্পতি আর লতাগুল্মকে শেষ আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে। আরো কয়েক মিনিট এগিয়ে যাওয়ার পর গাড়ীর গতি রোধ হল। পথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লোহার বেড়া আড়াআড়ি ভাবে পথরোধ করে আছে। গাড়ী পথের একপাশে দাঁড় করিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম ছুটি সরু রাস্তা লোহার বেড়ার বিপরিত দিকে চলে গেছে। কোন পথটি আমাকে আমার গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পথ বেছে নেওয়ার জন্যে যখন একটু ইতস্তত করছি তখন লোহার বেড়ায় পাশ দিয়ে একজন মধ্যবয়সী লোক বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কোনপ্রকার ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলো, লুকিং ফর দি বেল বার্ডস? আমি বললাম ইয়েস, বাট হোয়েয়ার টু ফাইণ্ড দেম? লোকটি বাঁদিকের পথটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, ফলো ছাট ওয়ে হুইচ উইল লীড টু ইয়োর ডিসায়ারড স্পট।

এই বলে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমিও বাঁদিকের সরু পথটি ধরে জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

মিনিট দশেকও বোধকরি হাঁটিনি, সহসা হাজার হাজার ঘণ্টা-ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হয়ে উঠলো। নিজের কানে না শুনলে কখনই

বিশ্বাস করতাম না যে পাখীর কণ্ঠ দিয়ে এমন অবিকল ঘণ্টাধ্বনি হতে পারে। মনে হল পাশাপাশি কয়েকশ প্রতিমা পূজার আয়োজন হয়েছে আর হাজার হাজার ঘণ্টাবাদক অবিশ্রাম ঘণ্টাধ্বনি করে উৎসবের অজস্র পরিচয় দিয়ে চলেছে। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেক-ক্ষণ ধরে এই বিরামবিহীন ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকেই ঘাড় ফেরাই শুধু শুনতে পাই টং টং টং ধ্বনি। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও এই ঘণ্টাওয়ালাদের একটিকেও দেখতে পেলাম না কি তাদের পালকের রং, ঠোঁটের গড়ন, পাখীটি দৈর্ঘে প্রস্থেই বা কতটা তা কিছুই বোঝা গেল না। এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম এই পূজার দর্শক বা শ্রোতা কেবলমাত্র আমিই নই। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পর্যটকের সমাগম হয়েছে। এরাও কৌতুহল ভরা দৃষ্টি দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনছে। ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বেলবার্ড দেখেছেন ?

তিনি বিরস গলায় বললেন, না, দেখিনি। তবে এক অস্ট্রেলীয় চিত্রকরের আঁকা বেলবার্ডের ছবি দেখেছি।

কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পাখীটি কি রকম দেখতে ?

তিনি বললেন, পাখীটি আকারে খুবই ছোট। ইংলণ্ডের রবীন পাখীর মত, পালকের রং ধূসর আর ঠোঁটের রং নীলাভ। তিনি আরো বললেন, এ এক অত্যাশ্চর্য পাখী। সারা দুনিয়ার শুধুমাত্র এ জায়গাটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বেলবার্ডকে দেখতে পাবেন না। এমন কি এই বিস্তীর্ণ ব্লু মাউনটেনস-এর এই চার বর্গমাইল এলাকা ছাড়লেই এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ বলতে পারেন ?

এবার তিনি একটু হেসে বললেন, না, তা পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি প্রকৃতি আর জীবন খুবই রহস্যময় আর দুর্জ্ঞেয়। মানুষ প্রকৃতির বৈঠকখানায় বসবার অধিকার আজ লাভ করেছে, কিন্তু তার অন্দর মহলের দুয়ার এখনও রুদ্ধ।

বিদেশী পর্যটককে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে পথে নেমে এলাম।

তখনও ঘণ্টাধ্বনি সমানে চলেছে। পথে আসতে আসতে দেখলাম প্রকৃতি পূজার আরো সামগ্রী এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে আর আমারই সমুখে একটি শীর্ণকায় জলপ্রপাতের জলধারা কমণ্ডলুর জলধারার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

পথ বেয়ে নামতে নামতে দেখলাম পাহাড়ের বিভিন্ন ধাপে পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্যে কতকগুলো ছোট ছোট মোটেল দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দেখে বহুদিন আগেকার একটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নীলপর্বতে দেবী কামাখ্যার পূজনেচ্ছু দূরাগত দরিদ্র পূজারীগণ দেবীর মন্দিরের সংলগ্ন জরাজীর্ণ যে চালাঘরগুলোতে এসে আশ্রয় নেয় সেই ঘরগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু দু'টো ছবির মধ্যে মিল থেকে অমিলই যেন বেশী মনে হল। একদিকে দীনদরিদ্রের সামান্য উপচার দিয়ে পরম ঐশ্বর্যময়ীর আরাধনা, আর অপরদিকে দূরাগত ধনবান পর্যটকের অমিত ব্যয়বাহুল্যের মাধ্যমে কৌতূহল নিবৃত্তির উন্মাদনা।

গাড়ীর কাছে এসে দেখলাম লোহার গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। গাড়ীর দরজা খুলে স্টিয়ারিংএ এসে বসলাম। লোহার বেড়া পেরিয়ে গাড়ী এগিয়ে চললো। এবার গন্তব্যস্থল ব্ল্যাকহীথ শহর। বেলবার্ডের আবাসস্থল ছেড়ে প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে। প্রায় একঘণ্টা ভ্রমণের পর কুমা সহরে এসে পৌছুলাম। তখন সূর্য অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। ব্লু মাউন্টেনস অঞ্চলের সব থেকে বড় শহর কুমা। সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উপরে। এমন রমণীয় পার্বত্য শহর এ তল্লাটে খুব বেশী নেই।

আমাদের দেশ বীরপূজার দেশ। রামায়ণ মহাভারতের অনেক বীরোদাত্তগুণান্বিত বীরগণ আবহমানকাল থেকে বীরদর্পে আমাদের পুজো পেয়ে আসছেন। কিন্তু মহাভারতের ময়দানবের পূজো কেউ কখনও করেছে বলে আমার জানা নেই। আমার কিন্তু মনে হয় অন্যান্য পূজনীয় বীরদের পুজোআচ্চা আপাততঃ কিছুদিন স্থগিত রেখে প্রায় বিস্মৃত এই দানবটির আরাধনা একান্তই অপরিহার্য। ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজধানী

তৈরী করেছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। এই দানবস্থপতির স্থাপত্যচাতুর্যের এবং নগর পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে বর্তমান যুগের যে কোন স্থপতি গৌরব বোধ করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশে সেই সুদূর অতীতে শুধুমাত্র একটি স্থপতির আবির্ভাব ঘটলো কেন, পরবর্তী যুগে নগর পরিকল্পনার শৈলী কেনই বা চিরতরে লুপ্ত হল সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি।

সে যাই হোক, কুমা শহরটিকে দেখে আমার মনে হল ময়দানবের অধস্তন পুরুষেরা এখনও ধরাধাম থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এবং সেই দানবের বংশের একটি ধারা এখন অস্ট্রেলিয়ায় এসে বসবাস করছে। তা না হলে এমন নগর পরিকল্পনার নিদর্শন আর কে দেবে এই যুগে। কুমা শহরের সঙ্গে আমাদের দেশের যে কোন পার্বত্য শহরের তুলনা অচল। একটি পার্বত্য সহরে যেখানে যে বস্তুটির প্রয়োজন তার কোথাও অপ্রতুলতা নেই কুমা সহরে। এই সহরের রাস্তাঘাট, পার্ক, ময়দান, খেলাধূলার মাঠ, আমোদপ্রমোদের স্থান, সিনেমা, থিয়েটার, হাটবাজার দোকান পসার সব কিছুই এমন একটি পরিচ্ছন্ন নগর কল্পনার অবদান যে আপনি সহরের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন ওসব জায়গায় যেতে আপনার যতটুকু সময় লাগবে সহরের অপর প্রান্তের অধিবাসীরও ঠিক সেই সময়টুকুই ব্যয় হবে।

আপনার বাড়ী থেকে বাজার কতদূর এই প্রশ্ন কুমায় কেউ কাউকে করে না।

কুমায় সব আছে, কিন্তু মানুষ নেই। এই উক্তির অর্থ এই নয় যে কুমার অধিবাসীগণ অমানুষ। 'মানুষ নেই' এই উক্তিটির মর্মার্থ হল এই যে সহরের আয়তনের তুলনায় জনবসতি খুবই বিরল। এক বর্গমাইল এলাকার জনসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশজন।

কুমায় অনেক দর্শনীয় বস্তু আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হ'ল 'তিন বোন' নামধেয় পাশাপাশি তিনটি শৈলশৃঙ্গ।

কুমা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পাহাড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

গেছে। তারপরেই পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে একটা বিরাট খাদ। এই খাদের চারদিকে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী বৃত্তাকারে এই বিরাট গহ্বরকে ঘিরে রেখেছে। এই খাদের উত্তর পশ্চিম কোণে সমান্তরালভাবে তিনটি শৈলশৃঙ্গ সব পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেছে। এরাই কিংবদন্তীর হতভাগ্য তিন বোন। 'থ্রি সিসটারস' নামেই এরা যুগ যুগান্ত ধরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

তিন বোনকে দেখে ব্ল্যাকহীথ সহরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হল। আজ দুপুর থেকেই সেখানে শুরু হবে রডোডেনড্রন পুষ্পোৎসব।

আমাদের দেশে ফুলের উৎসব নেই। ফুলই নেই তায় আবার উৎসব। আমাদের দেশে সচরাচর যা হয় তা হল ফ্লাওয়ার শো। এই পুষ্প প্রদর্শনী আর যাই হোক একে কোন ক্রমেই ফুলের উৎসব বলা যাবে না। প্রাচীন ভারতে হয়ত বা ফুল উৎসবের রেওয়াজ ছিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় মধুবনে ফুল উৎসবের কথা বলেছেন একটি প্রাচীন কাহিনীকে কেন্দ্র করে। উৎসব ত দূরের কথা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফুলের প্রয়োজনবোধ খুবই সীমিত। পারিবারিক উৎসবে কিংবা বিপর্যয়ে ফুলের প্রয়োজন যে একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু সুন্দরের দৃষ্টি দিয়ে এই প্রয়োজনকে গ্রহণ করা হয় না। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পারিবারিক জীবনে ফুল এক বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দক্ষিণ এশিয়ার আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে যে পুষ্পপ্রীতি দেখেছি তাতে তাদের সৌন্দর্যানুভূতিকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারিনি। থাইল্যাণ্ডের দরিদ্রতম কৃষকদের ঘরেও দেখেছি তার জরাজীর্ণ নড়বড়ে খাওয়ার টেবিলের উপর একরাশ চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ কিংবা নাগকেশরের স্তবক। আর ওদেশের ধনবানদের গৃহে দেখেছি বসবার ঘরে, খাওয়ার টেবিলে মহামূল্য অর্কিড।

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস, ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া সর্বত্রই এই পুষ্পপ্রীতি দেখেছি। আর পুষ্প উৎপাদনের অদম্য উৎসাহকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

বেলা এগারোটা নাগাদ ব্ল্যাকহীথ শহরে পৌঁছুলাম। শহরের প্রবেশপথে এক বিরাট পুষ্পতোরণ। সবটাই রডোডেনড্রন ফুল দিয়ে তৈরি। কি অপূর্ব সুশোভন দৃশ্য। শহরে প্রবেশ করে দেখলাম প্রত্যেকটি গৃহ, দোকানপসার, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট রডোডেনড্রন ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে! কতকগুলো ভিনটেজ কার-কে আগাগোড়া ঐ ফুল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে উৎসবের কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছলাম। শহরের মেয়র আমাকে অভ্যর্থনা করলেন একটি কিশোরী আমার কোটের বাটন-হোলে একটি রডোডেনড্রন ফুল গুঁজে দিয়ে গেল।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের রাজ্যপাল এবং শহরের মেয়র। অল্প কথায় উৎসবের সামাজিক এবং আত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তার-পর শুরু হল বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রথমে বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজেদের স্কুলের বর্ণাঢ্য ইউনিফর্ম পরে মার্চপাস্ট করে গেল। তারপর যুবক-যুবতীদের ব্যাণ্ড, ব্যালে নাচ, অস্ট্রেলিয়ান লোকনৃত্য, একাংক নাটকাভিনয়, ম্যাজিক প্রদর্শন, ভিনটেজ মোটর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে উৎসব প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হয়ে উঠলো। সব থেকে ভালো লাগলো উৎসব পরিচালকদের নিখুঁত পরিচালনা এবং অংশগ্রহণকারীদের কর্মকুশলতা। অপরাহ্নে এই বিরাট অনুষ্ঠান যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটলো শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েক হাজার রডোডেনড্রনের কিশোর চারা রোপণ করে।

হোটেলে ফিরবার পথে দেখলাম, নিকটের পাহাড়গুলোতে স্তবকে স্তবকে রডোডেনড্রন ফুটে আছে। হঠাৎ দেখে মনে হয় এবার যেন শরতের প্রথমেই ব্লু মাউনটেনস-এ তুষারপাত শুরু হয়েছে।

উৎসবের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এসে সবেমাত্র এক পেয়ালা কফি নিয়ে লাউঞ্জে এসে বসেছি, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমাকে অভিবাদন করলেন। আগন্তুককে দেখে আমিও সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে প্রত্যাভিবাদন জানা-লাম। তিনি আমার করমর্দন করে বললেন, আমার নাম এডওয়ার্ড হিল,

আমি এই ব্ল্যাকহীথ শহরের অধিবাসী আর আমি একজন রোটারিয়ান।

আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন, আজকের অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগলো?

বললাম, অভিনব। ফুলকে কেন্দ্র করে এমন আনন্দোৎসব এর আগে আমি আর কোথাও দেখিনি।

আমার আন্তরিক মন্তব্যে মিঃ হিল বোধ করি খুশি হলেন। উৎসাহিত হয়ে বললেন, জানেন, এই রডোডেনড্রন আপনাদের দেশেরই ফুল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের দেশের একদল হরটিকালচারিস্ট আপনাদের দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হিমালয় পর্বতের কোন একটা জায়গা থেকে তাঁরা গোটাকয়েক রডোডেনড্রন গাছের চারা এনে এইখানে পুঁতে দিয়েছিলেন। সেই কয়েকটি চারা থেকে আজ হাজার হাজার রডোডেনড্রন ব্ল্যাকহীথকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করছে।

শেষের কবিতা উপন্যাসের একটি কবিতার একটি ছত্র মনে পড়ে গেল—"উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ"

মনে মনে এ-ও ভাবলাম, এই ফুলটির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের থেকে আমি বেশি ভাগ্যবান। শিলং পাহাড়ে তিনি দু-চারটের বেশি রডোডেনড্রনগুচ্ছ দেখেননি। আর আমি দেখলাম পুষ্পভারে অবনত হাজার হাজার রডোডেনড্রন বৃক্ষ।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জানেন?

তিনি হেসে বললেন, না, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তবে মহাত্মা গান্ধীর নাম আমি জানি আর নেহরুর ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া থেকে আপনাদের দেশ সম্পর্কে কিছু কিছু জেনেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের দেশের এক মহাযশস্বী কবি ট্যাগোর সম্পর্কে কিছু জানেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর লেখা "ফ্রুট গেদারিং" ও "সং অফারিংস" আমি পড়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, ট্যাগোর পড়ার উৎসাহ পেলেন কোথা থেকে?

মিঃ হিল বললেন, স্কুলে পড়ার সময় ট্যাগোরের একটি কবিতা আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, ঐ কবিতাটির প্রথম ক'টি লাইন এখনও আমার মনে আছে।

এই বলে তিনি আবৃত্তি করলেন,

"হোয়েয়ার দি মাইণ্ড ইস উইথআউট ফিয়ার,

এণ্ড দি হেড ইস হেলড হাই"

পংক্তিটি আবৃত্তি করে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, মাফ করবেন, আর মনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ট্যাগোরের সং অফারিংস পড়ে আমার মনে হল যে, তিনি এক উচ্চাঙ্গের মরমী কবি ছিলেন।

মিঃ হিল এ-ও জানালেন যে, অস্ট্রেলীয় সাহিত্যে এ ধরনের মরমী কবির অস্তিত্ব একরকম নেই বললেই হয়।

একটু থেমে তিনি বললেন, আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমি একজন রোটারিয়ান। ব্ল্যাকহীথ রোটারী ক্লাবের সঙ্গে আপনাদের দেশের কয়েকটি রোটারী ক্লাবের যোগাযোগ আছে। আমরা জানি ভারতবর্ষে চক্ষুরোগের খুবই প্রাদুর্ভাব। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেকেই চশমা পরতে পারে না। আমাদের ক্লাব বছরে প্রায় চার-পাঁচ হাজার চশমার ফ্রেম আর লেন্স ভারতে পাঠায় সেখানকার রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে।

সত্যি কথা বলতে কি এই চশমা বিতরণের সংবাদটি শুনে খুশি হতে পারলাম না।

স্বদেশের ভিক্ষাপাত্রে বিদেশীর করুণামেশানো দাক্ষিণ্য। ভাবি কবে এই লজ্জা থেকে আমরা মুক্ত হব।

মিঃ হিল আমার মনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন কিনা বুঝলাম না।

একটু ইতস্তত করে তিনি যেন তাঁর কথায় অনেকটা অনুনয়ের সুর মিশিয়ে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা অনুরোধ করতে পারি ?

আমি বললাম, স্বচ্ছন্দে পারেন। সংকোচের কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বললেন, যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয় তবে আজ রাত্রে আমাদের রোটারী ক্লাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেবেন? খুবই সর্ট নোটিশ, তাই একটু ইতস্তত করছিলাম।

বললাম, তার জন্যে কিছু যায় আসে না। আপনার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম।

ক্লাবে আশি-নব্বইজন সদস্য। দেখলাম প্রায় সকলেই উপস্থিত আছেন। ডিনারের পর বললাম কিছু নিজের দেশ সম্পর্কে। আমাদের গৌরবময় অতীত, আমাদের বহুযুগের সঞ্চিত জীবনদর্শন, দুঃখ-কষ্টময় বর্তমান আর উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

বক্তৃতা শেষ করে ক্লাব থেকে যখন রাস্তায় নেমে এলাম, তখন মিঃ হিলও আমার সঙ্গে এলেন।

বললেন, বক্তৃতার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথা শুনে ক্লাবের সদস্যগণ সবাই খুশি।

বললাম, আমার ভাগ্য ভাল। তবে ধন্যবাদ দেবার মত কিছু করিনি। আমার দেশকে আপনাদের কাছে তুলে ধরাই ত আমার কাজ। আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকু পালন করেছি।

মিঃ হিল জিজ্ঞেস করলেন, কাল কি আপনি এখানে থাকবেন? বললাম, ভাবছি কালকের দিনটা এখানে থেকে যাবো।

এরপর শুভাকাঙ্খা জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

পরদিন হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছি। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। ভোরে ঘাসের উপর ফ্রস্ট্র জমতে দেখেছি। এখন বরফের হাল্কা আস্তরণ রৌদ্র তাপে গলতে শুরু করেছে। শহরের পথঘাট অদূরের পাহাড় শ্রেণীর মত নিস্তব্ধ। সকালের সোনালী রোদে পর্বতমালা বাড়ি-ঘরদোর রাস্তাঘাট ম্যাপেল গাছের সোনালী-পাতা সবই ঝলমল করছে। এমন মনোহর সকাল বহুদিন দেখিনি। বাইরে যাবো কিনা ভাবছি এমন সময় হোটেলের সদর দরজা দিয়ে মিঃ হিল ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখে সহাস্যে গুড মর্নিং বলে আমার করমর্দন করলেন। পাশের সোফাটায় বসে

তিনি বললেন, কেমন লাগছে ব্ল্যাকহীথের আজকের এই সকালটা ?

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম অত্যন্ত রমণীয়। আমি আমার সারা দেহমন দিয়ে এই সৌন্দর্য উপভোগ করছি।

আরো দু-চারটে এমনি ধরনের কথাবার্তার পর মিঃ হিল বললেন, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা অনুরোধ করতে পারি।

বললাম, স্বচ্ছন্দে করুন। মনে কিছুই করবো না।

তিনি বললেন, আপনার খুব অসুবিধে না হলে আজ দুপুরে যদি আমার বাড়িতে মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে খুব খুশি হব। অবশ্য আমার স্ত্রীরই আপনাকে এই আতিথ্য জানানো রীতি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু তিনি একটু ব্যস্ত থাকায় আমাকে এই ভার নিতে হয়েছে।

বললাম, তাতে কি হয়েছে। আমি আপনার স্ত্রীর আমন্ত্রণও সাদরে গ্রহণ করলাম। তা কখন আপনার বাড়ি যেতে হবে ?

মিঃ হিল বললেন, যদি আপনার বিশেষ কোন কাজ না থাকে, তবে এখুনি চলুন না আমার সঙ্গে।

কাজ কিছুই ছিল না। তৈরি হয়ে মিঃ হিলের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

গাড়ী শহর ছাড়িয়ে, পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তার দুদিকে ইউক্যালিপটাস গাছের ঘন বন, পথে জনপ্রাণী নেই, বনস্থলী স্তব্ধ, শান্ত আঁকাবাঁকা রাস্তায় মোচড় খেতে খেতে গাড়ি পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলো। প্রায় চার মাইল পথ অতিক্রম করে এলাম। পাহাড়ের উপরে কিংবা নিচে একটা বাড়িও চোখে পড়লো না। কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করলাম। একটু ভয়ও যে না হল এমন নয়। তখন প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখতাম অমুক দেশের কূটনীতিককে কে বা কারা গুম করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে মনে এ-ও ভাবছিলাম ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য সৎ ত ? কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভাবনা মন থেকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ভাবলাম, এই গহিন জঙ্গলে ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী নিঃসঙ্গ হয়ে থাকেন কি করে ? আর থাকেনই বা কেন ?

কিছুক্ষণ পর মিঃ হিলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ী আর কতদূর ?

তিনি স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে বাঁদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, সামনে ঐ যে রডোডেনড্রন কুঞ্জবীথি দেখতে পাচ্ছেন, ওখানেই আমার বাসস্থান।

চারিদিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু একটা বাড়িও নজরে পড়ল না। ভাবলাম, তাঁর এই বনবাস কি নিভৃতবাস, না অজ্ঞাতবাস। ভদ্রলোককে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি মিঃ হিলের বাড়ির কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলো। হিসেব করে দেখলাম, ব্ল্যাকহীথ শহর থেকে মিঃ হিলের আবাসস্থলের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল।

সদর ফটক থেকে তাঁর বাড়িও প্রায় দুশ' গজের মত। যেতে যেতে দেখলাম, ড্রাইভওয়ের দুপাশে অতি যত্নে লালিত বহুবিধ ফুলের মালঞ্চ। দেখলাম, এর মধ্যে বহু ফুলই আমার অজানা। সিডনী কিংবা অন্যান্য শহরের ধনী কিংবা মধ্যবিত্ত গৃহীর বাড়ির সংলগ্ন বাগানেও এসব ফুল আমি দেখিনি। যাই হোক গাড়ি থেকে নামতেই এক মধ্যবয়সী মহিলা আমাকে স্বাগত জানালেন। মিঃ হিল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী।

মিসেস হিলকে বললাম, আপনার ফুলের বাগান দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, বাগানটা আপনার ভালো লাগলো।

বললাম, সত্যিই খুব শান্তিময় পরিবেশ আপনাদের বাসস্থানের।

তিনজনে বাড়ীর ভেতরে এলাম। বাড়ীটি ছোট, ঘরে আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। বসবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর দেখে এদের শোবার ঘরে প্রবেশ করলাম। শোবার ঘরটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আর বিছানাটি খুবই পরিপাটি করে সাজানো। দেখলাম বিছানার উপর একটি সুশ্রী কভার আর তার উপরে প্যাণ্ট কোট টাই পরা বেশ বড় জাতের স্টাফ করা একটি বানর চোখে চশমা এঁটে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। বানরটির সামনে

খোলা পড়ে আছে একটি বই। দুহাতে বইটি ধরে বসে আছে বানরটি। মনে হচ্ছে সে যেন অধ্যয়নে মগ্ন। বানরটি থেকে চোখ ফেরাতেই মিঃ হিল বললেন, এই প্রাণীটি দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর হাতে কি বই আছে আপনার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

আমি বললাম, তা একটু হচ্ছে বৈকি।

মিসেস হিল বললেন, দেখুন না বইখানা।

ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, বইখানা মহাত্মা গান্ধীর লেখা সর্বোদয় আন্দোলন সম্পর্কে।

এবার মিসেস হিল জিজ্ঞেস করলেন, বইখানা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন?

এই বিদেশী দম্পতির কাছে নিজের দৈন্য প্রকাশ করে কি করে বলি যে, না, এ বইখানা আজো আমার পড়া হয়নি। তাই মিথ্যা ভাষণের আশ্রয় নিতে হল। আমতা আমতা করে বললাম, হ্যাঁ বেশ কয়েক বছর আগে পড়েছিলাম।

মিসেস হিল তদ্গতভাবে বললেন, জানেন এক এক সময় আমার মনে হয় জিমস (বানরটির নাম) আমাদের মত রক্ত মাংসে গড়া জীবন্ত প্রাণী। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি যখন মাঝে মাঝে এ ঘরে আসি তখন আমি যেন দেখতে পাই একটি জীবন্ত মানুষের মত জিমস নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে আর সামনের খোলা পাতাটা পড়া শেষ হলে পাতা উল্টে পরের পাতায় মনোনিবেশ করছে। আপনারা হয়ত বলবেন যে এ আমার মনের ভ্রম। তা হতে পারে কিন্তু মানুষের ভ্রম কি চিরকাল থাকে?

মিসেস হিল মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন, জিমস আমাদের কাছে বারো বছর বেঁচে ছিল। একবার আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো পর্যটনে বেরিয়েছিলাম। অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে একদিন পেনাং দ্বীপে এসে পৌঁছুলাম। দু'দিন পর একদিন সকালে ঘনঘটা করে বৃষ্টি শুরু হল। সেকি বৃষ্টি। সন্ধ্যে হয়ে এলো তবুও বর্ষণের বিরাম নেই। কিন্তু আমাদের একটা জরুরী কাজে না বেরুলেই নয়, তাই সেই বৃষ্টি

মাথায় করেই দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। ফেরার পথে শহরের একটা নির্জন পার্কের পাশ দিয়ে আসছি, দেখলাম একটা বানর শিশু বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একেবারে চুপসে গেছে আর ঠকঠক করে কাঁপছে। বানরটাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমি কয়েক পা অগ্রসর হলাম। তারপর কি জানি কি হল ছুটে গিয়ে ঐ শিশুটিকে দু'হাতে তুলে ধরে বুকের উপর চেপে ধরে একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতে হোটেলে ফিরে ওর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দিলাম। প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক শুশ্রূষার পর শিশুটি চোখ মেলে এক বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো। আমি বললাম, ওরে ভয় নেই, তুই এ যাত্রা বেঁচে উঠবি।

একটু থেমে মিসেস হিল বললেন, সেই বানর শিশুটিই জিমস। জানেন ওর মৃত্যুর পর ওকে বই দিয়ে কেন বসিয়ে রেখেছি? ও যতদিন জীবিত ছিল খুব পোষ মেনেছিল আমাদের। ও ছিল আমাদের গৃহের গ্রন্থাগারিক। এমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল ওর যে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমার ঐ ঘরে ঐ যে বই-এর আলমারিগুলো দেখছেন ওতে প্রায় হাজারখানেক বই আছে। আমাদের কেউ যদি জিমসকে বলতো, জিমস, ও ঘরের তিন নম্বর আলমারির দু নম্বর তাকের সতের নম্বর বইখানা নিয়ে এসো ত। জিমস অমনি ছুটে গিয়ে নির্ভুল বইখানা নিয়ে আসতো। বললে আবার যথাস্থানে রেখেও দিত। কখনও কখনও দেখতাম মিঃ হিল যেভাবে বসে বই পড়তেন জিমসও ঠিক সেভাবে বসে একখানা বই খুলে নিবিষ্ট মনে লেখাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মিঃ হিল যেমন পাতা ওল্টাতো জিমসও অমনি সেই ভঙ্গীতে তার বই-এর পাতা ওল্টাত। ঐ দেখে তখন আমার ভারী আমোদ বোধ হত। কিন্তু আজকাল সে সকল স্মৃতিকে আর ঘাটাই না। জিমস জীবনে যা করতে ভালবাসতো মৃত্যুর পরেও আমি ওকে তাই দিয়েছি। এর থেকে আর বেশী কি করতে পারতাম বলুন?

দেখলাম মিসেস হিলের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পেছনে পেছনে ওরা

দুজনেই আসছেন দেখলাম। খোলা বারান্দা ঘুরে মিসেস হিল নিঃশব্দে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। মিঃ হিল এগিয়ে এসে বললেন, আসুন আপনাকে দু-একটা জিনিস দেখাই।

আমরা দু'জনে ফুলের বাগানে প্রবেশ করলাম। চারদিকে অপূর্ব পুষ্প সমারোহ। বাগানের একদিকে মরশুমী ফুলের প্রাচুর্য আর অন্যদিকে কয়েকটি কেয়ারীতে আমার অপরিচিত মনোমুগ্ধকর বিস্তৃত পুষ্পসম্ভার। যেমন তাদের বর্ণচ্ছটা তেমনি তাদের গঠন ভঙ্গিমা। মনে হয় বিশ্বশিল্পী যেন নিপুণ হাতে এদের বর্ণমাধুর্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বহু রং-এর এই একত্র সমাবেশে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম। তন্ময়তা ভঙ্গ করে মিঃ হিলকে জিজ্ঞেস করলাম এরা কোন জাতের ফুল? এ ধরণের ফুল এর আগে কোথাও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

মিঃ হিল বললেন, এরা সবাই অস্ট্রেলিয়ান আরণ্যক পুষ্পগোষ্ঠী। ব্লু মাউনটেনস-এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে আপনি ফুটে থাকে। সময় হলে এরা আপনিই ঝরে যায়। আবার মৌসুমী বায়ুর সংস্পর্শে এলে ভূঁয়েপরা পুষ্পবীজ আপনিই গজিয়ে উঠে। প্রকৃতির কতবড় রংয়ের খেলা যে এই অরণ্য পুষ্পের পেলব পাপড়িতে আর বিচিত্র অবয়বের ফুলের গঠন-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারুবাক্শিল্পী ও ভাষায় এ সৌন্দর্য ব্যক্ত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক, আরো দু-চারটা ফুলের কেয়ারী ঘুরে একটি ছোট গাছের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে মিঃ হিল বললেন, এই গাছটি দেখুন।

গাছটি স্প্রুস জাতীয়। আমাদের ময়না কাঁটা গাছের মত দেখতে। কিন্তু গাছটির রং একেবারে ঘননীল।

মিঃ হিলকে জিজ্ঞেস করলাম, গাছটির নাম কি।

তিনি বললেন, ব্লু স্প্রুস।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্প্রুস গাছের রং কি নীল হয়?

তিনি বললেন, না, সাধারণত স্প্রুসের রং হালকা সবুজ।

বললাম, এটিকে সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে ?

তিনি বললেন, ব্লু স্প্রুস বলে কোন জাত নেই। ঐ সবুজ রংয়ের স্প্রুসকেই অনেক যত্নে আর দীর্ঘদিনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল রংয়ে রূপান্তরিত করতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন লাগে ?

তিনি বললেন, আমার বারো বছরের চেষ্টায় একটি সবুজ গাছ আজ নীল রংয়ে পরিণত হয়েছে।

বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, আপনার ধৈর্য অসীম, একথা মানতেই হবে, এবং বস্তুটি আপনার প্রচুর পরিমাণে না থাকলে একটি গাছের উপর বারো বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারতেন না।

একটু হেসে তিনি বললেন, আমি একজন সাধারণ লোক। মনে করুন জগতের কত মনীষী যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধনা করে গেছেন মানুষের কল্যাণ কামনায়। এত আমার নিছক, বোধকরি নিরর্থক রূপচর্চা।

এই বলে ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন।

যেতে যেতে বললাম, যদি এটা সত্যিই নিরর্থক রূপচর্চা বলে আপনার মনে হত, তবে এক যুগ ধরে এই বৃক্ষটির পরিচর্যায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারতেন না।

আমার কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন মানুষের দেহগঠনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সার্জন মানুষের দেহে প্লাস্টিক সার্জারী করেন। আমিও প্রকৃতির দেহে নির্মম সার্জারী করলাম কিনা কে জানে ? কাজটা যে শুধু অনধিকার চর্চা বলে আমার মনে হয়েছে তাই নয়, কাজটা অসঙ্গতও বটে।

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে মিঃ হিল বললেন, আপনার কি মনে হয় ?

আমি বললাম, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। প্রকৃতির অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কাজকে পূর্ণ করার অধিকার মানুষের নিশ্চয়ই আছে। আপনি সেই অধিকার প্রয়োগ করেছেন মাত্র।

আমার কথা শুনে মিঃ হিল একটু হাসলেন মাত্র। এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, আসুন।

ফুলের বাগান পেরিয়ে আমরা একটা ঢিবির সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা ঘুরে ঢিবিটার পেছনে গিয়ে দেখলাম ওটার নিচের দিক থেকে কেটে কেটে ছোট ছোট গুহার মত তৈরী করা হয়েছে। আট দশটা গুহার পরিসর খুবই ছোট। দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে পাঁচ-ছ ফুটের বেশী হবে না। সবগুলো গুহার আকার প্রায় সমান।

জিজ্ঞেস করলাম ওগুলো দিয়ে কি হয় মিঃ হিল?

তিনি বললেন, এগুলো আমার কোন কাজে আসে না। প্রয়োজন অন্যদের।

একটু থেমে তিনি বললেন, এখানে শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। চারদিক বরফে সাদা হয়ে যায়। আট দশ বছর আগে একদিন সকালে বাড়ীর বাইরে এসে দেখলাম, একটি পিঙ্গল বর্ণের শেয়াল তিনটি শিশু নিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরে পড়ে আছে। ঐ দুরন্ত শীতের রাতে বেচারা কোথাও বোধকরি একটু আশ্রয় পায়নি। হয় নেকড়ে বাঘের তাড়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ঐ দুরন্ত শীতের রাত্রে শেয়ালটি তার তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে নিজের আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। হয়ত ভেবেছিল, আমার বাড়ীর আনাচে কানাচে কোথাও একটু গরম আর নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। কিন্তু আমার বাড়ীর গোলা-ঘর পর্যন্ত ওরা পৌঁছুতে পারলো না। বাগানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিঃ হিল বললেন, এই ঘটনার কয়েক মাস পর আমি এই গুহাগুলো তৈরী করিয়েছি। এখনও শীতে নানা জাতীয় নিশাচর জন্তু বরফের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে এই গুহাগুলোতে আশ্রয় নেয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কখনও এদের এই গুহাগুলোতে যাওয়া-আসা করতে দেখেছেন?

মিঃ হিল বললেন, এদের যাওয়া-আসাটা বড় বেশী আমার চোখে পড়ে না। কারণ গভীর রাত্রেতেই এদের আনাগোনা। তবে সকালের দিকে দু'একবার দেখেছি মা-শেয়াল বাইরে গেছে গুটি কয়েক ছানা গুহার মধ্যে রেখে। কয়েকটি বুনো খরগোসকেও বাচ্চাকাচ্ছা নিয়ে গুহার মধ্যে দু একবার দেখেছি। তবে শেয়ালের আনাগোনার আওয়াজ কানে গেলেই ওরা পালিয়ে যায়। অনেকদিন এদিকে আর আসে না।

গুহা ছেড়ে মিঃ হিল এবার আমাকে নিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলেন। পঞ্চাশ ষাট ফুট নিচেই সমতল ভূমি। সেখানে নেমে বাঁ দিকে একটা মোড় ঘুরতেই দেখলাম দৈর্ঘে প্রায় চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ছ ফুট সিমেণ্ট কংক্রিটের একটি টেবিল। তার উপর ছোট রেকাবীর সাইজের এলুমিনিয়ামের বাসন একটির পর একটি সাজানো রয়েছে। পাশে অনেকগুলো জল ভর্তি অগভীর বাটি। রেকাবীগুলোর মধ্যে নানা জাতীয় খাদ্য।

কৌতুহলভরা দৃষ্টি দিয়ে মিঃ হিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ভোজের আয়োজন কাদের জন্যে ?

মিঃ হিল একটু হেসে বললেন, আমার অতিথিরা আপনাকে দেখে লজ্জায় আসতে পারছে না। আপনি সামনের ঐ ওক গাছটার পেছনে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে একটু অপেক্ষা করুন, তাহলেই তাদের দেখতে পাবেন।

মিঃ হিলের নির্দেশানুসারে ওকগাছের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিনিট পাঁচেকও অপেক্ষা করতে হল না। দেখলাম হরেক রকম পাখী বিচিত্র ধ্বনী তুলে ঐ লম্বা টেবিলটার উপরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর কোনপ্রকার বাকবিতণ্ডা না করে খাবারগুলো গিলতে শুরু করে দিল। এমন বিচিত্র রংয়ের আর বিভিন্ন সাইজের এতগুলো পাখীর এমন একত্র সমাবেশ এর আগে আর কখনও দেখিনি! দেখলাম খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, ঝগড়া নেই, চেঁচামিচি নেই, পাখার ঝটপটানি নেই, নিঃশব্দে যে যার আহার সমাধা করে, বাটিটা

থেকে জল খেয়ে শূন্যে ডানা মেলে যে যার গন্তব্যস্থলে উড়ে গেল। টেবিলটির কাছে গিয়ে দেখলাম ভোজ্য বস্তুর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। রেকাবীগুলো একেবারে সাফ।

মিঃ হিল বললেন, আমার অতিথিদের দেখলেন। এরা দিনে ছ'বার আমাদের সেবা গ্রহন করেন। সকালে আর বিকেলে সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এখানে লোকজন ত দেখছি না। এদের খাবারগুলো এমন পরিপাটি করে কেই বা সাজিয়ে দেয়, আর বাসন-পত্রগুলো অমন মেজেঘসে সাফসাফাই করে রাখে কে?

মিঃ হিল বললেন, ও-কাজগুলো আমি আর মিসেস হিল ছজনে মিলেই করি। লোকজন আর পাবো কোথায়!

জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন ধরে এরা আপনার অতিথি?

মিঃ হিল একটু চিন্তা করে বললেন, তা দশ-বারো বছর হবে। তিনি আরো বললেন, আমাকে খানিকটা বাধ্য হয়েই এই কাজটা নিতে হয়েছে।

তিনি বললেন, শীতকালে এ অঞ্চলে কোন পাখী থাকে না। জায়গাটা কেমন যেন শূন্য শূন্য আর ছন্নছাড়া মনে হত। আমি ভাবলাম এই শূন্যতা দূর করতে হলে এ অঞ্চলের পাখীদের ধরে রাখবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্যের অভাবেই যে পাখীরা অন্যত্র চলে যায় তা আমি বুঝেছিলাম। তাই খাদ্যের লোভ দেখিয়ে এদের ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। শীত পড়বার আগেই গাছের তলায় আর এদিকে ওদিকে খাবার ছড়িয়ে রেখে দিতাম। তখন এরা বিনা দ্বিধায় খাবারগুলো খেয়ে যেত। কিন্তু শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ওখানে খাবার রাখা বন্ধ করে ছোট একটি টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে রাখলাম ওদের দৃষ্টি-গোচর হবে বলে। ছ-চারটে পাখী খাবার লোভে এদিকে ওদিকে ঘোরা-ঘুরি করত বটে কিন্তু ভয়ে গাছের ডাল থেকে নিচে নামতো না। পরে ভয় একটু ভাঙতেই কোকাবুরা বা ঐ জাতীয় বড় বড় পাখী চট করে নীচে

নেমে খাবার মুখে করে আবার গাছের ডালে গিয়ে বসতো। তারপর যেদিন থেকে ওরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করলো তখন দু-চারটে পাখী একসঙ্গে টেবিলের উপর বসে খাবার খেতে আরম্ভ করলো। তখন টেবিলটা এত দীর্ঘ ছিল না। অতিথিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিঃ হিল আরো বললেন, আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে খাওয়া শেষ হলে পাখীগুলো এখানে বসে থাকে না, খাওয়ার সময় সবাই মিলে আসে আর খাওয়া শেষ হলেই চলে যায়।

হেসে বললাম, হ্যাঁ তা লক্ষ্য করেছি। আর সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম যে আপনার অতিথিদের কৃতজ্ঞতাবোধ খুবই কম। এই যে দু'বেলা আপনার অন্ন ধ্বংস করছে তার জন্যে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত ওরা আপনাকে দেয় না।

মিঃ হিল তেমনি হেসে বললেন, এরা ধন্যবাদ বোধকরি দেয়। কিন্তু মানুষের মত শুকনো ধন্যবাদের ভাষা ওরা জানে না বলেই হয়ত আপনার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।

এর পর ওখান থেকে মিঃ হিল আমাকে নিয়ে বাড়ীর অনেকটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলেন। দেখলাম, আমার সামনে শ্রেণীবদ্ধভাবে গাছের সারি অনেক দূর চলে গেছে। একটি বৃক্ষ থেকে অপরটির ব্যবধান দশ-বারো ফুটের কম হবে না। কোন কোন গাছ বেশ বড় আর ঘনপত্র-পল্লবে সমাচ্ছন্ন। আবার বেশ কিছু গাছ বয়েসে নবীন। মনে হল, শৈশব পার হয়ে সবেমাত্র যেন কৈশোরে পা দিয়েছে। সমতল মাটিতে আগাছার চিহ্নমাত্র নেই। দামী সবুজ ঘাস সযত্নে ছাটা। আরো লক্ষ্য করলাম প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায় ইংরেজি টি অক্ষরের অনুরূপ কাঠের ফলকে কি যেন লেখা রয়েছে।

একটু পরে তিনি তাঁর বাড়ীর দিকে চলে গেলেন এবং ঐ টি সেপের একটি ফলক মাটিতে পুতে দিলেন দেখলাম ওতে নীল রং দিয়ে লেখা রয়েছে—এ স্যাপলিং অব পেস্তাচিও ফ্রম আফগানিস্তান, প্ল্যানটেড

বাই—আমার নাম, অক্টোবর ১০, ১৯৬৮ সাল।

বৃক্ষরোপন পর্ব সমাধা হবার পর মিঃ হিল ঘুরে ঘুরে অন্যান্য গাছ দেখাতে লাগলেন। দেখলাম বহু দেশের মানুষ আমার আগে এখানে আমারই মত একটি করে গাছ পুঁতে গেছেন। বিচিত্র সেই সকল গাছ। কেউ দশ-বারো বছরের পুরনো আবার কেউ বা হালফিলের।

বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি। মিসেস হিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতের তালি বাজিয়ে একটা শব্দ করলেন।

মিঃ হিল বললেন, চলুন মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক পড়েছে।

যেতে যেতে দেখলাম এই বৃক্ষকুঞ্জের নাম ফ্রেণ্ডস গ্রোভ, একটি কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে।

বাড়ী ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসলাম। আহার্যের মধ্যে রয়েছে একটা ভেজিটেবল স্যুপ, মাংসের অল্প একটু ষ্টু, কিছু চীজ, পাউরুটি আর নানাধরণের ফল। অন্যান্য আহার্যের পরিমাণ পর্যাপ্তই মনে হল। কিন্তু অতটুকু মাংসের ব্যাঞ্জন তিনটি প্রাণীর পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মাংসের বাটিটার দিকে দু-চারবার আমার চোখ পড়তেই মিসেস হিল যেন আমার মনোভাব বুঝতে পারলেন, বললেন, মাংসটা শুধু আপনার জন্যেই, আমরা নিরামিষ খাই।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি চিরকালই নিরামিষাশী?

তিনি বললেন, না, আজ পনের বিশ বছর আমরা মাছ মাংস খাই না। পেঁয়াজ রসুনও বড় একটা খাওয়া হয় না। এতেই বেশ চলে যায়।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ছেলেপুলে নেই?

মিসেস হিল বললেন, একটি মেয়ে। অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে থাকে টাসমানিয়ার রাজধানী হোবার্ট সহরে।

তিনি আরো জানালেন, বৎসরান্তে মেয়ে-জামাই একবার আসেন। দু-তিন সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যান।

এবার মিঃ হিলকে তাঁর কর্মজীবনের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন, আমার বাবার একটা বড় ট্যানারী ছিল। আইন বিষয়ে স্নাতক হয়ে আমি পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগ দিই। পঞ্চাশ বছর বয়সে আমি কর্ম থেকে অবসর নিই। ট্যানারীকে একটা ট্রাস্টের হাতে সঁপে দিয়ে মাসিক একটা ভাতা নিয়ে রোটারী ক্লাবে যোগ দিই। সেই থেকে এভাবেই আমার দিন কাটছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে, মিষ্টার এবং মিসেস হিলকে তাঁদের উষ্ণ আতিথেয়তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ব্ল্যাকহীথ শহরে ফিরে এলাম। আর সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় সিডনী শহরের অভিমুখে রওনা হলাম।

পথে আসতে আসতে ভাবছিলাম কে এই এডওয়ার্ড হিল? তিনি কি শুধুই একজন অবসরপ্রাপ্ত চর্মব্যবসায়ী অবসর জীবন কর্মের শৃঙ্খলার মধ্যে কাটাবার জন্যেই রোটারী ক্লাবের সভ্য হয়েছেন আর নিজের কতকগুলো অর্থহীন খেয়াল খুসী চরিতার্থ করার জন্যে নিভৃত বাসভবনে একটার পর একটা কৃত্রিম বদান্যতার আত্মঅহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন? এ প্রশ্নের উত্তর এখনও নিজের কাছে খুঁজে পাইনি। কিন্তু আমার বারবার একথা মনে হয়েছে যে যদি আমি আমার সংকীর্ণ দৃষ্টির ঊর্দ্ধে উঠতে পারতাম, সত্যের আলোকছটা আমার দৃষ্টির অস্বচ্ছতা যদি ঘুচিয়ে দিতে পারতো তবে হয়ত এডওয়ার্ড হিলকে ভারতের এক প্রাচীন ঋষির আসনে বসাতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতাম না।

প্রচণ্ড ধনীর সন্তান হয়েও বিলাসব্যসনের কুহক ছিন্ন করে বনবাসীর সরল অনাড়ম্বর জীবন, চোখেমুখে ঋষিসুলভ প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টি, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম, নির্জন বনবিহারী হয়েও পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি একাত্মবোধ এবং সর্বোপরি এই অনন্ত বিশ্বাস যে প্রকৃতিই সকল জীবের একান্ত মিলনক্ষেত্র আমাকে বারবার উপনিষদের সেই কালজয়ী বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

"যত্রবিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"

ভারতবর্ষে আজ তপোবন নেই কারণ ভারতবর্ষে আজ আর ঋষির

জন্ম হয় না। কেননা ঋষিরাই তপোবন সৃষ্টি করতেন। তবে এই ভেবে আনন্দ পাই যে এই পৃথিবী থেকে ঋষির অস্তিত্ব এখনও লোপ পায়নি আর তপোবনও বিলুপ্ত হয়নি। একদিন যা ছিল একান্তভাবে ভারতেরই গৌরব আজ তা ভিন্নরূপে, ভিন্ন পরিবেশে দেশে দেশান্তরে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মানুষের মিলনক্ষেত্র তৈরী করে চলেছে।

ক'দিন ধরেই নিউ সাউথ ওয়েলস-এর উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড হিম প্রবাহ বয়ে চলেছে। আমি যেখানে থাকি সেই 'ডোভার হাইটস্' আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলোর দু'ধারে সারবন্দি আপেল আর পীচফলের গাছগুলোতে যে-কটা বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা পতনোন্মুখ হয়ে গাছের ডালগুলোতে এতদিন ঝুলছিল কাল সন্ধ্যাবেলা দূতাবাস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে দেখলাম সেগুলো "গন উইথ দি উইণ্ড"। অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় জর্জরিত ঐ ন্যাড়া গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন ঠিক গাছ নয়। ওগুলো যেন এক একটা 'হাইড্রা'। সমুদ্রের জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে এসে চলৎশক্তি হারিয়ে যে যেখানে পেরেছে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে বাইরে নেমে দেখলাম বাতাস ভারী, গতি মন্থর। বুঝলাম তুষারপাত আসন্ন।

আমার গৃহাভ্যন্তরের রুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে বাইরের আবহাওয়ার ক'মাস ধরেই সতিনালা বাদ চলছে। সেন্ট্রাল হিটিং-এর কল্যানে আমার বাড়ীর ভিতরকার তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম নয়, কিন্তু বাইরের তাপমাত্রা তখন চৌদ্দ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে গেছে।

লাউঞ্জে বসে কফি খেতে খেতে মনে পড়লো আগামী কাল সন্ধ্যায় লিথগো সহরে যেতে হবে। ওখানকার রোটারী ক্লাবে নৈশাহার, তৎপর বক্তৃতা। একটু চিন্তিত হলাম, শীতাধিক্যের জন্য নয়। কারণ গাড়ীতে হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যদি যেতে যেতে হাল্কা তুষারপাত হয় তবে রাস্তা বিপদজনক হয়ে উঠবে। যেকোন মুহূর্তে গাড়ীর চাকা বরফের মধ্যে পিছলে গিয়ে গাড়ী স্কীড করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঠেকানো শিবেরও অসাধ্য। লিথগো সহর ডোভার হাইটস্-এর কাছে

পিঠে নয়। দূরত্ব প্রায় পচাত্তর মাইল। দেখা যাক আগামীকালের আবহাওয়ার কি পরিবর্তন হয় এই ভেবে দুশ্চিন্তার হাত থেকে আপাতত অব্যাহতি পেলাম।

পরদিন ভোরে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই গোপালগঞ্জের সীতানাথ একাডেমির হেডমাষ্টার মশায়ের কথা মনে পড়লো। তখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বাৎসরিক গনিতের পরীক্ষায় লাড্ডু পেয়ে গাড্ডু মেরে বাত্যাহত কদলীপত্রের মত কিংবা বলতে পারি বলির পাঁঠার মত কম্পিত কলেবরে যখন হেডমাষ্টার মশায়ের সামনে এসে দাঁড়ালুম তখন তিনি তাঁর সাত ইঞ্চি লম্বা করক-মলের চার ইঞ্চি দীর্ঘ টেম্পার দেওয়া ষ্টীলের মত আঙ্গুলগুলো যতদূর সম্ভব বিস্তার করে আমার গণ্ডে যে এক চড় কষিয়েছিলেন তার জ্বলুনীর সঙ্গে আজকের সকালের কুমেরু অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা হিমেল হাওয়া আমার গালে যে থাপ্পরটি মারলেন তার যন্ত্রনার তীব্রতা একমাত্র হেড-মাষ্টার মশায়ের চপেটাঘাতের সঙ্গেই তুলনীয়।

দূতাবাসে যাওয়ার পথে গাড়ীটি মোটর মেরামতের কারখানায় রেখে গেলাম। সামান্য মেরামতের প্রয়োজন ছিল। আজ সন্ধ্যায় দূরে যেতে হবে, পথে কোনক্রমেই গাড়ী না বাগড়া দেয় তাই এই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা। গ্যারেজের কর্মাধক্ষ্য আশ্বাস দিলেন বিকেল পাঁচটার মধ্যে গাড়ী আমাদের দূতাবাসে পৌঁছে দেবেন।

অফিস ছুটি হওয়ার পর বসে আছি গাড়ীর অপেক্ষায়। দূতাবাস থেকে সোজা লিথগো যাবো। ঠিক পাঁচটার সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই গ্যারেজের কর্মাধক্ষ্য বললেন, আমরা খুব দুঃখিত। আপনার গাড়ীটা আজ দিতে পারবনা। গীয়ারে বেশ গোলমাল আছে। আজ রাত নটা দশটা পর্য্যন্ত কাজ করতে হবে। কাল সকালে আটটার মধ্যে গাড়ী ফেরৎ দিলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

আমি বললাম, তা একটু হবে, কারণ আমার এখুনি একবার লিথগো যেতে হবে।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তা হলে ত আপনার বেশ অসুবিধে করলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার গ্যারেজে এক খানা হোলডেন গাড়ী আছে। আমি ওখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে সঙ্গে একজন সোফারও নিতে পারেন।

প্রস্তাবটা গ্রহণ যোগ্য মনে হোল। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলাম আমার মত একজন বৈদেশিক কূটনীতিকের পক্ষে এ দেশের প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হলে মুস্কিলে পড়ে যাবো। তাই গ্যারেজের মালিককে বললাম, আপনার সহৃদয়তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনার গাড়ীর দরকার হবে না, আমি একটা ট্যাক্সি করে চলে যাবো।

ট্যাক্সি করপোরেশনে টেলিফোন করতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি এসে হাজির। কাল বিলম্ব না করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে এসে বসলাম। গাড়ী লিথগো অভিমুখে রওনা হলো।

বাইরে প্রচুর ঠাণ্ডা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বরফ পড়েনি। শীতের বেলা। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তায় আলো ঝলমল। পণ্য-বিপনিগুলোর মাথায় উপরে নানা রঙের উজ্জ্বল নিয়ন আলোর সাহায্যে ভোগ্য পণ্যের এ্যাডভারটাইসমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। জর্জ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা রোড ক্রশিং এর কাছে আসতেই ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের লাল আলোটা জ্বলে উঠলো। অনিবার্য কারণেই ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে হল। বাইরে তাকাতেই একটি অভিনব এ্যাডভারাইসমেন্ট চোখে পড়লো। এ্যাডটি কোন এক ব্রেসিয়ার কোম্পানীর। নিরাবরণ বক্ষে একটি তরুণী একটার পর একটা ব্রেসিয়ার পরছে, কিন্তু পছন্দসই না হওয়ায় সেগুলো ফেলে দিচ্ছে। অবশেষে ঐ ব্রেসিয়ার কোম্পানীর প্রস্তুত ব্রেসিয়ারটি বক্ষে জড়িয়ে মেয়েটি খুসিতে ডগমগ।

সবুজ সংকেত পেয়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো। বিখ্যাত সিডনী 'হারবার' ব্রীজ পার হয়ে নর্থ সিডনী অতিক্রম করে ট্যাক্সি হাইওয়েতে পড়লো।

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দেবার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, "উড ইউ লাইক টু হ্যাভ এ স্মোক।" ড্রাইভার ধন্যবাদ জানিয়ে সিগারেটটি তার অধরোষ্ঠের ফাঁকে চেপে ধরলো। আমি তাতে অগ্নি সংযোগ করে দিলাম।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ। ড্রাইভার তখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটিও কথা বলেনি। নিরবে তার কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছে। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, কেন্ট ষ্ট্রীট আর জর্জষ্ট্রীটের মোড়ে ঐ ব্রেসিয়ার কোম্পানীর এ্যাডভারটাইসমেন্টটা আপনি দেখেছেন?

ড্রাইভার নির্বিকার গলায় বললো, হ্যাঁ দেখেছি। রোজই দিনেরাত্রে পাঁচ সাতবার করে দেখি।

প্রশ্ন করলাম, ওটাকে আপনাদের সভ্য সমাজের রুচি বিগর্হিত অশ্লীল বলে মনে হয়না?

আমার প্রশ্নে ড্রাইভার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইলো। তারপর রাস্তার দিকে মুখ রেখেই বললো, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি বিদেশী এবং এখানে নবাগত। আপনার প্রশ্ন শুনেই মনে হল আপনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ, আপনি জীবনে সুখী।

জিজ্ঞেস না করে পারলামনা আমার প্রশ্নের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এমন কি ইঙ্গিৎ ছিল যা থেকে আমার সম্বন্ধে আপনি ঐ রকম একটা ধারণা করে নিলেন।

ড্রাইভার নির্লিপ্ত গলায় বললো, ছিল। আপনার জীবন পাত্রে যদি সুধার পরিবর্ত্তে তীব্র বিষের ফেনা উছলে উঠতো তবে ঐ সামান্য একটা এ্যাডভারটাইসমেন্টের শীলতা অশ্লীলতার দ্বন্দ আপনার মনে আসতো না। আপনার দুর্ভাগ্যের চিন্তায় আপনি নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে আপনার সংযোগ একটা ক্ষীণ সূতোর সঙ্গে বাঁধা থাকতো।

ড্রাইভারের কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যে এর

জীবনে কোথাও হয়ত একটা গভীর ক্ষত লুকিয়ে আছে।

প্রশ্ন করলাম, কারো জীবনের কাহিনী দিয়ে আপনি আপনার এই অভিমত প্রমাণ করতে পারেন ?

ড্রাইভার বললে, পারি। আমার নিজের জীবনের কাহিনী দিয়েই পারি। শুনবেন সে নিদারুণ ঘটনার ইতিহাস।

আমি বললাম, যদি আপনার আপত্তি যা থাকে ত বলুন। সহানুভূতির মন দিয়েই তা শুনবো।

ড্রাইভার বলতে শুরু করলেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই সিডনী সহরেই একটা বড় বীয়ার কোম্পানীতে আমি কাজ করতাম ব্রুয়ারী সেকশনে।

প্যাকিং বিভাগে কাজ করতো এলিজাবেথ বলে একটি মেয়ে, মেয়েটি ভারি চটপটে, ওকে সবাই লিজা বলে ডাকতো। লিজার উচ্ছল যৌবন আমাকে ওর দিকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল। আর ওর কর্মনিষ্ঠায় আমার মনে ওর সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধার ভাবও উদয় করেছিল। লিজার চরিত্রে আরো দু'চারটে সদগুণও ছিল। আমি লিজার প্রেমে পড়লাম। লিজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলোনা। বরং লিজাও আমার প্রতি আকৃষ্ট হলো। আমার তখন বয়স চব্বিশ পঁচিশ। তখন পর্যান্ত আমি আর অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসিনি। তাই প্রথম প্রেমের উন্মদনায় আমি সারা জগৎ জুড়ে শুধু লিজাকেই দেখতে পেতাম। অনেক মোহময় সন্ধ্যা আর মধুময় রাত্রি লিজার সঙ্গে কেটে গেল। কাজের শেষে প্রায়ই লিজা আমার বাড়ীতে আসতো। দু'জনে একসঙ্গে পান ভোজন করে হয় সিনেমায় নাহলে হয়ত কোন নাচের আসরে যেতাম। যেদিন বাড়ী থেকে বেরুতামনা, লিজা নিজেই হেঁসেলে গিয়ে এটা ওটা রান্না করতো। তারপর খেয়েদেয়ে দু'জনে এক শয্যায় রাত কাটিয়ে দিতাম। এভাবে কয়েকটা বছর যেন সুখস্বপ্নের মাধুর্যে পার হয়ে গেল। কিন্তু একদিন আবিস্কার করলাম আমার রোমান্টিক ভাবাবেগের দিন শেষ হয়েছে। যে-প্রেমের বীজটি আমি নিজের হাতে বপন করেছিলাম এবং

যেটিকে নিজের হাতের সেবায় আর যত্নে লালন করেছি আজ সেই বৃন্তে কুঁড়ির উদ্গম হয়েছে। হয়ত কিছুদিন পরেই ঐ কুঁড়ি মুকুলিত হয়ে উঠবে। মনে হল লিজা শুধুমাত্র আমার প্রনয়ণী নয়। লিজা আমার বধু, আমার স্ত্রী, আমার গৃহিণী। আমার ভাবী সন্তানের জননী। লিজাকে নিয়েই আমার সুখের ঘর বাঁধতে হবে।

লিজাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই ও গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললো, বিয়েথা কেন? এইত বেশ আছি। এ ভাবেই চলুকনা যতদিন চলে।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, দেখ লিজা, এভাবে আর চলতে পারে না। আমি স্ত্রী চাই, ঘর সংসার চাই, সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান চাই। তুমি রাজী হয়ে যাও। লক্ষীটি আমার।

আমার কথাশুনে লিজা নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, কুল ধু হওয়ার জন্যে লিজার জন্ম হয়নি। আর তুমি একটা মূর্খ। মূর্খকে হয়ত ভালবাসা যায়, কিন্তু তাকে নিয়ে সংসারী হওয়া যায়না। আমি চললাম।

সেই যে লিজা চলে গেল আর ফিরে এলোনা।

একটু দম নিয়ে ড্রাইভার বললো, লিজার এই অপ্রত্যাশিত আচরনে আমি ভেঙ্গে পড়লুম। কাজে মন দিতে পারছিলাম না। সমস্ত জগৎ-সংসারটাই আমাকে দেখে যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসতে লাগলো। বিষাদে আর হতাশায় তখন আমি মুহ্যমান। মনের এই সংকট থেকে যখন কিছুটা মুক্ত হলাম, খানিকটা স্থৈর্য ফিরে এলো, তখন একদিন বীয়ার কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে বাথহারস্ট সহরে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে চলে এলাম।

আমার কাহিনী শুনে আমার বন্ধু আমাকে বললো, তুই একটা আস্ত গাধা। আচ্ছা তুই কি দেখিসনি গাছের ডালে কত পাখীর সুখের নীড় ঝড়ো হাওয়ার প্রথম ধাক্কাতেই উড়ে যায়। কিন্তু ঝড় থেমে গেলে

সেই পাখীই আবার নতুন করে গাচের শাখায় নীড় বাঁধে। তোর ত এখন পর্যান্ত ঘর বাঁধাই হয়নি। তবে ঝ কে তোর ভয় কিসের ?

এবার ড্রাইভার আর একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে গাটা কয়েক লম্বা টান মেরে বললো, বন্ধুর জ্ঞানদানে আমার মনের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলনা। প্রায় পক্ষকাল গুম মেরে বসে রইলাম।

তারপর একদিন বিকেলে আমার বন্ধু কাজ থেকে ফিরে এসে বললো, এলবার্ট, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ?

বন্ধু বিরক্ত হয়ে বললো, আঃ, চলনা। তোকে তো আর ভাগাড়ে নিয়ে যাচ্ছিনা।

দুই বন্ধুতে পথে নামলাম। লখলান নদীর পুল পার হয়ে এক বিস্তির্ণ ক্লোভার-লিফ-এর খেতে ঢুকে পড়লাম। তখন রক্ত গোলাপের মত লাল সূর্যটা দূরের বনরেখাটা প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। খেতের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম অদূরে একটি মেয়ে আর একজন প্রৌঢ় কাজ করছে।

আমার বন্ধু দ্রুতপায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও অনু-সরন করলাম।

একটু দূর থেকেই আমার বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে উচ্চকণ্ঠে অভিবাদন করলেন। হ্যালো মিষ্টার গ্রেগ, হাউ ডু ইউ ডু। তারপর সেই মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললো, হাউ আর ইউ মোনালিজা ?

নামটা শুনে চমকে উঠলাম।

তখন আমার বন্ধু আমাকে তাদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। "হিয়ার ইজ মাই গুড ফ্রেণ্ড এলবার্ট। এ বীয়ার মেকার, এণ্ড দে আর দি ওনারর্স অব দিস ফার্ম।"

আমি ওদের সঙ্গে করমর্দন করে আমার শুভেচ্ছা জানালাম। কর-মর্দন করার সময় একটু হেসে মোনালিজা আমার মুখের দিকে তাকালো। সূর্য্যের অস্তরাগের শেষ আভাটুকু মোনালিজার মুখের উপর এসে

পরেছে। মনে হল যেন একটা আরক্ত টিউলিপ তার সবগুলো পাপড়ি মেলে দিয়ে ফুলের ভেতরকার নীলপরাগ স্তম্ভটি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছে। মোনালিসার আয়ত চোখদুটি ঘননীল। বলতে বাধা নেই ওকে দেখে আমি মোহিত হলাম।

দুজনে বাড়ী ফিরে এলাম।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, মোনালিসাকে কেমন দেখলি?

বললাম, ভালই। কিন্তু ওর সঙ্গে ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কে?

বন্ধু বললো, মোনালিসার বাবা। মোনালিসা ওর একমাত্র সন্তান।

বন্ধু আরো বললো, ইনি অবস্থাপন্ন চাষী। মার্জিতরুচি সম্পন্ন। কিন্তু উনি বিপত্নীক।

কয়েকদিন পর বন্ধু আমাকে বললো, মোনালিসা খুব ভাল মেয়ে। ও গ্রামের মেয়ে, সহরের কলুষ এখনও ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। তুই কয়েকদিন ওর সঙ্গে মেলামেশা করলেই তুই নিজেই তা বুঝতে পারবি।

রাস্তার বিপরিৎ দিক থেকে হেডলাইটের তীব্র আলো জ্বালিয়ে একটা গাড়ী উল্কাবেগে ছুটে আসছিল। ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং এ একটা মোচড় দিয়ে গাড়ীটা প্রায় ফুটপাথের কাছে নিয়ে এসে ঐ গাড়ীটাকে যেতে দিল। তারপর গাড়ীকে পুনরায় রাস্তার মাঝখানে এনে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, এরপর প্রায়ই যেতাম মোনালিজার কাছে। কখনো তার বাড়ীতে, কখনো খামারে। এই ঘনিষ্ট মেলামেশার মধ্যেও ভাববিহ্বল কণ্ঠে মোনালিজার কাছে কোনদিন প্রেম নিবেদন করিনি। মোনালিজা ও কখনো তার বাকসংযমের বাঁধ ভাঙ্গেনি। কিন্তু তা সত্বেও মোনালিজার মনোভাব বোধকরি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার বন্ধুটিও বোধকরি আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। একদিন কথার কথায় ও জিজ্ঞেস করল, কিরে মোনালিজাকে তোর কেমন লাগে? পছন্দ হল?

আমি অবাক হওয়ার ভান করে জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে?

বন্ধু বললো, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তবে ওকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?

আমি বললাম, তুই একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস। একজনের মতামতে বিয়ে হয়না। ওর জন্যে দু'জনের সম্মতিরই প্রয়োজন হয়।

বন্ধু খানিকটা প্রত্যয়ের সুরে বললো, মোনালিজার মতামতের ভার তুই আমার উপর ছেড়েদে। তুই রাজী আছিস কিনা তাই বল।

আমি বললাম, আমি ত বেকার। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবো কি?

সেজন্যে তোর ভাবতে হবেনা। অরেঞ্জ সহরে ঐ যে বিরাট 'উইনারি'টা (আঙ্গুরজাত মদের কারখানা) রয়েছে ওখানে তোর জন্যে একটা ভাল কাজ জোগাড় করে ফেলেছি। ওখানে তোর যা রোজগার হবে তাতে তোদের সংসার ভালো ভাবেই চলে যাবে।

কিছুদিন পর মোনালিজার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। মোনালিজাকে নিয়ে অরেঞ্জে চলে এলাম। ভাল কোয়ার্টার পেলাম। মোনালিজা পারিপাটি করে ঘরদোর সাজিয়ে সংসার পেতে বসলো। মোনালিজাকে নিয়ে সুখসমুদ্রের কিনারায় বসে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা আনন্দের গান শুনতে শুনতে তিনটে মাস কেটে গেল। তারপর একদিন সেই গানের সুর আর শুনতে পেলামনা।

কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম রাত্রে বিছানায় শুয়ে মোনালিজা কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে। অস্থির ভাবে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। ঘুমটা যেন ওর ঠিকমত হয়না। সকালবেলা অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে ও কিছুই বলতে চায়না। অনেক পিড়াপিড়ি করার পর একদিন মোনালিজা আমাকে বললো, তুমি দুঃখ পাবে বলে কথাটা এতদিন তোমাকে বলতে চাইনি। তুমি যখন না শুনে ছাড়বেনা তখন শোন। শুনে আমার উপর রাগ করোনা যেন। তুমি রাতে যখন আমার কাছে শোও তখন তোমার গা থেকে একটা অস্বস্তিকর মদের গন্ধ বেরোয় যেটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনা।

আমি বললাম এমনটিত হবার কথা নয়। তুমি বেশ ভাল ভাবেই জানো যে আমি মদের কারখানায় কাজ করি বলে আমার কারখানার পোষাক আমি বাড়ী নিয়ে আসিনা, বাড়ী ফিরে রোজ সন্ধ্যায় আমি ভালো করে স্নান করি। গায়ে পিঠে সুগন্ধ ট্যালকাম পাউডার ছড়িয়ে দি। এর পর আমারে গায়েত কোন বিটকেল গন্ধ থাকা উচিত নয়।

মোনালিজা আমার কথাটা ঠিক মেনে নিলনা। সেদিন রাত্রে আমি একই বিছানায় শুলাম বটে কিন্তু দু'জনের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব রেখে। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। আমি কখন জানিনা ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম মোনালিজা ঘরে নেই, বাথরুম থেকে ওর বমি করার শব্দ শুনতে পেলাম।

বাথরুম থেকে শোবার ঘরে ফিরে আসতেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে মোনালিসা। বমি করলে কেন? বদহজম হয়েছে কি। কোন ওষুধ খাবে? বলত ওষুধ দি।

—কিছুই হয়নি বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল মোনালিসা।

সেদিন রাত্রে আমার আর ঘুম হলনা। একটা দুশ্চিন্তা আর বিরক্তি নিয়ে পরদিন ভোরে শয্যা ত্যাগ করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় মোনালিসাকে বললাম, আচ্ছা, মোনালিসা একটা কাজ করলে হয়না।

ও মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো, কি?

আমি বললাম, বিছানায় যাওয়ার আগে আমি যদি সারা গায়ে তোমার ঐ উগ্রগন্ধযুক্ত মেয়েলী সেণ্টটা মেখে নি।

মোনালিসা একটু ম্লান হাসি হেসে বললো, দেখতে পারো।

যে কথা সেই কাজ। শুতে যাবার আগে ওই বাদহানের সেণ্টটা বেশ করে বুকে পিঠে মালিশ করে নিলাম। আশ্চর্য ফল হল। অনেক দিন পর মোনালিসা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সেই থেকে রোজ মেয়েলী সেণ্ট মেখে বিছানায় যাই। দু'তিন মাস ভাল ভাবেই কাটলো। কিন্তু তারপর শুরু হল আমার রাত

জাগার পালা। পুরুষ হয়ে মেয়েদের সেন্ট মেখে কতদিন স্বস্তিতে থাকা যায়। ঐ সেন্টের গন্ধে তখন আমারই বমি হবার যোগাড়। এক নাগাড়ে কতদিন আর অনিদ্রায় থাকা যায়।

মোনালিজাকে বললাম, তোমার সেন্ট আর ত মাখতে পারছি না। রাত জেগে জেগে শরীরে ত আর কিছু নেই।

মোনালিজা আমার দুরবস্থার প্রতি কোন সহানুভূতি সূচক উক্তি না করে বললো, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আমি বোধহয় মা হতে চলেছি।

সানন্দে আত্মহারা হয়ে মোনালিজাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। হারিয়ে যাওয়া গানের সুরটা আবার যেন কানের ভেতর গুঞ্জন করে উঠলো।

সেদিন রাত্রে ঐ মেয়েলী সেন্টটা আর মাখলুম না। আনন্দের আতিশয্যে বিছানায় শুয়েই মোনালিজাকে জড়িয়ে ধরলাম। মোনালিজা আমার বাহুবেষ্টনে ধরা দিল বটে কিন্তু মিনিট খানেকও হয়নি একটা প্রবল বমির বেগ দমন করতে না পেরে বিছানার মধ্যেই বমি করে ফেললো।

আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। নিজেকে নিজের কাজে খুবই অপরাধী মনে হল।

পরদিন মোনালিসাকে বললাল, আজ থেকে আমি পাশের ঘরে শোব। আশা করি এ ব্যবস্থায় তোমার কোন আপত্তি হবে না।

যথা সময়ে আমাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মালো। সন্তান লাভে আমরা আনন্দে আত্মহারা। ছেলেটার যখন চার মাস তখন একদিন মোনালিসাকে বললাম, এবার তোমার ঘরে শুতে পারি কি? মোনালিসা হেসে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই পারো। কিন্তু তিন চার দিন পরেই মোনালিসার সেই পুরোনো উপসর্গগুলো আবার দেখা দিল।

ডাক্তারকে সব কথা বললাম,। তিনি আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করলেন। তারপর একান্তে আমাকে বললেন, আপনার স্ত্রীর এটি

মানসিক রোগ। আপনার মদের কারখানার কাজ ছাড়তে হবে।

অরেঞ্জ সহরে অন্য কোন ভাল কাজ জোটাতে পারলাম না। বাথহার্ষ্টের বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। বন্ধু আমাকে সপরিবারে সিডনী ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন।

মোনালিসাকে বললাম, এখানে কাজ করতে আর ভালো লাগছেনা। চল সিডনীতে ফিরে যাই।

মোনালিসা আমার এ প্রস্তাবের মর্মার্থ বুঝতে পারলনা। জিজ্ঞেস করলো, কেন, সিডনী কেন? এখানেই ত বেশ আছি।

আমি বললাম, মদের কারখানায় আর কাজ করবোনা। সিডনীতে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভালো কাজ পাওয়া যাবে। তুমি এ প্রস্তাবে আপত্তি করোনা।

সপরিবারে সিডনী চলে এলাম। আমার পুরোনো বীয়ার কারখানার সুপারভাইসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে বন্ধু? আবার কি মনে করে, এখানে কাজ করবে?

আমি বললাম. 'না, মদের কারখানায় আর নয়। আনুপূর্বিক সব ঘটনা তাকে জানিয়ে বললাম, আমাকে অন্য কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দিন।

সুপারভাইসার দু'দিন পর আমাকে দেখা করতে বললেন। তিন দিনের মাথায় তার সঙ্গে আবার দেখা হল।

তিনি বললেন, সিডনী মেলবোর্ণ 'সাদার্ণ অরোবা' এক্সপ্রেস ট্রেনে একজন কনডাকটর গার্ডের কাজ খালি আছে। যদি ঐ পদটি নিতে চাও ত বল আমি ষ্টেট রেলওয়ের জেনেরাল ম্যানেজারকে এখুনি টেলিফোন করে তোমার নাম বলে দেব।

কাজটা বেশ জুৎসই মনে হল। সুপারভাইসারের চেষ্টায় চাকরিটা পেয়েও গেলাম। মোনালিসাও খুশি হলো দুটি কারণে। এক, আমি মোটামুটি একটা ভাল কাজ পেয়েছি। দুই, রাত্রিতে বাড়ী থাকতে পার

বোনা। কারণ 'সাদার্ণ অরোরা' প্রতি রাত্রি ৯ টার সময় সিডনী ছেড়ে যায়। আর মেলবোর্ণ থেকে সিডনীগামী ঐ ট্রেনটি মেলবোর্ণ থেকে ঠিক রাত্রি ৯ টায় ছাড়ে

গতানুগতিক ভাবে সংসার চলে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমাদের একটি কন্যা সন্তান হল। যখন ছেলেটির বয়েস বছর ছয় আর মেয়েটির তিন তখন মোনালিসার মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। আমি প্রায়ই বাড়ীতে থাকছিনা। আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু জোসেফ সিডনীতে থাকে। আমারই অনুরোধে সে আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারের তত্ত্বাবধান করে।

একদিন বেলা দশটা নাগাদ মেলবোর্ণ থেকে বাড়ী এসেছি। 'সাদার্ণ অরোরা' ঠিক সকাল ৯ টায় সিডনী এসে পৌঁছয়। সে দিনটা ছিল রবিবার। ছেলের স্কুল ছুটি। ছেলের সঙ্গে বসে বসে নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করছিলাম। মেয়েটি আমাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল।

কথায় কথায় একসময় আমার ছেলে চার্লসকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, তোর জোসেফ আংকল আজকাল আমাদের বাড়ীতে আর আসেনা।

চার্লস বললো, আসেনা মানে? আংকল ত রোজ রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতেই ঘুমোয়।

ছেলের মুখে ঐ কথা শুনে মনের মধ্যে একটা গোখরো সাপ ফোঁস করে ফনা তুলে দাঁড়ালো।

ও নিয়ে ছেলেকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম না। কিন্তু স্থির করলাম জোসেফের উদ্দেশ্যটা ভালো করে জানতে হবে কোন কিছু করার আগে।

চার পাঁচ দিন পর ডিউটিতে যাবার নাম করে রাত আটটার সময় বাড়ী থেকে বেরুলাম। কিন্তু রেলষ্টেশনে না গিয়ে বাড়ীর কাছাকাছি একটা জায়গায় আত্মগোপন করে রইলাম। রাত্রি ৯ টার একটু পরে দেখতে পেলাম জোসেফ আমাদের বাড়ীর দিকে আসছে। রাস্তার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম জোসেফ আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করলো। রাত

প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত রাস্তায় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে আমাদের বাড়ীর মোনালিজার শোবার ঘরের পেছনের দিকে যে কাচের জানলাটা ছিল তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এলো। মোনালিজাকে জড়িয়ে ধরে জোসেফ অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলাম। নিঃশব্দে বাড়ীর বাইরে এসে একটা 'পাব' এ ঢুকে আকণ্ঠ মদ খেলাম।
নেশায় টলতে টলতে কোন রকমে রেল ষ্টেশনে গিয়ে মালগুদামের ভেতরে একটা বেঞ্চির উপর ঢলে পড়লাম। পরদিন খুব সকালে বাড়ী ফিরে এসে কলিং বেল টিপতেই মোনালিসা এসে দোর খুলে আমাকে দেখে যেন ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠলো।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে মোনালিসা সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, অসময়ে তুমি এখানে? কাল ডিউটিতে যাওনি। তোমার ত এ সময় ট্রেনে থাকার কথা।

আমি ওর কোন কথার উত্তর না দিয়ে সোজা মোনালিসার শোবার ঘরে চলে এলাম। এসে দেখলাম জোসেফ তখনো ঘুমুচ্ছে। গোখরো সাপটা এবার ছোবল হানবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। আমি ঘুমন্ত লোকটাকে টেনে তুলে জোসেফের মাথায় মারলাম প্রচণ্ড এক ঘুষি। আচমকা ঘুসি খেয়ে জোসেফ মেঝের উপর পরে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ও উঠে আমাকেও আক্রমণ করলো। দু'জনের মধ্যে কিল চড় ঘুসি লাথির বিনিময় চললো কিছুক্ষণ ধরে। কয়েক দিন আগে একটা টায়ার মেরামত করার জন্য ঐ ঘরে একটা লোহার হাঁতুড়ি এনে রেখেছিলাম সেলফের উপর। হঠাৎ হাঁতুড়িটা আমার চোখে পড়লো। বিদ্যুৎগতিতে সেই হাঁতুড়িটা টেনে এনে জোসেফের মাথ লক্ষ্য করে বজ্রাঘাত করলাম। একটা বিকট চিৎকার করে জোসেফ মেঝের উপর টলতে টলতে পড়ে গেল। আর উঠলো না।

মোনালিজা হা হা করে উঠলো। ছেলে আর মেয়ে আমার ঐ নৃশংস

আচরণ দেখে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

হাতুড়িটাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে সামনের ঘরে এসে বসলাম। সম্বিৎ ফিরে আসার পর আমি নিজেই পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ এসে লাশ স্থানান্তর করলো আর আমাকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেল।

আদালতে জজের সামনে আমি আমার অপরাধ কবুল করলাম। বিচারে আমার দশ বছর জেল হয়ে গেল।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সেই বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম সেখানে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ নেই। অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারলাম আমার এক দূর সম্পর্কের পিসীর বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা আছে।

পিসিবাড়ী গিয়ে ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের হাবভাব, পোষাক আসাক, কথাবার্তা বলার ধরন কোনটাই আমার ভালো লাগলোনা।

মনোভাব গোপন রেখে, পিসিকে বললাম, ওদের আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

পিসি বিমর্ষমুখে বললেন, তোমার জিনিষ তুমি নিয়ে যাবে সেত ভালো কথা।

পিসীকে জিজ্ঞেস করলাম, মোনালিসার কোনো খবর জানো? পিসিমা মাথা নেড়ে বললেন, না, জানিনা।

ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে একটা নতুন বাড়ীতে এলাম, মনে মনে এই সঙ্কল্প করলাম আজ থেকে এই ছেলে আর মেয়েকে মানুষ করা ছাড়া জীবনে আমার আর কোনো ব্রত নেই। দু'জনকেই ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। জীবিকার জন্যে বেছে নিলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারি।

তিনমাস পরে দুজনেরই স্কুল থেকে রিপোর্ট এলো আমার কাছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ লিখলেন, আপনার ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসে না। পড়াশোনায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমরা আপনার ছেলেমেয়েকে স্কুলে রেখে স্কুলের বদনাম ডেকে আনতে পারবো না। এদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

ছেলেমেয়ে বাড়ী ফিরে এলে তাদের স্কুলের রিপোর্টটা দেখালুম। এবং তাদের লেখাপড়ায় অমনোযোগীতা এবং স্কুলের শৃঙ্খলা অমান্য করার জন্য কৈফিয়ৎ চাইলাম।

অনেকবার বলা সত্বেও দু'জনে যখন চুপ করে রইলো তখন আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। কোমরের বেল্টটা খুলে দু'জনকেই আচ্ছা করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলাম।

তারা মার খেয়ে চুপ করে রইলো। কিন্তু দিনের পর দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

মাস ছয়েক পর খবর পেলাম ছেলে নেশাভাঙ করতে শুরু করেছে। অন্যান্য বকাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে "ড্রাগ ডেন"-এ নানা রকম উগ্র মাদক দ্রব্য সেবন করে নেশায় চুড় হয়ে পড়ে থাকে।

মেয়ে নেশাভাঙ্গ করে না। কিন্তু যা করে তা শুনে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হল। প্রতিসন্ধ্যায় সেজেগুজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। রাত্রি একটা দুটো পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় চরিত্রহীন মাতাল লম্পটদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে বাড়ী ফেরে।

বিপথগামী ছেলে আর মেয়েকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা করলুম। কিন্তু তাদের মাথায় এতটুকু সুবুদ্ধি ঢোকাতে পারলাম না। একে একে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। শেষে এমনি অবস্থা দাঁড়ালো যে আমার সন্তানদের উপর আমার বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আর রইলো না। এরা স্বেচ্ছাচারীতার চরমে গিয়ে পৌঁছুলো। একদিন দু'জনকে পাশে বসিয়ে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার ছেলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে এই কথা বলে উঠে গেল—"আই হ্যাভ নো টাইম টু লিসেন টু দি ডিলিরিয়াম অব এ মার্ডারার"।

মেয়ে বললো, "আই নো হোয়াট ইস গুড অর ব্যাড ফর মি। আই নীড নো কাউনসেল অব ইয়োরস্। ডোনট কাম ইন মাই ওয়ে। লেট মি লিভ মাই ওউন লাইফ"।

আমি আমার মেয়ের হাত ধরে বললাম, যে-পথে তুমি চলেছো,—

তা কল্যাণের পথ নয়। তা শান্তির পথ নয়। তোমার যৌবনের অপচয় তোমার যৌবনেরই অপমান। ওপথ ছেড়ে দিয়ে একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করে ঘর সংসারী হও। সুখে থাকো।

আমার শেষের কথা শুনে মেয়ে গর্জে উঠলো। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললো, কি বললে? বিয়ে? সুখ? তুমিও ত বিয়ে করেছিলে। সংসার করেছিলে। সুখ পেয়েছিলে? বল, সুখ পেয়েছিলে? তুমি নিজে যা পাওনি, যা পাওয়া যায় না তাই পাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছ আমাকে! আমার ভাবতে ঘেন্না হয় যে—মাই ফাদার ইস সাচ এ ফুল।

এই বলে আমার মেয়ে হনহন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

চরম কাণ্ডটা ঘটলো তার পরদিন রাত্রে। ডিউটি থেকে বাড়ী ফিরে এসেছি। সারাদিন গাড়ী চালিয়ে খুবই ক্লান্ত লাগছিল। নিজেই একটু কফি তৈরী করে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে কফি খাচ্ছিলাম। রাত তখন বোধকরি দশটা বেজে গেছে। আমার মেয়ে একটা লোফার চেহারার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলো। এসে দু'জনেই মেয়ের শোবার ঘরে চলে গেল। মেয়ের শোবার ঘর আমার শোবার ঘরের পাশে। দুই কামড়ার মাঝখানে একটা দরজা। দরজায় রেশমের একটা সচ্ছ পর্দা ঝুলছিল। পর্দার ভেতর দিয়ে ওর ঘরের ভেতরকার কিছু অংশ দেখা যায়। ঘরে ঢুকে ওরা ওদের ঘরের আলোটা না নিভিয়েই ইল্লুতে কাণ্ড শুরু করে দিল। তারপর আমাকে যেন দেখিয়ে দেখিয়ে দরজার সামনে এসে আমার মেয়ে তার ব্লাউজ স্কার্ট, সব খুলে ফেললো। তারপর প্যান্টিটা খুলে একটা লাথি মেরে প্যান্টিটাকে আমার ঘরে চালান করে দিল। বায়ুতাড়িত হয়ে প্যান্টিটা উড়তে উড়তে আমার খাটের সামনে এসে থেমে গেল।

আমার সকল ধৈর্য্যের বাঁধ সেই মুহূর্তেই ভেঙ্গে গেল। মনে ভাবলাম, না আর নয়, আর নয়। বিছানা ছেড়ে উঠে জামা কাপড় পরে সেই যে গৃহত্যাগ করলাম, আজ চার বছর আর ওমুখো হইনি।

বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ড্রাইভারের নিদারুন ঘটনার ইতিহাস শুনতে শুনতে লিথগো-সহরে পৌঁছে গেছি।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন? আমি বললাম, মাইকেল ষ্ট্রীটের রোটারী ক্লাবে।

মাইকেল ষ্ট্রীটে পড়তেই ড্রাইভার হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো কোথায় তোমার দেশ?

আমি বললাম, আন্দাজ করোত?

সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো তুমি বোধহয় পাকিস্থানি।

হেসে বললাম, তোমার আন্দাজটা পুরোপুরি ঠিক হল না। আমি ইণ্ডিয়ান।

ড্রাইভার আমাকে ভালো করে এক পলক দেখে নিয়ে বললো, তুমি ইণ্ডিয়ান! তা তুমি সিডনীতে কি কর?

বললাম, আমি ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি। ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করি।

আমার পরিচয় পেয়ে ড্রাইভারের মুখে যেন সামান্য একটু বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

সে বললো, ও তুমি তাহলে একজন ডিপ্লোম্যাট।

আমি বললাল, তা বলতে পা[illegible]

আমার মুখে আমার পেশার স[illegible] শুনে, ড্রাইভার ট্যাক্সিটা রাস্তার মাঝখান থেকে ফুটপাথের ধার ঘে[illegible]ড় করিয়ে আমার হাত দুখানা ওর দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরে অনুনয় ম[illegible]না গলায় বললো, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

আমি বললাম, কি করতে হবে বলো।

সে বললো, তোমার দেশে যাওয়ার জন্যে আমাকে একটা ভিসা দেবে?

আমি বললাম, তুমি কমনওয়েলথ দেশের নাগরিক। ভারতে যেতে

তোমার ভিসা লাগবে না। যেদিন ইচ্ছে যেতে পারো।

ড্রাইভার আমার হাত ছুটো ছেড়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বললো, না, না, আমি ট্যুরিস্ট ভিসার কথা বলছি না। আমাকে একটা ইমিগ্রেশন ভিসা দাও, যাতে করে আমি তোমাদের দেশে আজীবন থাকতে পারি।

নিজের দেশ ছেড়ে একটা সাদা চামড়ার লোকের পক্ষে চিরকাল ভারতে থাকার প্রস্তাবটা আমার কানে একটু অদ্ভুত শোনালো।

বললাম, আমার মনে হয় ব্যাঙ্কে তোমার অনেক টাকা আছে।

ম্লানহাসি হেসে ড্রাইভার বললো, টাকা! বিশ্বাস করুন, ব্যাঙ্কে আমার সিকি পয়সাও নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, তবে ভারতবর্ষে গিয়ে কি করবে? খাবে কি করে?

ড্রাইভার দৃঢ়কণ্ঠে বললে, কেন, এখন যেমন ট্যাক্সি চালিয়ে খাই, ভারতবর্ষে গিয়েও এমনি ট্যাক্সি চালাবো।

লোকটির অজ্ঞতায় আমার হাসি পেল। আমি বললাম, আমার দেশকে তুমি ভালো করে জানো না বলেই ভারতবাসের স্বপ্ন দেখছো। তুমি এখানে ট্যাক্সি চালিয়ে মাসে অন্ততঃ তিন-চার হাজার টাকা রোজগার কর। কিন্তু তুমি কি ভারতের একজন ট্যাক্সিচালকের মাসিক আয়ের খবর রাখো? তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যা পায় তাতে তাদের কোন রকমে দিন গুজরান করতে হয়। তাদের দারিদ্র একবার চোখে দেখলে তুমি শিউরে উঠবে। ভারতবর্ষে গিয়ে ট্যাক্সি চালাবার নামও করবে না।

ড্রাইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললো, কেন তাতে কি হয়েছে। তারা যেভাবে থাকে আমিও সেভাবে থাকবো। সারাদিন খাটুনির পর বাড়ী ফিরে এসে আমার স্ত্রী যদি আমাকে ছু' টুকরো রুটি আর এক বাটি ভেজিটেবল স্যুপ দেয় তাহলেই আমার যথেষ্ট। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। তাছাড়া গোটাদশেক স্লিপিং পিল খেয়ে ত আমার রাত্রে ঘুমোতে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি বললাম, স্ত্রী পাবে কোথায়?

সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, কেন, আমি ওখানে গিয়ে এক ভারতীয় রমণীকে বিয়ে করবো। আমার যে-ঘর ঝড়ে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে, সে-ঘর আবার নতুন করে বাঁধবো। আমার আবার ছেলে হবে মেয়ে হবে। তদের নিয়েই আমার বাকি জীবনটা সুখে কেটে যাবে।

আমি বললাম, পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে তুমি বিশেষ করে ভারতবর্ষে যেতে চাইছো কেন? স্ত্রী ত অন্য দেশেও পেতে পারো।

আমার প্রশ্ন শুনে ড্রাইভার কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল। তারপর বললো, আমি শুনেছি যে ভারতবর্ষ এখনো এমন একটি দেশ, যেখানে এই পৃথিবীর পঙ্কিল বাতাস নারীর সতীত্বের উজ্জ্বল ললাটে এখনো কলঙ্কের কালিমা লেপে দেয়নি। যেখানে স্ত্রী এখনো পতিব্রতা এবং আমৃত্যু স্বামীর অনুরাগিণী। আর যেখানে সন্তান এখনো পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের বৃদ্ধবয়সের বিশ্বস্ত অবলম্বন।

কারো স্বপ্ন ভাঙ্গার অধিকার আমার নেই। তাই নিঃশব্দে গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে রোটারী ক্লাবের দিকে পা বাড়ালাম।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আর একটি ছোট ঘটনা বলে এই অধ্যায় শেষ করবো।

আমি তখন বুয়েনোস আইরেস থেকে ঘানায় বদলী হয়েছি। বুয়েনাস আইরেস ত্যাগ করার সাতদিন আগে আমার বাড়িতে 'ফেয়ারওয়েল' ককটেল পার্টি হচ্ছে। পার্টিতে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সহকর্মিগণ যোগ দিয়েছেন, ক্যানাডিয়ান এ্যামবেসীর প্রথম সচিব ছিলেন, যাকে বলে তাস অন্তপ্রাণ। যে-কোন অছিলায় একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলেই তিনি তক্ষুণি তার সদ্ব্যবহার করতেন আমাদের ধরে বেঁধে তাসের টেবিলে নিয়ে গিয়ে। পানাহার আর গল্পগুজবে সান্ধ্য অনুষ্ঠান যখন জমজমাট সেই সময় ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোক আমাকে চুপি চুপি বললেন, শোন, অতিথি অভাগ্যতদের একটু তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার চেষ্টা কর।' আমি একটু বিস্মিত হয়ে

বললাম, 'কেন।' তিনি বললেন, 'কেন আবার কি? সাতদিন পর তুমি চলে যাচ্ছ, তুমি চলে যাওয়ার পর আমাদের তাসের টেবিল ত একদম কানা হয়ে যাবে। তাই ভাবছি তোমার অভ্যাগতরা চলে গেলে আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানেই বসে যাব।

ওর প্রস্তাবে একটু বিব্রত হলাম। কিন্তু মনোভাব গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কেউ খেলতে রাজি হয়েছে?'

ক্যানাডিয়ান প্রথম সচিব বললেন, 'ভালো বলেছ যা হোক। তুমি কি মনে কর, আমি পুরোপুরি তৈরী হয়েই তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছি। ডাচ এ্যামবেসীর কাউনসেলর, হা এ্যামবেসীর মিনিস্টার, ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্কের ইন ট বিভাগের ম্যানেজার, ফরেন অফিসের মিঃ লোপেজ আর যুগোশ্লাভিয়ার সেই পৌঢ় ভদ্রলোক, এরা সবাই রাজি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।

আমি বললাম, 'রাজি' তবে অতিথিরা না যাওয়া পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতে হবে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, তবেই হয়েছে। তোমার অতিথি সৎকারের যে বহর দেখছি তাতে করে এরা এই পানাহার ছেড়ে রাত বারোটার আগে তোমার বাড়ি ছাড়বে বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, তারা স্বইচ্ছায় না গেলে আমি ত আর জোর করে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।

তিনি বললেন, এই দেখ, আরে জোর করবে কেন, ডিপ্লোম্যাসী চালাও।

আমি বললাম, এর মধ্যে ডিপ্লোম্যাসির কি আছে?

তিনি বললেন, আছে। তুমি ড্রিংকস বন্ধ করে দাও। অতিথিরা আপনি সুর সুর করে চলে যাবে।'

যা হোক অতিথিরা বিদায় নেবার পর আমরা খেলতে বসলাম। রাত চারটে পর্যন্ত খেলা চলল। আমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন। আমার জিত সকলের উপরে। আর অনেক টাকা হেরে গেলেন সেই যুগোশ্লাভিয়ান

ভদ্রলোক। তিনি আমাকে বললেন, আজ আপনাকে টাকাটা দিতে পারলাম না বলে আমি খুবই দুঃখিত। তবে পরশু আপনার অফিসে গিয়ে আপনাকে টাকাটা দিয়ে আসবো।

আমি বললাম, আপনি ব্যাস্ত হবেন না। আপনার সুবিধে মত যা হয় করবেন।

ভদ্রলোক তার কথামত দুদিন পর আমার অফিসে এলেন। দেখলাম তার হাতে একটা প্যাকেট। তিনি সেই প্যাকেট খুলতে খুলতে বললেন দেখুন, আমি খুবই দুঃখিত যে নগদ টাকাটা সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই টাকার পরিবর্তে এই বস্তুটি আপনাকে দিতে এসেছি।

এই বলে সিল্কের উপর রূপোর কাজ করা বহুমূল্য একটি ষ্টোল আমার টেবিলের উপর মেলে ধরলেন। অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, টাকার পরিবর্তে এটি আপনি গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব।

ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তিনচার মিনিট আর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তারপর তাঁকে বললাম আপনার প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। তবে আমাকে মার্জনা করবেন, এ বস্তুটি আমি নিতে পারব না।

কেন?

আমি বললাম, দেখুন অর্থাগমের প্রেরণায় আমরা কেউ 'পোকার' খেলি না। খেলি চিত্তবিনোদনের জন্য। তবে খেলার হারজিৎ আছেই। সেদিন আমি জিতেছি। আর একদিন হয়ত আপনি জিতবেন। আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই আমাদের খেলা। পেশাদারী খেলোয়াড়দের সংস্পর্শে আমরা কেউ যাই না। সেদিনের আমার জিতের টাকাটা যদি আমার পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনের টাকা হত আমি তা থেকে একটি পয়সাও ছেড়ে দিতাম না। কিন্তু ও টাকাটা ত আমি উপার্জন করিনি। তবে আজ যদি আপনি আমাকে নগদ টাকা দিতেন, আমি নিতাম। কিন্তু টাকার বিনিময়ে আপনার স্ত্রীর এই বহুমূল্য অঙ্গবাস আমি কিছুতেই গ্রহণ করব না। আপনি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যান, আর আপনাকে আমি অকপটে

বলছি, আমার কাছে আপনার কোন ঋণ নেই। আপনি সব দায়মুক্ত।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হুঁ-হুঁ করে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন। তাকে শান্ত করতে আমার কয়েক মিনিট লেগে গেল। প্রকৃতিস্থ হবার পর ধরা গলায় তিনি বললেন, আপনার কাছ থেকে আজ যে ব্যবহার পেলাম তা একমাত্র একজন ইণ্ডিয়ানের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।

এই বলে তিনি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে বললাম, আর একটু বসুন।

তিনি পুনরায় আসন গ্রহণ করার পর তাঁকে বললাম, একটু কফি খাবেন।

তিনি বললেন, খেতে পারি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

বেয়ারাকে ডেকে দু'পেয়ালা কফি আনতে বললাম।

কফি এলো। পেয়ালায় [illegible] চুমুক দিয়ে বললাম, মিঃ ডিমিট্রভ, আপনাকে বসতে বললাম কেন [illegible]

তার কাছ থেকে কোন উত্তরের [illegible] করেই বললাম, আপনাকে বসতে বললাম আপনাকে একটা কথা বলবো বলে। আপনার আজকের এই আচরণ দেখে মনে হল আপনি যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া আর একটা ভারতবর্ষের প্রতীক।

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম তিনি আমার এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। একটা অর্থহীন দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আপনি হয়ত আমাদের দেশের এক অমূল্য রত্নসম্ভার-পূর্ণ মহাকাব্যের নাম শুনে থাকতে পারেন। এই মহাকাব্যের নাম মহাভারত। এই মহাকাব্যের নায়ক রাজা যুধিষ্টির শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতি-দের সঙ্গে জুয়া খেলে তাঁর সর্বস্ব খুইয়ে ছিলেন [illegible] স্ত্রীকে [illegible] তিনি হেরে যাওয়ার পর তাঁর জ্ঞাতিবর্গ তাঁর স্ত্রীকে [illegible] টেনে এনে স্ত্রীজাতীর যা চরম অপমান তাই করেছিল। যুধিষ্ঠিরের মহা-

বলশালী যুদ্ধনিপুণ আরো চারভাই ছিল। কিন্তু বড় ভাই-এর সত্য রক্ষার জন্যে তাঁরা স্ত্রীর এই লাঞ্ছনায় প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেনি। পণের শর্ত অনুসারে পাঁচ ভাই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তের বছর বনবাস করে অশেষ দুঃখ ভোগ করেছিল। কিন্তু তবুও সেই দ্যূতক্রিয়ার সত্য ভঙ্গ করেনি তারা। আমাদের অপর একখানা কালজয়ী মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর নায়ক যুবরাজ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দবছর বনবাসের ক্লেশের বোঝা হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের আর একজন রাজা শিবি তার রাজধর্ম পালনের জন্যে নিজের গায়ের মাংস কেটে এক ক্ষুধার্ত পক্ষীকে দান করেছিলেন।

মিষ্টার ডিমিট্রভ, আজকে আপনার এই আচরণ তাদের ত্যাগের গভীরতার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও আপনিও তাদের মতই অঙ্গীকার পালন করেছেন, আপনার সত্যনিষ্ঠাকে মহিমান্বিত করেছেন। তাই অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া আমার সেই অদৃশ্য ভারতকে আজ যেন আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

মিষ্টার ডিমিট্রভ আমার কথায় তাৎপর্য্য বুঝলো কি বুঝলো না তা বুঝতে পারলামনা। কৃতজ্ঞতার আবেগে ছলছল চোখে তিনি বিদায় নিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিল্লী থেকে লাতিন আমেরিকার দক্ষিণাপথের সর্বশেষ দেশ সুদূর আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়োনাস আইরেসে সবেমাত্র এসে পৌঁচেছি।

'প্রোটোকল' রীতি অনুযায়ী আর্জেনটিনার ফরেন অফিসে গিয়েছি ঐ অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হতে।

ফরেন সেক্রেটারি স্প্যানীশ ভাষায় আমাকে বললেন, "বিয়েন ভেনিদো এন মুয়েস্ত্রা পাইজ"। অর্থাৎ আমাদের দেশে তোমাকে স্বাগত

জানাচ্ছি। তারপর তিনি বললেন, দিল্লী থেকে ত বুয়েনোস আইরেস অনেক দূর। এই দীর্ঘদিন লম্বা সফরের পর তুমি নিশ্চয়ই একটু ক্লান্তি বোধ করছো।

একটু হেসে আমি বললাম, আমার সফর ত এখনো শুরু হয়নি। এবার হবে।

আমার বাক্য ব্যঞ্জনা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনাদের এমন সুন্দর দেশটিকে আমি ত নিশ্চয়ই ঘুরে ফিরে দেখবো। কিন্তু আমার সত্যিকার সফর হবে আপনার দেশের মানুষের মনোরাজ্যে। যাকে প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক জক মার্শাল বলেছেন, "জার্নি এ্যামং মেন"।

ফরেন সেক্রেটারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের দূতাবাসে ফিরে আসবার পথে নিজের মনে বললাম, ভিন্ন দেশের মানুষের মনোরাজ্যে এই যে সফর, এ কেবল আমার একলার সফর নয়। প্রকৃত-পক্ষে এ আমার মত কয়েকশ, ভারতের কূটনীতিকের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমারই মাতৃভূমি সেই ভারতবর্ষেরই সফর।

একজন কূটনীতিকের দেশ দেখার দৃষ্টিভঙ্গী একজন পর্য্যটকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ যেন অনেকটা জুলিয়াস সীজারের উক্তির মতো—"আই কেম, আই স এ্যাণ্ড আই কংকারড"।

আমিও ত নতুন দেশেই এলাম! দেশটাকেও অনেকদিন ধরে দেখলাম। কিন্তু এ দেশের নরনারীর চিত্তজয় করতে পেরেছিলাম কি? এদের মনে ভারতচিন্তার বীজ বুনে যেতে পেরেছিলাম কি?

বুয়েনোস আইরেস প্রদেশের রাজধানী লা প্লাতা সহরে বিশ্ববিশ্রুত যাদুঘর—দি মিউজিসিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি—দেখতে গিয়েও বারবার ঐ চিন্তা আমাকে পীড়া দিয়েছে।

যাদুঘরের প্রবেশ পথের দুইপাশে হাজার হাজার বছর পূর্বে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত সেবার-টুথ সিংহের বাদামী মার্বেল পাথরের বিশাল

প্রতিমূর্তি দেখে মন কোন সুদূরে চলে গেছে। মিউজিয়ামের ভেতরে রয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম যুগের দানব সরীসৃপ ডাইনোসর আর ডিপ্লোডেকাসের ঝুলন্ত কঙ্কাল। এক একটি কঙ্কাল লম্বায় প্রায় বাহাত্তর ফুট। এদের পাশেই রয়েছে শানিত খড়গের মত উপরের মাড়ির দুপাশ থেকে বেরিয়ে আসা বিশাল দন্তবিশিষ্ট এই 'সেবার-টুথ' সিংহের কয়েকটি কঙ্কাল।

তারপর দেখলাম হাজার বছর আয়ু নিয়ে আসা অতিকায় কুর্মের পিঠের শক্ত খোলের জীর্ণাস্থি। আর দেখলাম লক্ষ লক্ষ বছরের কঠিন চাপের ফলে সৃষ্ট অর্দ্ধস্বচ্ছ পাথরের বুকে লতাপাতা আর ফুলের ফসিল। কয়েকটি পাতার ফসিল এমনিই পরিস্কার যে পাতার সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা-গুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখাচ্ছে। ওগুলো দেখে মনে হ'ল যেন অতীতের কোন এক অজ্ঞাতনামা শিল্পী তার শিল্প প্রতিভার অক্ষয় সাক্ষর রেখে গেছেন ভাবীকালের মানুষের মনে সৌন্দর্য্যবোধের বিস্ময় সৃস্টি করতে।

এরপর একদিন দেখেছি চিরতুষারে মগ্ন আর্জেনটিনার কৈলাশ পাটাগোনিয়া প্রদেশের চিরমৌন জনমানবহীন তুষার মণ্ডল। তারপর পাটাগোনিয়া পার হয়ে এলাম উস্যুয়াইয়া সহরে। উস্যুয়াইয়া 'তিয়েরা দেল ফুয়েগো' (বহ্নিময় অঞ্চল) অঞ্চলের একটি সহর। আর্জেনটিনার দক্ষিণের সর্বশেষ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। উস্যুয়াইয়ার পর আর স্থলভূমি নেই, তার পরেই রয়েছে কেপ হর্নের উত্তাল সমুদ্র আর কুমেরু অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা তুষার শীতল ঝড়ো হাওয়া। উস্যুয়াইয়ার আকাশে চলে দিনরাত বিরামবিহীন বিদ্যুৎবহ্নির চোখ ধাঁধানো ঝলক। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার অশনিপাতের শব্দ কানে আসে না। অশনি নিনাদ সেখানে শুনতে পাওয়া যায় না কারণ কুমেরুর চুম্বকশক্তির প্রবল আকর্ষণে মেঘমুক্ত বিদ্যুৎকে সেই চুম্বক শক্তির টেনে নিয়ে যায়।

এই লেখকই বোধ করি সেদিন পর্য্যন্ত প্রথম বঙ্গসন্তান যে উস্যুয়াইয়ার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ দেখেছিল।

তারপর আবার একদিন বেরিয়ে পড়েছি বহুখ্যাত 'লা পাম্পা'র চিরহরিৎ তৃণময় সমতল গোচারণ ভূমি দেখতে।

বুয়েনোস আইরেস প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আর রিত্তনেগ্রো প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রায় দু'হাজার বর্গমাইল জুড়ে এই সমতল তৃণভূমি। ডাইনে, বাঁয়ে, সম্মুখে, পশ্চাতে—যে দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত হোক শুধু অসীম অনন্ত এক সবুজের সমুদ্র। লা পাম্পার এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির বুক জুড়ে আছে ধান জাতীয় চিরহরিৎ এক তৃণমণ্ডল। শীতে গ্রীষ্মে খরায়, বাদলে এই তৃন সম্পদ অক্ষয় অমর হয়ে আবহমান কাল ধরে বেঁচে আছে। আর্জেন্টিনার সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তার গোধন। এই গোপালনের জন্যে চাই বিরাট গোচারণ ভূমি। এক একটি পালে দু'তিনশ করে গরু থাকে এবং এদের সামাল দেবার জন্যে পালের আগেপিছে দু'জন অশ্বারোহী রাখাল থাকে। স্প্যানীশ ভাষায় এই রাখালদের বলা হয় 'গাউচো'।

এই গাউচেদের জীবনযাত্রা উত্তর আমেরিকার 'কাউবয়' কিংবা ভারতবর্ষের রাখালদের থেকে অনেক ভিন্ন। উত্তর আমেরিকার কাউবয়রা সাহসী, ঘোর পরিশ্রমী, অত্যন্ত কলহপ্রিয়, উগ্রমেজাজী এবং অত্যাচারী। পান থেকে চুণ খসলেই নিজেদের মধ্যে অবাধ গোলাগুলি বিনিময়। বিগত শতবর্ষের মধ্যে উত্তর আমেরিকার সমাজ এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। কাউবয়দের জীবনেও সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে। এর ফলে তারা আজ অনেক সংযত, অনেক সহনশীল। কিন্তু তবুও তারা আজো সামান্য কারণেই ধৈর্য হারিয়ে অনেক অনর্থ বাধিয়ে বসে। অনেক শোচনীয় ঘটনা এক নিমেষেই ঘটিয়ে দেয়।

আমাদের দেশের রাখালদের প্রকৃতি কাউবয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভোর হলে গরুর পাল নিয়ে তারা মাঠে যায়। গরু ছেড়ে দিয়ে মাঠের মাঝে কিংবা গ্রামপ্রান্তে কোন বট বা অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে হয় খেলা করে নয়ত গল্পগুজব করে সময় কাটায়। এদের চরিত্রে কোথাও কোন

হিংস্রতা নেই, কোন রেষারেষি নেই। কাড়াকাড়ি করে জীবনকে ভোগ করার খ্যাপামি নেই। তার পরিবর্তে আছে গভীর মানসিক প্রশান্তি, আর মাঠঘাট তরুলতার সঙ্গে আত্মিক মিতালী। আর আছে সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ।

আজ ভারতের রাখাল বালক গরু চরাতে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে তার সঙ্গীদের চিত্ত বিনোদন করে কিনা জানি না। তবে সেই যে কোন অশ্রুতযুগে যমুনাপুলিনে আর বৃন্দাবনের বিজন বিপিনে বাঁশী বেজে উঠেছিল যার সুরলহরী আজো যেন আমরা প্রতিনিয়ত মনের মতস্থলে শুনতে পাই। স্বর্গের দেবতা রাখালের বেশে ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে বাঁশীর সুরে অমৃতলোকের যে-সঙ্গীত আমাদের শুনিয়ে গেলেন, আমাদের চিত্তের বেদীমূলে যেদিন থেকে তিনি প্রেমের বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন থেকে স্বর্গমর্ত্যের ব্যবধান চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

আবার গাউচোদের জীবনযাত্রায় শুনতে পাই অন্য একটি আবহ সঙ্গীত। তাদের হাতে বাঁশী নেই, কোমরের বেল্টে বাঁধা ঝোলানো পিস্তল নেই, তারা শান্ত, সমাহিত আর বিষাদময়। লা পাম্পার জনমানবহীন প্রান্তরে এদের যৌবনের স্বপ্নভরা নানা রঙের দিনগুলো ফুলের পাপড়ির মত একটি একটি করে ঝরে যায়। জীর্ণকুটিরে নিদ্রাহীন গাউচোর দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে লা পাম্পার অমানিশার বাতাস যখন হাহাকার করে উঠে, তখন সেই সঙ্গ পরশহারা বিভাবরী যেন প্রণয়িনীর বিরহব্যাকুল গাউচোব ললাটে, চিবুকে, গণ্ডে স্নিগ্ধ করুণ করস্পর্শ বুলিয়ে বলে উঠে—দীর্ঘশ্বাস ফেলো না। আমিও তোমার মত নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ। এসো আমরা একে অপরের সাথী হই। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে কেউ পারবে না।

যুগ যুগ ধরে রাখাল পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকসাহিত্যে এক বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। কবি কথাশিল্পী গল্পে গাথায় আর সঙ্গীতে রাখাল জীবনের বিভিন্ন 'মুড'কে প্রতিফলিত করেছেন।

আর্জেন্টিনার লোকসাহিত্যেও গাউচোরদের জীবন নিয়ে অনেক গান, অনেক ব্যালাডের সৃষ্টি হয়েছে। বিরহবিধুর গাউচো দয়িতার আকর্ষণে

সকল প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে ঘোর রাত্রির অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে প্রিয়ামিলনের আকুল আকাঙ্খায় ছুটে চলেছে। তার যতিহীন পদক্ষেপের মুহূর্তগুলোকে সঙ্গীতময় করতে আর্জেনটিনার কবি গেয়ে উঠলেন—

"ভই কামিনান্দো সিলভান্দো সিলভান্দো
এনতোনান্দো উনা কানসিয়ান, দে সোলেদাদ
বাকোলো জুভিয়া ট্রাঙ্কেলা সেরেনা
লা নচে মুই ত্রিসতে মুই ত্রিসতে
ই সিয়েনতো উনা টোরিবলে সেনসাসিয়ম
সেনতিমেনতাল।
ভই কামিনান্দো আসি সিলভানদো
উনা কানসিয়ন—
বাকালো জুভিয়া দেনট্রো দেমি কোরাসন।

কবিতাটির মর্মার্থ—আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক, এই ঘোর রজনীর ঝড় বাদলের মধ্যে ছুটে চলেছি। আমার পদক্ষেপ চঞ্চল, বাইরের বাতাস অশান্ত, কিন্তু আমার মনে এক গভীর প্রশান্তি কেননা প্রিয়া মিলনের আকাঙ্খায় আজ আমি সব কিছু উপেক্ষা করেছি। এখন বাতাস আর্দ্র, বনভূমি আর্দ্র, ধরনীর বুক আর্দ্র, আর মাথার উপরে ঐ আকাশ থেকে গলে পড়া বৃষ্টির মত আমার হৃদয়েও আজ বাদল নেমেছে, কিন্তু আমার যাত্রা অব্যাহত।

কিন্তু আমি কেপ হর্ণের উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গে, কিংবা পাটাগোনিয়ার তুষার ক্ষেত্রে অথবা লা পম্পার তৃনভূমিতে ভারত চিন্তার বীজ বুনবো কি করে। কোন পথে আমার "জার্নি এ্যামং মেন" শুরু হবে? আমার এই মানসিক সংকটকালে আমার কিন্তু একটিবারের জন্যেও মনে হলনা যে আমার আর্জেটিনা আসবার বছর আগে সেই দেশেরই এক মহিয়সী মহিলা আমার কাজটি সমাধান করে রেখেছেন। এই সর্বজন বিদিতা মহিলার নাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

বুয়েনোস আইরসে আসবার কিছুদিন পরেই আমার রাষ্ট্রদূতের মুখে মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম শুনেছিলাম। তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে স্পানীশ ভাষা শিখতে। একটু একটু স্প্যানীশ ভাষা বলতে পারি তখন। বুয়েনোস আইরেসের নানা সভা সমিতিতে মাঝে মাঝে যাই, সব থেকে বেশী যাতায়াত করি ইণ্ডো আর জেনটাইন কালচারাল সোসাই-টিতে। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অসভালদো ভানাসিনি ইংরেজী বলতে পারেন এবং এর স্ত্রী কিছুদিন দক্ষিণ ভারত থেকে ভারতনাট্যম শিখেছিলেন, তাই এদের দু'জনার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাতে খুব বেশী দেরি হলনা। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা বলে রাখি। আর্জেন্টিনার শিক্ষিত সমাজের প্রায় সকলেই কম বেশী ইংরেজী জানেন এবং বলতে পারেন। কিন্তু তারা মরে গেলেও নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বিদেশী-দের সঙ্গে কথা বলবেন না। তা সেই বিদেশী স্পানীশ ভাষা জানুন আর নাই জানুন। আমার বেলায়ও ঠিক ঐ ব্যাপার। যে সকল আর্জেনটাইন বন্ধুরা আমার খুবই প্রিয় ছিল তারা আমার সঙ্গে ইংরাজীতে দু' চারটে কথা বলতো যখন আমি তাদের সঙ্গে স্পানীশে কথা বলতে শুরু করলাম। যাই হোক, এই ভানাসিনি দম্পতীর মুখেও মাদাম ওকাম্পোর অশেষ প্রশংসা শুনেছিলাম।

মাদাম ওকাম্পোর নাম এবং খ্যাতির কথা বহুলোকের মুখে শুনেও আমার এই কাণ্ডজ্ঞান হলনা যে এই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো আর কেউ নন, ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিজয়া, যাঁর করকমলে তিনি তাঁর কাব্য জীবনের এক শ্রেষ্ঠ ফসল 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন।

একটা সামান্য ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়ে বিজয়া আর ভিক্টোরিয়া যে অভিন্না নারী তার পরিচয় পেলাম।

একদিন সন্ধ্যায় একটা ককটেল পার্টিতে গেছি। অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি সেই পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। হঠাৎ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নামটা আমার কানে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম দুই ভদ্রলোক আলাপ করছেন। আমি তাদের কাছে এসে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস

করলাম, আপনাদের মধ্যে একজন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন, আমার কৌতুহল ক্ষমা করবেন। বলবেন উনি কে ?

ঐ দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললেন, আপনি জানেন না ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কে ? তিনি হচ্ছেন ইণ্ডিয়ার রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের 'নম্ ডি প্লুম'। এই বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

আমার কাছে সব জিনিষটা আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠলো। তখুনি মনে মনে স্থির করে ফেললাম যতশীঘ্র সম্ভব মাদাম ওকাম্পার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

প্রথমেই শুনলাম তিনি এক প্রচণ্ড ধনীর কন্যা। বুয়েনোস আই-রেসের উপকণ্ঠে সান-ই-সিদ্রোর শহরতলীতে প্রাসাদোপম এক অট্টালিকায় তিনি বাস করেন। অভিজাত বংশ পরিচয় ছাড়াও তাঁর নিজের অধি-কারেই তিনি আর্জেনটিনার সর্বজন পরিচিতা মহিলা। এহেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্না এক বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা করতে একটু সংকোচ বোধ করছিলাম। তা ছাড়া তখন পর্যান্ত ভালো করে স্প্যানীশ বলতে পারি না। মাদাম ওকাম্পো তখন আর্জেনটিনার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন মাসিক পত্রিকা 'সুর'-এর সম্পাদনা করছেন। 'সুর' বা 'সুদ' কথাটির অর্থ দক্ষিনাপথ।

সে যাই হোক'যথাসময়ে সেই 'সুর' পত্রিকার অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। একটি মধ্যবয়সী মহিলা, বোধকরি মাদামের সেক্রেটারি হবেন, আমাকে সম্পাদকীয় অফিস ঘরের দোরগোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দেখতে পেলাম মাদাম ওকাম্পো মস্ত একটা টেবিলের ওধারে বসে আছেন। ইংরেজিতেই অভিবাদন করলাম, কারণ আমার নিশ্চিত ধারনা হল যে তিনি ইংরেজি না জেনে পারেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথ যতদূর জানি স্প্যানীশ জানতেন না তাই ইংরেজি ছাড়া এরা দু'জনে আর কোন ভাষায় তবে কথা বলতেন ?

তিনি প্রত্যাভিবাদন করে আমাকে একটা সোফায় বসতে বললেন, এবং চেয়ার ছেড়ে নিজেও একটা সোফায় বসলেন। তখন তার বয়েস

সত্তরেরর কাছাকাছি, কিন্তু সঠিক বয়স জানা না থাকলে মনে হবে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্নর মত। মুখে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য। নারীসুলভ কোমলতা না আছে মুখে না আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। ফ্রকের বদলে একটা ঝোলা প্যাণ্ট; আর ব্লাউজের বদলে একটা বাদামী রঙের জারকিন। তারপর এই পোষাকেই তাঁকে ঘরে বাইরে যত্রতত্র দেখতে পেতাম। সাধারণতঃ কোন পার্টিতে তিনি যেতেন না। দু'একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যখন যোগ দিতেন তখন অবিশ্যি ফ্রক পরেই যেতেন। গালে একগাদা রুজ মাখতেন। 'সল্ট এণ্ড পেপার', অর্থাৎ সাদা কাঁচায় মেশানো ঘাড় পর্য্যন্ত ঝুলে পড়া একরাশ অবাধ্য চুলকে বাগে আনতে আমাদের দেশে ইলিশ মাছ ধরা জালের মত বড় ফোকরের জালের টুপি পরতেন।

কথাবার্তা আমার বিশেষ বলতে হল না। তিনিই অনর্গল কথা বললেন, আমি বসে বসে শুনলাম। আমাদের কথাবার্তার শেষের দিকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নাকি এখানে একটি ট্যাগোর সোসাইটি স্থাপনের কথা ভাবছেন?

তিনি বলেছিলেন, ভাবছিত অনেকদিন থেকেই তবে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে কে জানে। এ সম্পর্কে বাংলা জানা কাউকে পেলে খুব ভালো হত।

বললাম, আমি বাঙালী।

আমাকে বাঙালী জেনে তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন, আপনি বাঙালী? আপনি ট্যাগোর পড়েছেন?

আমি বিনয় সহকারে বললাম, যে-বাঙালীর সামান্যতম অক্ষর পরিচয় আছে তিনিও দু'চারটে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন। শুধু তাই? এখনো আমাদের জীবন রবীন্দ্র ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন তাঁর অতি কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। 'আপনি'-টা 'তুমি'-তে নেমে এলো। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই 'তুমি' গিয়ে দাঁড়ালো 'তুই'-তে।

এরপর কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বক্তা আর আমি শ্রোতা।

১৯৬০ সালের মে মাসের একটি সন্ধ্যা। মাদাম ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তাঁর সান-ই-সিদ্রোর বাড়ীতে। কফি পানান্তে মাদাম নিঃশব্দে তাঁর পেয়ালাটা রেখে দিলেন টিপয়ের উপর। তারপর ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে শান্ত গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে কিপলিং সাহেবের সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী উক্তিটা তোর মনে আছে?

চট্ করে কিছুই মনে পড়লো না, তাই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কোন উক্তিটার কথা বলছেন?

তিনি বললেন, আরে ঐ যে পূব আর পশ্চিমের মধ্যে সতীনালা সম্পর্কের কথা।

এবার বুঝলাম, তিনি কি বলতে চাইছেন। গড়গড় করে বললাম, পূব আর পশ্চিমের মধ্যে নিত্যদ্বন্দ্ব, এদের কোনদিন মিলন হবে না।

কথাটা শেষ করেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিপলিং-এর এ উক্তিকে কি বিশ্বাস করেন? মাদাম একটু হেসে বললেন, এক সময় খুব বিশ্বাস করতাম, কিন্তু যেদিন থেকে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীকে জেনেছি, বুঝেছি সেদিন থেকে আর বিশ্বাস করিনে।

জিজ্ঞেস করলাম, পূব আর পশ্চিমের মিলন কি সত্যিই সম্ভব?

তিনি সোফায় একটু হেলান দিয়ে বললেন, সম্ভব মানে? রবীন্দ্রনাথ যে শুধু সেই মিলনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, তিনি মিলনও ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন। তুই পড়েছিস তাঁর গীতাঞ্জলী আর 'রিলিজিয়ন অব ম্যান'?

বললাম, পড়েছি ঠিকই তবে আপনার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই তাই কবিগুরুর রচনার কাব্যরস উপভোগ করেই আমি তৃপ্ত হয়েছি। আর আপনি—

আমার কথাটা শেষ করতে তিনি দিলেননা। আমার কথার মাঝখানেই তিনি বলে উঠলেন, একটা বদ্ধ জলায় হঠাৎ একদিন সাগরের একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে যদি আছড়ে পড়ে তবে সেই জলাটার কি হয় জানিস?

আমি বললাম কি আবার হবে, একটা আচমকা আলোড়নের সৃষ্টি হবে।

তিনি বললেন, ঠিক বলেছিস। রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমার ঠিক অমনি একটা আলোড়ন উঠেছিল যা আজ পর্যন্তও থামেনি।

আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে 'লাপ্লাতা' নদীর সীমাহীন চক্রবালরেখায় সন্ধানী দৃষ্টিপাত করে বললেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের যা কিছু দুঃখ যা কিছু আনন্দ, যা কিছু বন্ধন, আর সকলের শেষে চিরকাম্য যে মুক্তি তা তিনি তাঁর জীবনদেবতার চরণে উৎসর্গ করে শেষ পারানির কড়ি এই জীবনের মহাসঙ্গীতকে সম্বল কবে মহা অজানায় পাড়ি জমালেন, আমিও আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে এই কথাটা সত্যের পরম উপলব্ধি হিসেবেই বলতে পারি যে, আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাহচর্য আর তার বাণী আজ আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে দুঃখকে নৈরাশ্যের অন্ধকারের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তার মহত্বের রূপটা দিনের আলোয় এনে দেখতে পারি। আজ এটা আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে জীবনে সুখদুঃখের কোন বাঁধনই যেন খুব দৃঢ নয়। আমার অন্তরলোকে যেন দেখতে পাই আমার বিধাতা যেন কোন এক রহস্যময় অঙ্গুলি চালনা করে জটিল দুজ্ঞেয় জীবনজাল বুনে চলেছেন অতি নিবিষ্ট মনে। সেইসঙ্গে তাঁর মুখে যেন শুনতে পাই মৃদু কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত। সেই সুরলহরীতে যেন ভেসে যায় আমার সকল তুচ্ছতা, সকল অসম্পূর্ণতা, সকল লজ্জা, সকল ভয়। এর পর বাকি যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই বোধকরি চিরমুক্তি, চিরশান্তি। এরাইত সকল মানুষের শেষ আশ্রয়। এদের সবটা পাইনি। তবে মুক্তির আলো যেন দেখতে পাচ্ছি।

এই বলে মাদাম ওকাম্পো চুপ করলেন। আমি বললাম, কিপলিং সাহেবের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ওই মতবাদটা রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী খণ্ডন করেছেন কিনা তার বিচার আপনি করুন। আমি কিন্তু দু চোখ ভরে দেখে গেলাম, আর হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে গেলাম যে আপনিই কিপলিং-এর উক্তির অসারতা প্রমাণ করে দিলেন।

তিনি আমার কথা শুনে একটু হাসলেন মাত্র। কয়েকটা মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। মাদাম ওকাম্পোর প্রাসাদোপম সান-ই-সিদ্রোর বাড়ীটা যেন অকস্মাৎ গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বললেন, আমি রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর কাছে যে কত ঋণী তার হিসেব আমি কোনদিন মেলাতে পারবোনা। একজন পাশ্চাত্যের রমণীর কাছে, একজন দক্ষিণ-আমেরিকা বাসিনীর কাছে তারই অজ্ঞাতে এ যেন এক বিরাট গুপ্তধনের আবিস্কার। এই দুই মহা-মানব আমার কাছে—শুধু আমার কাছে কেন, বিশ্বের প্রতিটি নরনারীর কাছে এমন একটি অনুভবের দরজা খুলে দিলেন যা রুদ্ধ থাকলে আমরা চিরদিন সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতাম।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, সত্য বলতে আমি যা বুঝি তা হল, এই সীমার তুচ্ছতা অসীমের শূন্যতার মতই ছায়ামূর্তি মাত্র, এই ছায়ামূর্তি আমাজের দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায়। জীবনের পঙ্কিল পথে সে আমাদের ক্রমাগত ঠেলে দেয়। জগতে তাঁরাই নমস্য যাঁরা পঙ্কিলতা থেকে আমাদের পুরোপুরি টেনে তুলতে না পারলেও পরিচ্ছন্ন রাজপথের সন্ধান বলে দেন। রাজপথে এসে আমি দাঁড়িয়েছি কিনা জানিনা, কিন্তু পথের সন্ধান যে পেয়েছি তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই।

জীবন সম্পর্কে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর গভীর মর্মবাণী শুনলাম।

এর কিছুদিন পর ঐ সান-ই-সিদ্রোর বাড়ীতে তিনি আমাকে বলে-ছিলেন, অন্তর্ঘাতি সংগ্রামে পশ্চিমী জগৎ আজ ক্ষুব্ধ, ক্ষতবিক্ষত। পশ্চিমের ধনলক্ষ্মী, জ্ঞানলক্ষ্মী শুভবুদ্ধির অভাবে আজ লাঞ্ছিতা, অপ-মানিতা। এই লক্ষ্মীর বিগ্রহ আজ সন্দেহ আর সংশয়, অবিশ্বাস আর হৃদয়-হীনতার কারাগারে বন্দিনী হয়ে আছেন। তাঁকে সেই কারাগৃহ থেকে পুনরুদ্ধার করে জীবনের মঙ্গলময় পাদপীঠে তার পুনস্থাপন করতে হলে পশ্চিমকে ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে সেই মহামন্ত্র নিতে। সারা ভারতের বিদগ্ধ সমাজে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো আজ তাঁর মৃত্যুর পরেও একটি অতি প্রিয় নাম। তাঁর এই জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রীতিধন্যা

কিংবা মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী শিষ্যা বলেই নয়, তার আরো একটি বিশেষ কারণ হল যে তিনি ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

মাদাম ওকাম্পো আমাদের কাছে খুবই পরিচিত হলেও আমাদের অনেকেই তাঁকে চোখে দেখার সুযোগ পাননি, কারণ ভারতবর্ষে তিনি কোনদিনই আসেননি। যে শান্তিনিকেতনকে তিনি দান্তের স্বর্গরাজ্য থেকেও পবিত্র মনে করতেন সেই শান্তিনিকেতনকে তিনি চোখেও দেখেননি। এদিক থেকে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। তিনটি অবিস্মরণীয় বছর আমি তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত আমি তাঁকে বারবার দেখেছি নানা কর্মের মধ্য দিয়ে।

১৯৬১ সালের বসন্তের এক অপরাহ্নে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। দেখলাম ফুলের বাগানের এক কোণে একটা ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, কিরে খবরবার্তা না দিয়ে হঠাৎ চলে এলি যে বড় ?

আমি বললাম, খবর না দিয়ে কি রকম! আপনি ত জানতেন আমি আসবো।

তিনি বললেন, কি করে ?

আমি স্প্যানীশে বললাম, আপনি ত অন্তর্যামী। আমার যথাযথ আগমনবার্তা পূর্বাহ্নে আপনি যদি না জেনে থাকেন ত আপনার অন্তর্যামী নাম ঘুচে যাবে।

তিনি হেসে বললেন, এইত বেশ স্প্যানীশ শিখেছিস। তোর স্প্যানীশের মাষ্টার কে রে ?

আমি বললাম, আপনি।

একটা কাঠের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রায় আধঘণ্টা অনর্গল কথা বলার পর তিনি আমাকে বললেন, রবীন্দ্রনাথ আমার উপর যে অবিচার করেছিলেন তোর উপর আমি তার শোধ তুলে নেব।

আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম, রবীন্দ্রনাথ অবিচার করেছিলেন আপনার উপর !

তিনি বললেন, তা নয়ত কি ? রবীন্দ্রনাথ যখন বুয়েনোস আইরেসে ছিলেন তখন তিনি আমার কত কাছের মানুষ ছিলেন। অনেক কথা তখন তাকে বলতে ইচ্ছে হোত। কিন্তু কেন জানিনা কবির সামনে এসে দাঁড়ালেই একটা লজ্জা এসে আমাকে ঘিরে ধরতো। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুতনা। কবি হয়ত ভাবতেন বলবার মত কোন কথা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। হয়তো এও ভাবতেন যে ইংরেজিতে আমার তেমন দখল নেই। কিন্তু তিনি বোধহয় এটা বুঝলেন না যে ভাষার বাধা আমাকে মূক করেনি। আমাকে নির্বাক করেছিলেন কবি স্বয়ং। অথবা বলতে পারি তাঁর প্রতি আমার যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল, পাছে সামান্যতম প্রগলভতা আমার শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই ভয়ে আমি চুপ করে থাকতাম। আর্জেন্টিনা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার পথে জাহাজ থেকে তিনি আমাকে লিখেছিলেন বিজয়া, আমি যখন তোমার ওখানে ছিলুম তখন হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরকে ভালো করে জানবার একটা অপূর্ব সুযোগ হেলায় নষ্ট করে এলাম। জীবনের হালকা মুহূর্তগুলো অনেক সময় অসচ্ছতার একটা ধুলোর ঝড় তুলে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে আমি তাঁকে জেনেছিলাম; তাঁর সাহচর্যে তাঁকে এক নতুন আলোয় দেখবার সুযোগ পেলাম কিন্তু এই মূক রমণীকে বোধকরি তিনি দেখতে পেলেননা, অনুভূতি দিয়ে হয়ত কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেনন। তাঁর একটি গানে তিনি বলেছেন, "আমি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী", কিন্তু তিনি কি ঐ গানটির মধ্যদিয়ে এই নারীর হৃদয়ের অসীম আকুলতার সন্ধান পেয়েছিলেন ? তিনি তা না পারলেও আমার হৃদয় সাগর তিনি কানায় কানায় ভরে দিয়ে গেছেন। তিনি আমার মনের দর্পনে আমাকে না দেখতে পেলেও একথা আমি কখনই অস্বীকার করবো

না যে এই সুদূর দেশবাসিনীর কাছে দেশ কাল পাত্রের সকল বৈষম্য তিনি চিরকালের মত ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন।

তিনি হয়ত জানতেও পারলেন না যে সাগরের পরাপর থেকে যে সঙ্গীত তিনি আমাকে শুনিয়ে গেলেন, তার মুর্চ্ছনা আমাকে বারবার একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিল যে আমি চিরকালের জন্য আমার নিজ নিকেতনে ফিরে এলাম। আত্মার কাছে ফিরে আসাইতো জীবনের শুভ ব্রত উদ্‌যাপন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, কবির সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ১৯৩০ সালে প্যারিসে। এর পরেও তিনি ১১ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আর দেখা সাক্ষাৎ হল না, পত্রালাপ অবশ্য হয়েছিল ১৯৪০ সাল পর্যন্ত।

জিজ্ঞেস করলাম কবিগুরুর চিঠি পত্রতো আপনার অনেক আছে। তবে তার শতবর্ষপুর্তি উৎসবে ওর মধ্য থেকে দু'চারখানা চিঠি সংবাদপত্রে কিংবা আপনার 'সুর' পত্রিকায় কেন প্রকাশ করলেন না।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, চিঠির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলাবাহুল্য, তার এই উক্তি আমি বিশ্বাস করিনি। এ বিষয়ে আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে তাকে বললাম দু একখানা চিঠি পড়ে শোনাবেন? তিনি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে উপরে চলে আয়।

লাল রংয়ের বহুমূল্য গালিচা দিয়ে মোড়া মেহগিনি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তার পড়ার ঘরে এলাম। কয়েক হাজার বই স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে সুদৃশ্য আলমারিতে। আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে চন্দন কাঠের তৈরী একটা মনোরম ব্যক্স বার করলেন একটা আলমারী থেকে। বাক্সটা খুলে একটি পত্রগুচ্ছ নিয়ে আমার পাশের চেয়ারটায় বসলেন। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছি তিনি হৈ হৈ করে উঠলেন। এই করছিস কি? ওটা জ্বালাসনি, এঘরে ধুমপান চলবে না। লজ্জিত হয়ে মাপ চেয়ে নিয়ে সিগারেট কেসটি পকেটে রেখে দিলাম। এবার চিঠির

পাঁজা থেকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা চিঠি আমাকে পড়ে শোনালেন। একটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেখা, একটি শান্তিনিকেতন থেকে, একটি তেহেরান ও অপরটি লণ্ডন থেকে। সেই চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু আজ ভাল করে মনে না থাকলেও এইটুকু স্মরণ করতে পারি যে, বিভিন্ন সময়ে নতুন সৃষ্টির প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক অস্থিরতা বোধ করতেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই চিঠিগুলোর মধ্যে রয়েছে। আর ছিল অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি অপার্থিব প্রেমের সুর।

তাঁকে উত্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে বললাম, ওর মধ্য থেকে দু'-একখানা চিঠি আমাকে দিন না, কপি করে ওগুলো ফেরত দিয়ে যাবো।

আমার কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠির পাঁজাটি চন্দন কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলেন। বাক্সের ডালাটা বন্ধ করতে করতে বললেন, দেখ, যারা ভণ্ড তারা বলে যে তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এটি দিতে পারবো না। আমি ভণ্ড নই কাজেই তোর জন্য প্রাণতো নয়ই, এর একখানা চিঠিও দিতে পারবো না।

চিঠির আশা ছেড়ে দিয়ে তার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

কিছুদিন পর আবার সান-ই—সিদ্রোর বাড়ীতে মাদাম ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

একতলার বিরাট ড্রইংরুমের পেছনের খোলা বারান্দায় তিনি বসে ছিলেন। চারিদিকে বাগান। গোলাপে গোলাপে ছয়লাপ। আমাকে বসতে বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট দুয়েক পর ফিরে এসে বললেন তোর চায়ের কথা বলে এলাম।

বললাম কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন।

তিনি আমার কথার উত্তর দিলেন না। বললেন, জানিস, এমনি একটি শেষ বসন্তের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস আইরেসে এসেছিলেন। ওই যে আমার পাশের বাড়ীটা দেখছিস ওর নাম মিরালরিও। ওই বাড়ীটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন মাস ছিলেন। তার লিমা যাওয়ার কথা ছিল,

কিন্তু জাহাজে খুব অসুস্থ হওয়ায় তার পেরু ভ্রমণ বাতিল করতে হল। হোটেল থেকে আমি কবিকে নিয়ে এলাম এই মিরালরিওতে। এই বাড়ীতে বসে কবি তার পূরবীর ২৬টি কবিতা লেখেন।

বাড়ীটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘিরে আছে মিরালরিওকে। মিরালরিও কথাটির অর্থ স্রোতস্বিনীকে দেখ। একটি সুউচ্চ মালভূমির উপর বাড়ীটি অবস্থিত। এর সম্মুখে ও পশ্চাতে বিশাল প্রাঙ্গন। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা দিয়ে মোড়া এই প্রাঙ্গনটির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। মাঝে মাঝে মালঞ্চ এবং বহু বিচিত্র পুষ্পের বর্ণচ্ছটায় সমস্ত প্রাঙ্গনটিকে যেন মোহময় করে রেখেছে। প্রাঙ্গনের শেষে দাঁড়িয়ে আছে বয়োবৃদ্ধ ওক গাছ আর ঘন পাইনের বন। সমস্ত বাড়ীটিকে ঘিরে বিরাজ করছে যেন এক অখণ্ড শান্তি।

বাড়ী থেকে পা ফেললেই দেখতে পাওয়া যায় ওপারের তটরেখাহীন বিশাল নদী 'লা প্লাতা'।

মাদাম বললেন, কবির সুচিকিৎসা আর উত্তম পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করেছিলাম এখানে। সাতআট দিনের মধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে লিমা যাওয়া বাতিল করতে হল। মিরালরিওর দোতলার একটি ঘরে কবির থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। নিচের তলায় থাকতো পরিচারকের দল। আমি প্রথম ২৫-২৬ দিন প্রত্যহ কয়েক মিনিটের জন্য উপরে যেতাম এবং কবির কুশল প্রশ্ন করে চলে আসতাম। বিকালেও তাই করতাম। কিন্তু তখনই মিরালরিও ছেড়ে চলে যেতাম না, নিচের তলায় একটি ঘরে অনেকক্ষণ বসে থাকতাম। আমার নিচের ঘরে দীর্ঘ সময় থাকার কথা কি করে কবি যেন জানতে পেরেছিলেন। একদিন তিনি আমাকে হেসে হেসে বললেন, বিজয়া, তুমি নিচের ঘরে সারা দিনমান কেন অপেক্ষা কর তা আমি জানি। যমদূতটি যদি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে তবে আমার অসুস্থতার নজির দিয়ে নিচের থেকে যাতে তাকে বিদায় করতে পারো তারই জন্যে এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা।

আমি বলেছিলাম, মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন তার দূতকে ঠেকিয়ে রাখার তো কোন সার্থকতা নেই।

কবি মৃদু হেসে বললেন, তুমি এই দূতগুলোকে চেন না। এরা যে কি অনাসৃষ্টি বাঁধিয়ে তুলতে পারে তাও তুমি জান না।

মাদাম বলতে লাগলেন, পরদিন বিকালে মিরালরিওতে গিয়ে দেখলাম কবি একটা ডেক চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন, আর কিছু কাগজ ও কলম সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কাগজ কলম কেন? ডাক্তার না আপনাকে লেখাপড়ার কাজ একদম বন্ধ রাখতে বলেছেন। আশা করি আপনি তা ভুলে যাননি।

তিনি মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বিজয়া, ডাক্তারদের পরামর্শ খুবই ভালো। কিন্তু ওরা বড়ই দেহধর্মী। নূতন সৃষ্টির তাগিদ এদের মনে বিশেষ পৌঁছয় না। পুরানো সৃষ্টিকেই এরা ঔষধের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়।

আমি বুঝলাম কবির সঙ্গে তর্ক করা নিস্ফল। পরদিন গিয়ে দেখলাম ইতিমধ্যে ৪-৫টা কবিতা তিনি লিখে ফেলেছেন। এমনি করে পূরবীর ছাব্বিশটি কবিতা তিনি মিরালটিওতে থাকা কালীন লিখেছিলেন।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে মাদাম আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, বলতো 'পূরবী' শব্দের মানে কি?

এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হল। তবুও বললাম, 'পূরবী' শব্দটির কয়েকটি অর্থ আছে। ব্যাকরণে 'পূর্ব' বা 'পূরব' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে 'পূরবী'। আর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম রাগের নাম 'পূরবী'।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই রাগটির তাৎপর্য কি?

বললাম, আপনি তো জানেন ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ হ'ল বহু বিচিত্র রাগ রাগিনী। বিভিন্ন রাগ শ্রোতাদের মনে একটি বিশেষ আবেগ ও রসের সঞ্চার করে। দিন রাত্রির কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন একটি বিশেষ

রাগের মুর্চ্ছনা শ্রোতার মনে একটি বিশেষ 'মুড' বা ভাবাবেগের সঞ্চার করতে সাহায্য করে। 'পূরবী' সান্ধ্যকালীন রাগ। সন্ধ্যাকালটি আমাদের মনে একটি বিদায়ের সুর সূচিত করে। ধেনুর পাল গোচারণ ভূমি ত্যাগ করে গৃহে ফিরে আসে। বিহঙ্গ আপন আপন কুলায় ফিরে যায়। পাটনী খেয়া পারাপার বন্ধ করে। পূবের সূর্য পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। পূরবীর সুরে এই বিয়োগ ব্যাথাটিই শ্রোতার মনে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

মাদাম বললেন বুঝলাম, কিন্তু এই রাগিনীকে তবে 'পূরবী' না বলে পাশ্চিমী বললেই তো তার সার্থকতা বজায় থাকতো। আমি বুঝিনা তোরা এই বিশেষ রাগটির নাম পূরবী কেন দিয়েছিস ?

এই বলে তিনি একবার উঠে গেলেন এবং টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন, ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতো রবীন্দ্র নাথ প্রথম ছবি আঁকা কোথায় সুরু করলেন।

বললাম, জানি এই মিরালরিওতে।

মাদাম বললেন, তাহলে এও নিশ্চয় জানিস যে তিনি তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপির অসংখ্য পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন করতেন ছাপাখানায় পাঠাবার আগে। কিন্তু তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপিকে কেটে কুটে অসুন্দর করে তুলতেন না। কলমের ডগা দিয়ে নানা রকম অদ্ভূদ পাখ পাখালী বা কোন অতিকায় কাল্পনিক প্রাণীর মুখের রেখা ফুটিয়ে তুলতেন। মিরালরিওতে যখন তিনি কবিতা রচনা করতেন তখনও তার পাণ্ডুলিপিতে এ সব দেখেছি। আমি ঐ রেখাঙ্কনের মধ্যে তাব অঙ্কন শক্তির একটা বিরাট সম্ভাবনা আবিস্কার করেছিলাম। তখন কবিকে চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলাম। কবি আমার কথা চুপ করে শুনলেন, কোন কিছু তখন বললেন না।

কয়েক দিন পর কবি আমাকে বললেন, বিজয়া, তোমার উৎসাহে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব, তবে তুলি না ধরে কলম দিয়েই ছবি আঁকবো। যে-কলম দিয়ে কথার ছবি আঁকি সেই কলমে রেখা আর রং-এর কাব্য

লিখতে পারি কিনা তারই একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চাই।

তারপর মাদাম ওকাম্পো আমাকে বললেন যে এর তিন বৎসর পর প্যারিসে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিশ্ববন্দিত চিত্রকরগণ এবং চিত্রামোদী বহু বিশিষ্ঠ ব্যক্তি এই চিত্র প্রদর্শনী দেখেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

দেখতে দেখতে তুটি বছর কেটে গেল। এল ১৯৬১ সাল। কবিগুরুর জন্মশতবর্ষপুর্তি উৎসব। মাদাম ওকাম্পো আমাকে ডেকে পাঠালেন তার সান-ই-সিদ্রোর বাড়ীতে। তিনি বললেন, আর কয়েক মাস পরেই সারা বিশ্বে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ মর্য্যাদার সঙ্গে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করতে চাই। এই প্রসঙ্গে আমরা একটা জাতীয় কমিটি সংগঠন করেছি, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেণ্ট এই কমিটির জাতীয় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তোকে এই ব্যাপারে অনেক কাজ করতে হবে।

বললাম আমার সাধ্যমত আপনাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবো।

তিনি বললেন, আগামী সপ্তাহে তোকে নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যাবো। অনেকদিন থেকে চেষ্টা চরিত্র চালিয়েও আমাদের ফেডারেল সরকারের বিত্তমন্ত্রীর কাছ থেকে ষ্টেট গ্রাণ্ট আদায় করতে পারছিনা।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এত লোক থাকতে আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে নিয়ে প্রেসিডেণ্টের কাছে যাবেন?

তিনি বললেন, কারণ আছে। সে তুই বুঝবি না।

আমার রাষ্ট্রদূতের অনুমোদন নিয়ে মাদামের সঙ্গে গেলাম প্রেসিডেণ্ট ভবনে।

মাদাম প্রেসিডেণ্টকে বললেন, আপনার বিত্তমন্ত্রী টাকা পয়সা দিচ্ছে না। যদি এখনই টাকার বন্দোবস্ত করে না দেন তবে উৎসব বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রেসিডেণ্ট ফ্রণ্ডিসি লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, আপনি উদ্বিগ্ন হবেননা, ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলেই আপনার কাছে স্টেট গ্রাণ্টের চেক চলে যাবে।

প্রেসিডেণ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে নিয়ে তিনি উঠে পরলেন।

পথে আসতে আসতে বললেন, দেখলি টাকা কি করে আদায় করতে হয়।

বললাম, দেখলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখলাম এ-দেশের লোক যত না আপনাকে শ্রদ্ধা করে তার থেকে ভয় করে অনেক বেশী। এমনকি দেশের রাষ্ট্রপতি পর্য্যন্ত আপনার কাছে তটস্থ। কিন্তু এ দেশের ক'টা লোক আপনাকে সত্যিকার ভালবাসে সেই অঙ্কটাই মেলাতে পারছিনা।

গাড়ী থেকে রাস্তার দিকে মুখ করে তিনি বললেন, ভালোবাসার আবার অঙ্ক আছে নাকি যে তার যোগ-বিয়োগ মেলাবি। আমাকেও অনেকে ভালোবাসে তাদের খবর তুই রাখিস না। এই ধর যেমন তুই, তুই ত আমাকে কম ভালোবাসিস না।

বললাম, সেটা ত দায়ে পড়ে। বিদ্যেবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য আর মনীষা দিয়ে ত আপনার কাছে ঘেঁসতে পারতাম না, তাই ঐ সহজ রাস্তাটা বেছে নিয়েছি।

"তুই কি মনে করিস ওটা খুব সহজ রাস্তা" ?

সবিনয়ে বললাম, তা না হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার জন্যে ত বিদ্যেবুদ্ধির দরকার হয় না।

একটু সময় চুপ করে থেকে তিনি বললেন, একটু আগেই তুই সহজ রাস্তার কথা বলছিলি না? আমার 'লা নচে' (রাত্রি) উপন্যাসটা পড়ে দেখিস।

বললাম, নিশ্চয়ই পড়বো আপনার এই বিখ্যাত উপন্যাস। আপনি ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই উপন্যাসখানা লিখেছিলেন। রবি অস্ত যাওয়ার পরেই ত রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে।

আমার কথা শুনে তিনি ফোঁস করে উঠলেন। বললেন তুই একটা

আকাট মূর্খ। রবি কখনো অস্ত যায় না। সে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার তাড়িয়ে বেড়ায়। তবে মনের চোরা গলিতে লুকিয়ে থাকা সব অন্ধকারে ত রবির আলো পৌঁছয় না।

মনে হ'ল খুব একটা স্পর্শকাতর জায়গায় এসে পৌঁচেছি। আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, আপনি না আমাকে আপনার জমিদারির মহালবাড়ী চাপাদমালাল দেখতে নিয়ে যাবেন? যাবেন আগামী সপ্তাহে?

তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, যাবি চাপাদমালাল? তবে চল আগামী সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ি।

গাড়ীতে চাপাদমালাল যেতে যেতে একসময় মাদামকে জিজ্ঞাসা করলাম. যদি অভয় দেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করে তিনি আমাকে বললেন, তুইনা বলেছিলি তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস, এরি মধ্যে আবার ভয় করতে শুরু করলি।

আমিও ফস্ করে বললাম. আমরা আমাদের পিতামাতাকে ভালোবাসি বলে কি তাদের ভয় করিনে, আপনি ত আমার মায়ের মত।

আমার কথায় কঠিন মুখ একটু নমনীয় হ'ল। বললেন, তা কি বলবি বল।

বললাম, আপনার এ্যালবামে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোলা আপনার অনেকগুলো ছবি দেখেছি। কিন্তু সবগুলো ছবিতেই আপনি আপনার চোখদুটোকে কালী দিয়ে কলঙ্কিত করেছেন কেন?

প্রশ্নটা শেষ হতেই একটা ঢোক গিলে ফেললাম। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল।

তিনি তেমনি বাইরের দিকে মুখ রেখে বললেন, পোড়া চোখ দুটো কাউকে দেখাবোনা বলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার চোখ পুড়লো কিসে?

তিনি কপালের চুল মাথায় উপর ঠেলে দিয়ে বললেন, রবিরশ্মি লেগে।

চাপাদমালাল পৌছুলাম দুপুরের কিছু পরে। মাঠের মাঝখানে প্রায় অট্টালিকাসম একটি মনোহর বাড়ী। বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটি বেশ বড়। আসবাবের মধ্যে চামড়ার গদি মোড়া একখানা ইজিচেয়ার, একখানা সিঙ্গেল বেড খাট। তার উপরে পরিপাটি করে বিছানা পাতা রয়েছে। খাটের পাশেই একটি বড় টিপয়, টিপয়ের এক কোনে রবীন্দ্রনাথের একখানা রঙীন ফটো। দেয়াল ঘেঁসে মেহগিনি কাঠের একটা ওয়ারড্রোব, মেঝেয় কার্পেট পাতা।

মাদাম বললেন, রবীন্দ্রনাথ চাপাদমালালে আট দশ ছিলেন। এই ঘরে তিনি শুতেন। এই ঘরে বসেই তিনি 'পূরবী'র আরো আটদশটা কবিতা ইংরেজীতে তর্জমা করে তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন।

আমি তখন তন্ময় হয়ে রবীন্দ্রনাথের ফোটোর দিকে তাকিয়েছিলাম। সুদূর আর্জেন্টিনার একটি খামার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দেখতে পাবো এতটা প্রত্যাশা নিয়ে বোধ করি এ দেশে আসিনি। বাংলাদেশের অনেক নামজাদা রাজা মহারাজা কিংবা জমিদারের মহালের কাচারি বাড়ীর দেয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কিংবা সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছবি অনেক দেখেছি, কিন্তু সে-সব দেয়ালে সেক্সপীয়র কিংবা মিলটনের ছবি কখনো দেখেছি বলেত মনে পড়ে না।

পরের দিন চাপাদমালাল থেকে বুয়েনোস আইরেসে ফিরে এলাম।

হাজার অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য হল আর্জেন্টিনার-জাতীয় রঙ্গমঞ্চ সার্ভেনটিস্ থিয়েটারে কবিগুরুর 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়; বুয়েনাস আইরেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রনাথের উপর একটি সেমিনার; মিরালরিওর সংলগ্ন রাস্তাটির নতুন নামকরণ আভেনিদা তাগোরে (ট্যাগোর এভিনিউ) এবং আর্জেন্টাইন ডাক বিভাগের সেন্টিনারী স্মারক ডাকটিকিট-ও প্রথম দিনের খাম বিলিকরণ। এছাড়া একটি গ্রামোফোন কোম্পানির চারটি ভাষায় যথা বাংলা, ইংরেজী,

সপ্যানিশ ও ফরাসী ভাষায় 'গীতাঞ্জলীর' কয়েটি কবিতার আবৃত্তি সম্বলিত লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশ। বাংলা আবৃত্তি আমাকেই করতে হয়েছিল আর ফরাসী ভাষায় আবৃত্তি করেছিলেন মাদাম ওকাম্পো।

১৯৬১ সালের ৭ই মে তারিখটির স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভোর ৬টার সময় আমরা সকলে মিরালরিওর সংলগ্ন রাস্তাটির ওপর সমবেত হলাম। উপস্থিত জনতার সম্মুখে সান-ই-সিদ্রোর পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র রাস্তাটির নূতন নামকরণ করলেন-'আভেনিদা তাগোরে'। তিনি তার ভাষনে বলেছিলেন যে, পৃথিবীর এক মহাপুরুষের পদাঙ্কিত এই রাস্তাটি চিরদিনের জন্য তাঁর অমর স্মৃতি বহন করবে। সান-ই-সিদ্রো চিরকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে রইলো।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উৎসবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয়েছিল সার্ভেন্টস থিয়েটারে 'ডাকঘর' নাট্যানুষ্ঠান। অমলের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছিল তার অনবদ্য অভিনয় কোন দিন ভুলবো না। প্রায় ৬০টি কিশোরের মধ্য থেকে এই ছেলেটিকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেদিন প্রায় দুই হাজার শ্রোতা এই বালকের প্রাণঢালা অভিনয় দেখে 'সাধু', 'সাধু, ধ্বনি তুলেছিলেন। অভিনয়ের শেষে এই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি ভাই?

ছেলেটি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, অমল।

বুয়েনোস আইরেস সহর ছাড়াও আর্জেন্টিনার বিভিন্ন সহরে মর্য্যাদার সঙ্গে এই উৎসব উদযাপিত হয়েছিল! এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে এই সকল আনন্দোৎসবের প্রাণবিন্দু ছিলেন মাদাম ওকাম্পো, তাঁর চেষ্টা, অধ্যবসায় আর শ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এমনি মেলামেশা আর সদালাপের মধ্য দিয়ে আমার বুয়েনোস আইরেসের প্রবাস জীবন শেষ হল। বুয়েনোস আইরেস থেকে চলে আসার আগের দিনটিতে মাদাম ওকাম্পো আমার পরিবারের সকলকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। খাওয়ার টেবিলে বসে তিনি হাসিমুখে আমাকে বললেন, তোর মেয়ে মঞ্জুকে আমাকে দিয়ে যা।

এই নিঃসন্তান এবং দাম্পত্য সুখ বঞ্চিতা মহীয়সী নারীকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। আমি বললাম, তাই নাও আমরা তো তোমাকে কিছুই দিইনি, আমাদের কাছে তোমার প্রাপ্য অনেক।

তিনি বললেন, কিযে বলিস তার ঠিক নেই। সারা বিশ্বকে তোরা রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিস। সেই ঐশ্বর্য রাখার জায়গা আমাদের নেই।

বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা সেদিন মাদাম ওকাম্পোর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। বলেছিলাম যতদিন বাঁচবো তোমাকে ভুলবোনা।

আজ ১৭-১৮ বছর হল আর্জেন্টিনা ছেড়ে এসেছি। আর হয়ত কোন দিন সেখানে যাওয়া হবেনা। মাদাম ওকাম্পোর সঙ্গেও জীবনে আর দেখা হল না। দেখা হবেনা 'আভেনিদা তাগোরে'। দেখা হবেনা মিরালরিও, দেখা হবে না বসন্ত বাতাসে উদ্বেলিত নদী 'লা প্লাতা'। তবুও মানসচক্ষে আজো যেন দেখতে পাই একটি অশীতিপর বৃদ্ধা বর্ষার একটি ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতে, কিংবা শীতের কোন একটি রৌদ্র করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে অথবা গ্রীষ্মের ধূসর সায়াহ্নে 'আভেনিদা তাগোরের' উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে হেটে চলেছেন। ফটকের দরজা খুলে মিরালরিওর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করছেন। তার ক্ষীণ দৃষ্টি—বাড়ীটির দোতলায় একটি বিশিষ্টকক্ষের প্রতি নিবদ্ধ, যেখান থেকে অশ্রুত কণ্ঠে একটি গান 'লা প্লাতা'র শ্রোতের মত অবিরাম ভেসে চলেছে—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধু পারে
ওগো বিদেশিনী।
আমি আকাশে পাতিয়া কান
আমি শুনেছি তোমারি গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ,
ওগো বিদেশিনী।

ক্যানবেরা থেকে বদলী হয়ে তখন আমি আমাদের সিডনী অফিসে কাজ করছি। অস্ট্রেলিয়ানদের মতে গাঁ থেকে সহরে এসেছি। সিডনী বিরাট পরিচ্ছন্ন সহর। প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোকের বাস।

অফিসে কাজ করছি। কোলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে মাষ্টার সার্জারী পাশ করা ডাক্তার প্রনবেশ মুখার্জি ঘরে ঢুকেই বললো, এই অষ্ট্রেলিয়াটা কি রকম লাকি কানট্রি একবার ভাবুন ত !

আমি বললাম, আমি কিন্তু দেখছি এই দেশ থেকে আপনি ঢের ঢের বেশী লাকি।

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে স্যার আশুতোষ ষ্টাইলের অধরোষ্ঠ ঢাকা গোঁফের ডগার চুলগুলোকে ডান হাতের তালু দিয়ে উঁচিয়ে ধরে বললো কি রকম !

আমি বললাম, রকম আবার কি। কলম্বো প্ল্যান স্কলারশিপ নিয়ে ইয়োরলজিতে ডক্টরেট করতে এখানে এসেছেন। গৌরীসেনের টাকায় ভালো হোটেলে তোফা আছেন। হাসপাতাল আর রিসার্চ লেবরেটরির হাজিরা খাতায় নাম সই করে বেমালুম সটকে পড়ছেন। ইউরোলজি ছেড়ে এই দেশ নিয়ে আমার অফিসে এসে রিসার্চ করছেন। তারপর রোজ দুপুরে এক এক খানা পাঁচ বাই তিন ইঞ্চি থান 'ইট' (ইটে সাইজের আইসক্রিম) মিষ্টিরসে টইটম্বুর কুইনসল্যাণ্ডের 'হানিডিউ' তরমুজের অনুপান সহযোগে সাঁটছেন। এই আট দশ মাসে ক'হাজার থান ইট আপনার পেটে গেছে আমার অফিসে গণকযন্ত্র থাকলে তার নির্ভুল পরিসংখ্যান আপনাকে বলে দিতে পারতাম। এর উপর আবার 'হামবুর্গার' 'ফ্রাংকফুর্টার' 'হট্‌ডগ' আর 'কোল্ড ফ্যাট' ত আছেই। তারপর এই অধমের গৃহে প্রায় প্রতিরাত্রেই হয় 'মারে নদীর 'গোল্ডেন কার্প', নয় ডার্লিং নদীর 'ব্লক স্যামন' নয়ত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার লম্বা গলদা চিংড়ি দিয়ে উত্তম মধ্যম ভোজন ত আছেই। বলি এই লাকি কানট্রিতে না এলে আপনার মত কলির বৃকোদরকে সামলাত কে ?

আমার বাক্যবানে ডাক্তারের আশুতোষী গোঁফ আবার ঝুলে পড়লো।

বানটা বেমালুম হজম করে ডাক্তার বললো, তা কি করি বলুন। ঐ লুঙ্গিআক্রার থান ইটের মত এক একটা আইসক্রীম মাত্র তিনটাকায় ছুনিয়ার আর কোথাও কি খেতে পারবো? আর ঐ 'হানিডিউ' মেলন। এখানে আসবার আগে ঐ রসাল ফলটি কখনো কি চোখে দেখেছি।

এরপর ডাক্তার তার শিরদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসে আমাকে বললেন, তা ঐ কোল্ড ক্যাটের কথা বললেন কেন? ওটাত আমি খাইনে।

আমি বললাম, ওটা যে আপনি খান না তা আমি জানি। ঐ নামে কোন ভোগ্য পদার্থ থাকলে আপনি এতদিনে অস্ট্রেলিয়ার মার্জার বংশ নিশ্চিহ্ন করে দিতেন। আসলে আপনি নিজেই একটি কোল্ড ক্যাট কিংবা ওয়েট ক্যাট হয়ে বসে আছেন।

ডাক্তার আমার কথায় গা করলেন না। চেয়ারটাকে আর একটু টেবিলঘেসা করে বললেন, যেতে দিন ওসব কথা। যে জন্যে ছুটে এলাম তাই শুনুন।

বললাম, কি ব্যাপার?

ডাক্তার মিহিস্বুরে বললো, চলুন না, একটিবার এ্যাডিলেড ঘুরে আসি। বেশ লম্বা সফর হবে, আর সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়া-অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টম্যাচটাও দেখা হবে।

একটু ভেবে বললাম, তা যাওয়া যেতে পারে। এ্যাডিলেডে আমার একটা ট্যুর অনেকদিন থেকে পেণ্ডিং হয়ে আছে। তা কিসে যাবেন? ট্রেনে না এরোপ্লেনে?

ডাক্তার বললেন, না ওসব নয়। আপনার গাড়ীতেই চলুন না। দেশটা দেখতে দেখতে বেশ যাওয়া যাবে।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, সিডনী থেকে এ্যাডিলেডের দূরত্ব জানেন! পাক্কা বারোশ' মাইল। যেতে আসতে ছ'দিনের ব্যাপার। একার পক্ষে এতবড় লং ড্রাইভ খুবই ক্লান্তিকর হবে।

ডাক্তার নাছোড়বান্দা। বুঝলাম পথে যেতে যেতে আরো

কয়েক শ' থান 'ইট' খাওয়ার মতলব। অগত্যা রাজী হলুম। দুদিন পর আমি আর ডাক্তার দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম রাত্রি মিল-জুরার একটা হোটেলে বাস করতে হল। রাত প্রায় আটটায় মিলজুরা পৌঁছুলাম। ছোট সহর কিন্তু রাস্তার আলোয় সমস্ত সহরটা ঝলমল করছে। সহরের শেষপ্রান্তে হোটেল। নৈশাহার সমাধা করে দু'জনে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙ্গলো সকাল সাতটায়। চোখমেলে চেয়ে দেখি ডাক্তার তার বিছানায় বসে কি যেন চিবুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে জানালার বাইরে হাত গলিয়ে কি একটা বস্তু সংগ্রহ করে মুখে পুরে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই সাতসকালে কি খাচ্ছেন মশায়। ডাক্তার দেঁতো হাসি হেসে বললো, কিছুনা, ঐ দু'একটা আঙ্গুর খাচ্ছি। জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই পাড়া যাচ্ছে কিনা তাই কয়েকটা গালে পুরে দিচ্ছি।

ডাক্তারের কথা কেমন গোলমেলে মনে হল। আঙ্গুর মনে করে কোন বিষফলটল খাচ্ছেনা তো? বিছানা ছেড়ে ডাক্তারের খাট সংলগ্ন জানালাটার বাইরে তাকিয়ে দেখি জানালা পর্য্যন্ত আঙ্গুরের ঝোপ এসে ঠেকেছে। আর ঐ ঝোপগুলোতে স্তবকে স্তবকে সমগ্র আঙ্গুর ঝুলছে। আর একটু দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত আঙ্গুরের ক্ষেত। সাদা কালো অজস্র আঙ্গুরগুচ্ছ ঝুলে আছে।

ডাক্তারের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই সে হাসি মুখে বললো, দুটো 'বানচ্ছ' ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছি। তিন নম্বরটায় এই সবে হাত দিয়েছি।

উদ্বেগ প্রকাশ করে বললুম, করেছেন কি; এরি মধ্যে অতগুলো আঙ্গুর সাবার করেছেন। বিদেশে বিভূঁয়ে অসুখ করলে আপনাকে দেখবে কে?

ডাক্তার নির্বিকার গলায় বললো, কিছু হবেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ডাক্তারকে খোঁচা মারার উদ্দেশ্যে বললাম, কিছু না হয় নাই হ'ল। পরের জিনিষ না বলে কয়ে কি আক্কেলে আপনি ওগুলো খেলেন।

গোফারণ্য থেকে অধরোষ্ঠকে হাতের তালু দিয়ে মুক্ত করে মুখে একটা পরম আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটিয়ে তুলে ডাক্তার বললো, না বলে কয়ে কি রকম ? আপনি ত তখন ঘুমুচ্ছিলেন। আমি ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে হোটেলের বাইরে এসে দেখি চারটে লোক মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার উপর বসে আছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। আচ্ছা বলুনত চার চারটা লোককে ঐ সাতসকালে ঐ অবস্থায় রাস্তায় বসে থাকতে দেখলে আপনার কি মনে হবে ?

আমি বললাম, মুত্রাশয়ের প্রদাহ হতে পারে।

ডাক্তার ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, না, না, ওসব কিছু নয়। সাহস করে একজনকে কারণ জিজ্ঞসা করতেই সে জুয়ারীর সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে ফেরার মত মুখ করে বললো, প্রায় এক'শো সাতাত্তর একর জমির আঙ্গুর পেকে মাটিতে ঝরে পরার অবস্থা। আজকের মধ্যে আঙ্গুর কাটতে না পারলে কাল সব আঙ্গুর মাটিতে পরে কাদা হয়ে যাবে। অথচ কাটিয়েরা এখনো এসে পৌঁছয়নি। গতকাল রাত্রেই তাদের এখানে আসার কথা। আজ ওরা না এলে কাল আমরা লাটে উঠবো। আমি একটা সহানুভূতি সূচক শব্দ করে বললাম, তাইত এ যে দেখছি আপনাদের বড় মুস্কিল হল। তারপরই গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, মোটেলের চার পাশেও দেখলাম অনেক আঙ্গুর ঝুলছে। বলেন ত আমি আর আমার বন্ধু ওগুলো কেটে দিয়ে যাই। আমার কথা শুনে ওদের মধ্যে একজন বললে, আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ওতে আর কতটুকু সাহায্য হবে ? তারচেয়ে আপনারা যা পারেন খেয়ে নিন। ওদের গ্রীন সিগনাল পেয়ে আমি তিনলাফে ঘরে ফিরে এলাম। তারপর ....

বাধাদিয়ে বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার উঠুন ত। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। গাড়ী চালাতে চালাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিকেল চারটে।

আমরা তখন 'মারে' নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ইতিপূর্বে 'মোরামবিজি' আর 'লখলন্' নদী পার হয়ে এসেছি। নদী না ছাই। হাত পঞ্চাশেক চওড়া শুকনো খটখটে দুটো খাল। 'মারে' ওদের তুলনায় অনেক বড়। জলও আছে। যেতে যেতে হঠাৎ একটা মধুগন্ধ নাকে এলো। ডাক্তার কুকুরের মত কান খাড়া করে হাওয়ায় ভেসে আসা গন্ধটা শুকতে লাগলো। তারপর কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, পাচ্ছেন গন্ধটা ?

আমি বললাম, পাচ্ছি। বুঝলাম ভালুক মহুয়া ফুলের গন্ধ পেয়েছে।

আমার দিকে একটু সরে এসে ডাক্তার অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললো, ডাইনে বাঁয়ে একটু চোখ রেখে চালান, কাছে পিঠে কোথাও মধুর কারখানা নিশ্চয়ই আছে।

আমি বিরক্তির ভান করে বললাল, থাকলেই বা কি ? গাড়ী থেকে নেমে মধু খেতে বসবেন নাকি ? ডাক্তার আমতা আমতা করে বললো, ঠিক তা নয়, এই এমনিই একটু চেখে দেখতাম আর কি। দশযোজন দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে বস্তুটি রসনা দিয়ে—

বাধা দিয়ে বললাম, আপনার চাখা মানে ত এক কলসী মধু সাবাড় করা। তবে সে গুড়ে বালি। আচ্ছা, লাগামহীন ভাবে খেয়ে খেয়ে আপনার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কখনো শুনেছেন যে মধু কারখানায় তৈরী হয়। এ দেশের মৌমাছিগুলো কি মধু আহরণের সহজাত বৃত্তি ভুলে গেছে ?

ডাক্তার হতাশ গলায় বললো, তা হলে ঐ গন্ধটা ? আমি বললাম, কাছেই কোন মদ তৈরীর কারখানা আছে, রস নিংড়ে আঙ্গুলের ছিবড়ে গুলো বাইরে ফেলে রাখা হয়। সেগুলো শুকিয়ে গেলে তা থেকে মধু গন্ধ বেরোয়।

আশু মধু পানের আশা বিলুপ্ত হওয়ায় ডাক্তার তার নিজের যায়গায় গিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

কয়েক মিনিট পর দূরে কিসের যেন বড় বড় কয়েকটা স্তূপ দেখতে

পেলাম। কাছে আসতেই দেখলাম, খেত থেকে সদ্য কেটে আনা পনের ষোল ফুট উঁচু আঙ্গুরের স্তুপ। গোটা কয়েক ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দশ বারো জন মজুর বেলচা দিয়ে আঙ্গুর তুলে ট্রাকের ভেতর ছুড়ে দিচ্ছে। ডাক্তারকে ডেকে দৃশ্যটা দেখালুম।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা এদের এই বিপুল সমৃদ্ধির কারনটা বলতে পারেন। বললাম, পারি। এর কারণ, নিরলস পরিশ্রম, সততা, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, আর জ্বলন্ত দেশ প্রেম। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রনে সজাগবোধ। ডাক্তার বললেন, বলবেন এদের জাতিগঠনের গোড়ার ইতিহাসটা। আমি বললাম, খুসি মনেই বলবো, তবে খুবই সংক্ষেপে। এরপর আমি বললাম, ইরিয়ান সাগর থেকে ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে কাপ্টেনকুকের জাহাজ আঠারো শতাব্দীর মাঝামাঝি সিডনী সহরের উপকণ্ঠে বোটানী 'বে' তে এসে নোঙ্গর ফেললো। ক্যাপ্টেন কুক প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে তিনি এক নতুন মহাদেশে এসে পৌঁছে-ছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে এক নতুন মহাদেশ আবিস্কারের সংবাদ জানালেন। এই সংবাদে ইংলণ্ডের জনগণ কিংবা তাদের পার্লামেণ্ট প্রথমে খুব বেশী উৎসাহ প্রকাশ করলোনা। কয়েকটা যুগ পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে খুন, ডাকাতি, চুরি রাহাজানি ইত্যাদি গর্হিত অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ইংলণ্ডের কারাগৃহ গুলোতে তাদের জন্যে আর স্থান সঙ্কুলান হয়না। তখন ইংলণ্ডের সরকার ভাবলো এই সকল জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের দ্বীপান্তরে না পাঠালে আর চলছেনা। তাই ১৭৮৮ সালে ইংলণ্ড থেকে ছ'টি জাহাজে ৭২৯ জন পুরুষ ও স্ত্রী কয়েদি ১৯জন উচ্চপদস্থ এবং ২৪জন সাধারণ সামরিক অফিসার ১৬০জন ব্রিটিশ সৈন্য, ৮জন সামরিক ঢোল বাদক, ৫০জন সাধারণ স্ত্রীলোক, ১২টি বালক বালিকা, কিছু খাদ্য সামান্য কিছু হাতের কাজের যন্ত্রপাতি, কিছু শষ্যবীজ, ৪৪টি ভেড়া, ৬টি ঘোড়া, ৪টি দুগ্ধবতী গাভী ইত্যাদি নিয়ে আট মাস সাগরপাড়ি দিয়ে এরা একদিন সেই 'বোটানী বে' তে এসে জাহাজ

থেকে নামলো। সামরিক কর্মচারীদের উপর বৃটিশ সরকারের নির্দেশ ছিল যে এ সকল কয়েদিদের দিয়ে একটি খামার তৈরী করাতে হবে। বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য যাই কেননা থাকুক, এ সকল হতভাগ্য কয়েদিরা পায়ে বেড়ি আর শেকল পড়ে যেদিন অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে এসে নামলো, সেদিন তারা কি আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। জেলবাসের কষ্ট থেকে খানিকটা মুক্তি পাবে এই আশা হয়ত নিশ্চয়ই করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার বিষাক্ত আগাছার মত জুয়া, মদ্যপান এবং নারীমাংস লোলুপতার আসক্তিগুলো সঙ্গে করে এনেছিল। এ সকল কয়েদিরা কিছুদিনের মধ্যেই এই জনমানবহীন মহাদেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। একদল মন দিল কৃষিকার্যে আর পশু পালনে, অপর দল পরে রইলো মদ, জুয়া আর বেপরোয়া ইন্দ্রিয়চর্চায়। কয়েক বছর পর সোনার সন্ধান পাওয়া গেল ডার্লিং নদীর কিনারে. তারপর নিরলস অনুসন্ধানের ফলে পাহাড়ের নিম্নভূমিতেও তারা সোনা আর মূল্যবান রত্নের সন্ধান পেলো। শুরু হলো আত্মঘাতি "গোল্ড রাস"। হাজার হাজার মানুষ ইয়োরোপ থেকে ধেয়ে এলো এই স্বর্ণ আর রত্নখনির সন্ধানে, কিন্তু অচিরেই সোনার স্বপ্ন পরিণত হল স্বর্ণ মরীচিকায়। এ সকল বিফল মনোরথ মানুষগুলো কিন্তু আর দেশে ফিরে গেলনা। তারা এসে যোগ দিল এই কয়েদিদের সঙ্গে। ইংলণ্ডের কারাগারে কয়েদিদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরুক ছিল, যার ফলে এই 'মেট' কথাটির প্রচলন হয়েছিল নিজেদের মধ্যে—যে শব্দটি আজো অষ্ট্রেলিয়ার জনজীবনে ব্যবহৃত হয় 'ফ্রেণ্ড' কথাটির পরিবর্তে—সেই ভ্রাতৃভাব নিয়েই এই কয়েদিরা ঐ সকল অভিশপ্ত স্বর্ণ সন্ধানীদের সাদরে গ্রহণ করলো। এদের সমবেত চেষ্টায় স্বর্ণ খনি পাওয়া গেলনা, কিন্তু তারা পেল লোহার খনির সন্ধান, কয়লার সন্ধান, তামা, অভ্র, নিকেল আর দস্তার সন্ধান। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পুঁজিপতিরা আর মধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবিরা ছুটে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। শুরু হল নব জাতি গঠনের বুনিয়াদ নির্মাণ। একশো বছরের মধ্যে দারিদ্র গেল ঘুচে।

উন্নত মানের জীবন যাত্রা হল শুরু। পশু পালন, কৃষি, কলকারখানা নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরীর কাছে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো সকল স্তরের মানুষ। সমাজের উচ্চ নিচের দেয়ালটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল, স্থাপিত হল ইংরেজীতে যাকে বলে এক "ইগালেটেরিয়ান" সমাজব্যবস্থা। অস্ট্রেলিয়া আকারে আমাদের দেশের প্রায় আড়াই গুণ বড়। কিন্তু লোক সংখ্যা আজো এককোটি বিশ লক্ষের কিছু উপরে। তাই এত সমৃদ্ধিশালী হয়েও এই মহাদেশটা এখনো বলতে গেলে প্রায় জনমানবহীন, নির্জন নিস্তব্ধ। এই জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী বাস করে মাত্র কয়েকটা সহরে, যেমন সিডনী' মেলবোর্ণ, ব্রীজবেন, এ্যাডিলেড আর পার্থ-এ।

এ্যাডিলেড থেকে সিডনী ফিরবার পথে ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা আমাদের দেশ অষ্ট্রেলিয়া থেকে কি চায় আর অষ্ট্রেলিয়াই বা আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা করে?

উত্তরে আমি বলেছিলাম, অষ্ট্রেলিয়ার কাছে কোন অতিরিক্ত চাহিদা আমাদের নেই। অন্যান্য দেশের কাছে আমরা যা প্রত্যাশা করি অর্থাৎ বন্ধুত্ব। সোজা কথায় বলতে গেলে যা বোঝায় তাহল অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহযোগীতার মাধ্যমে উভয় দেশের লাভবান হওয়া। আর অষ্ট্রেলিয়াও আমাদের কাছে তাই চায়।

ডাক্তার পুনরায় প্রশ্ন করলো, আমাদের পাবলিসিটি এদেশে কতটা সার্থক হয়েছে বলতে পারেন?

উত্তরে বললাম, নিক্তি দিয়ে ওজন করে বলতে পারবোনা, তবে অষ্ট্রেলিয়ার জনগণ ভারতবর্ষকে জানতে বুঝতে আজ খুবই আগ্রহী। তার একটা কারণ আছে। অষ্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারা পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গেই গাঁঠছড়া বেঁধে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া আজ বুঝেছে তাদের এই নীতি অভ্রান্ত নয়। তারা ইয়োরোপীয় জাতিগুলোর বংশধর হলেও তারা এই এশিয়া ভূখণ্ডেরই অধিবাসী। তাই এখানে একঘরে করে নিজেদের রাখলে অসুবিধেটা হবে বেশী তাদেরই। তাই দক্ষিণ ও

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়া আজ সক্রিয় অংশ নিতে আগ্রহী। তাই তারা আজ আমাদের জানতে চায়, বুঝতে চায়। আমরাও সেই চাহিদা যতদূর সম্ভব মিটিয়ে চলি। অষ্ট্রেলিয়ার জনমানসে আমাদের প্রবেশের অনেকগুলো দরজা আজ খোলা। ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, অর্থ আব রাজনীতি যোগব্যায়াম, সঙ্গীত আর ভারতের কুটিব শিল্পজাত সামগ্রী অষ্ট্রেলিয়ার জনগণের মনে আজ বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। চিন্তাশীল অষ্ট্রেলিয়ানদের কাছে ভারত আজ আর উপেক্ষনীয় বস্তু হয়। তু'একজন উঁচুদরের ভারত প্রেমিককে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এদের মধ্যে 'প্রথমেই মনে করতে হয় তদানীন্তন সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য স্যার ফিলিপ ব্যাকসষ্টার. ইনি তখন অষ্ট্রেলীয় আণবিক গবেষনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। অসামান্য পণ্ডিত এবং আণবিক গবেষনায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। খুবই সদালাপী নিরহংকার ব্যক্তি। তার সঙ্গে যেদিন সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আণবিক গবেষনার জগতে ভারতেব স্থান অতি উর্দ্ধে। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে তিনি আমাকে সখেদে বলে-ছিলেন, "ইউ বিলং টু এ গ্রেট বাট আনহ্যাপি নেশন।"

এর কয়েক বছর পর একদিন খুব অল্পসময়ের জন্যে দেখা পেয়ে-ছিলাম ভারত দরদী এক মহাপুরুষের। ইনি ডক্টর এলবার্ট সোয়াইট-জার। ইনি শুধুমাত্র ভারতপ্রেমিক কিংবা হিন্দুদর্শনতত্ত্বজ্ঞানী নন, ইনি বর্তমান বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর ভাগ্যবিধাতা এক বিস্ময়কর জীবন-রথে তুলে তাকে এই পৃথিবী পরিক্রমা করিয়েছিলেন। জার্মেণীর এক ধনী পরিবারের মেধাবী সন্তান, চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ইয়োরোপের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী, তরুণ এলবার্ট, জীবনে বিপুল অর্থ ও যশোলাভের মোহ ত্যাগ করে, বেলজিয়াম-কঙ্গোর গ্রামে গ্রামে উৎকট আর উদ্ভট রোগাক্রান্ত মানুষগুলোর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। ব্রাজাভিলের এক খৃষ্টান পাদ্রী একটি গীর্জায় সমবেত নরনারীকে উদ্দেশ করে একদিন বলেছিলেন, তোমরা যদি ঈশ্বরের পুত্র

অর্থাৎ যিশুকে দেখতে চাও তবে এখানে এসো। আর যদি ঈশ্বরদর্শন পেতে চাও তবে দেখে এসো আলবার্ট সোয়াইটজারকে, এখান থেকে দু'শ মাইল দূরে একটি নিভৃত পল্লীর হাসপাতালে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর সোয়াইটজার তার জীবনের প্রায় চল্লিশ বছর এই বেলজিয়ান কঙ্গোতে কাটিয়ে ছিলেন। উদয়াস্ত হাসপাতালে রুগীর চিকিৎসা আর পরিচর্যা করে সন্ধ্যার পর নিজের কুটীরে ফিরে এসে সামান্য নৈশাহার সেরে হয় হিন্দুদর্শনের ভাষ্য লিখতে বসতেন, নয়তো বেহালার বাক্সটা খুলে ছড়ে রজন ঘসে বেহালাটা তুলে নিয়ে কখনো বিটোফেন, কোনদিন বা মোজার্ট আর হ্যাণ্ডেল রচিত সঙ্গীত বাজাতেন! শোনা যায় যে আলবার্ট সোয়াইটজার যখন তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাতেন, তখন ঝিল্লী তার একটানা ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙ তার ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক বন্ধ করে এই ডাক্তারের বেহালা শুনতো।

১৯৬২ সালের কোন একটা সময়, নাইজেরিয়ার কানো সহর থেকে আমার এক বন্ধু খবর দিলেন যে ডক্টর সোয়াইটজার কানো থেকে সুইটস্‌জারল্যাণ্ড যাওয়ার পথে কানো বিমান বন্দরে ঘণ্টা খানেক থাকবেন প্লেন বদল করার জন্যে। আক্রা থেকে ছুটে গেলাম কানো। টার্মিনাল বিল্ডিংএর ভি, আই, পি লাউঞ্জে দেখা হল ডকটর সোয়াইটজারের সঙ্গে। মনীষীদের বোধ করি চেহারায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যাতে এক নজরে তাকে চিনতে পারা যায়। দীর্ঘ দেহী, মাথায় সাদা কালোয় মেশানো একরাশ অবিন্যস্ত চুল, বিশাল গোঁফ, চোখের নীল মনিতে নীলাকাশের অসীম নীলিমা। শান্ত সমাহিত দৃষ্টি।

তাঁর কাছে গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে ভারতীয় প্রথায় তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন।

শারীরিক কুশল প্রশ্নাদির পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, একবার আমাদের দেশে আসবেন না?

তিনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, দেখ এই বিশ্ববিধাতাটি বড়ই অবিবেচক। আমাদের কত কাজ। অথচ তিনি মানুষকে কত স্বল্পায়ু দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। আমার হাতে যদি আরো ষাট সত্তর বছর আয়ু থাকতো তবে ভারতের আর্ত মানুষের সেবায় অনায়াসেই ঐ কটা বছর কাটিয়ে দিতে পারতাম। সামান্য এক পর্য্যটকের ভূমিকা নিয়ে তোমাদের দেশে গিয়ে লাভ কি? তবে আমি তোমাদের মত জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। আশা করি পরজন্মে তোমাদের দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবো।

জিজ্ঞাসা করলাম, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপনার কখনো দেখা হয়েছিলো।

তিনি বললেন, এই আমার আক্ষেপ যে ঐ মহান আত্মার অধিকারী মানুষটিকে কখনো চোখে দেখতে পেলামনা। তবে পরলোকে হয়ত সাক্ষাৎ হবে।

সময় ফুরিয়ে আসছিল তাই শেষ প্রশ্ন করলাম, আপনি ভারতের অতীত এবং বর্তমান অবস্থা জানেন। সেই দেশের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, পৃথিবীর আর সকল জাতির যে ভবিষ্যৎ, ভারতেরও তাই। এই পৃথিবীর সকল মানুষই এক লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছে। আমরা একদিন সকলেই একযোগে সেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছুবো।

তাঁর প্লেনে ওঠার ডাক পড়লো। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে প্লেনে গিয়ে উঠলেন। প্লেনটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমিও আক্রার পথে পা বাড়ালাম।

বিশ বছর ধরে পাঁচ মহাদেশের জল আর বাতাস, মাটি আর মানুষের পলি জমে জমে আমার একরঙা মনটা ততদিনে নানা রঙের মোসেইকে পরিণত হয়েছে। বোধ করি আরো কিছু রঙ মেশাবার প্রয়োজন ছিল। তারই ছোঁপ লাগাতে এবার এলাম যথাক্রমে কাম্বোডিয়া (বর্তমান নাম কাম্পুচিয়া) আর থাইল্যাণ্ডে।

এ দুটি দেশের জনমনে সফর করতে গিয়ে রক্তচক্ষুর ধমকানি খেতে হল পাথরে গড়া আমারই দেশের দেবদেবী আর অবতারদের মূর্তি থেকে। তাঁরা যেন রোষকশায়িত লোচনে আমাকে বললেন, তোর দেশ, তোর দেশের সভ্যতা, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, ভাস্কর্য, শিল্প, কৃষ্টি নিয়ে এদেশের মানুষকে নতুন কথা তুই আর কি বলবি? প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকে আমরা অর্থাৎ ভারতের দেবদেবীরা আর অবতারগণ, ভারত থেকে বাঘা বাঘা ধর্মযাজক আর ধুরন্ধর সওদাগরদের আমাদের অ্যামবেসেডর করে এসব দেশে পাঠিয়েছি, এদের শিক্ষা আর সভ্যতা দিতে, এদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগাতে। তুই ত কূটনৈতিক জগতের একটা চুনোপুঁটি। তুই নতুন করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদের আর কি বলবি। তবে তোদের দেশ স্বাধীন হবার পর কোনো নতুন চিন্তা যদি তোদের লিডারদের মাথায় এসে থাকে তবে তাই বলগে যা। কিন্তু সাবধান ধর্মটর্ম নিয়ে কোন কথা বলার দুর্বুদ্ধি যেন না হয়।

পাথরে গড়া হিন্দু দেবদেবী আর ভগবান বুদ্ধের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে অন্যত্র সরে গেলুম। কিন্তু যাওয়ার আগে তাদের বললুম, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য, তবে আপনাদের পাথরের মূর্তিগুলো ঘুরে ফিরে দেখবার পারমিশন দেবেন কি? গ্রেনাইট পাথরে গড়া ভগবান বিষ্ণু যেন বললেন, তথাস্তু!

ছুটে গেলাম আঙ্কোরভাট (আঙ্কোর, নগর শব্দের বিকৃত উচ্চারণ) আঙ্কোর থম (থম, ধাম শব্দের বিকৃত উচ্চারণ) বায়ন, তাসোম, প্রাখাঁন আর বান্তেশ্রীর মন্দির আর সেই প্রাচীন নগরগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে। তারপর থাইল্যাণ্ডের সুখথাই (পালি সুখোদয় শব্দের বিকৃত উচ্চারণ) আর পিৎসানুলোক (বিষ্ণুলোক), আইয়ুথিয়া (অযোধ্যা) আর থনবুড়ি (ধনপুরী) আর কাঞ্চনাবুড়ি নগরগুলোতে।

আঙ্কোরভাট আর সুখথাই এর ভাস্কর্যের অপরিমেয় নিপুণতা আর স্থাপত্যের চমৎকারিত্বে চমকে উঠেছিলুম, আর আঙ্কোর থম, বায়ন আর আইয়ুথিয়া নগরগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম।

তারপর থাইল্যাণ্ড আর কাম্বোডিয়ার ইতিহাসের পাতা খুলে দেখলাম থাইল্যাণ্ডের আইয়ুথিয়ার রাজত্ব এবং কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর থমের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই দেশের এগিয়ে যাবার চিন্তাস্রোতও থমকে দাঁড়িয়েছিল। রণক্লান্ত খামের আর থাই, আনাম আর চাম যুদ্ধক্লান্ত হয়ে রণক্ষেত্রেই শত্রুর পাশাপাশি কয়েকশ' বছরের জন্য ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েকজন থাই নৃপতির অসীম বীরত্বে আর বজ্রকঠিন শাসনে এই থাই জাতিটা তাদের লম্বা একটানা ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে জেগে উঠতো। কিন্তু কাম্বোজের ঘুম আর ভাঙ্গলো না ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর পর্বের আগে, যতদিন না ফরাসীরা এসে তাদের টেনেটুনে তুললো তাদের পায়ে ঔপনিবেশিকতার বেড়ি পরিয়ে। তারা ঘুমের ঘোর কাটিয়ে নতুন চোখে দেখলো মেকং (মাগঙ্গা) নদীর স্রোত তেমনি অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে তাদের সৌবন্নফুমির (সুবর্ণভূমি) উপর দিয়ে। তাদের শিথিল রক্তস্রোতেও কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য এলো। স্মরণ করবার চেষ্টা করলো বহুদিনের বিস্মৃত যুগকে। তাদের মনে স্বাধিকারবোধ ফিরে এলো একটু একটু করে কিন্তু সুচতুর ফরাসীরা অনাগত ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কায় তাদের দেশের দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে সোমরস এনে স্ফটিকপাত্রে তাই পান করালো খামেরদের আবার তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার 'মহৎ' উদ্দেশ্যে।

কিন্তু থাইল্যাণ্ডের সুচতুর নৃপতিরা শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের জালে ধরা দিল না। তারা বললো, আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাও কর, কিন্তু সাবধান আমাদের স্বাধীনতায় হাত দেবার চেষ্টা করো না। জানো ত 'থাই' কথাটার অর্থই হলো স্বাধীনতা।

১৯৫৪ সালে ফরাসীরা ইন্দোচীন ছেড়ে চলে গেল। কাম্বোডিয়া আবার স্বাধীন দেশের সম্মান ফিরে পেলো। কিন্তু থাইল্যাণ্ড আর কাম্বোজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠলোনা। জীবনযাত্রার মান তেমনি অবনত হয়েই রইলো।

কিন্তু থাইল্যাণ্ডে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলো ভিয়েৎনাম যুদ্ধ। অযুত নিযুত কোটি মার্কিন ডলার উড়তে লাগলো থাইল্যাণ্ডের বাতাসে। সেই উড়ন্ত ডলার সংগৃহীত হলো নতুন আর্থিক বুনিয়াদ গড়তে, জাতির সামগ্রীক কল্যাণে। সমস্ত দেশটার রূপ পরিবর্তন হল কয়েকটি বছরের ব্যবধানে। এতে দেশের দারিদ্র অবিশ্যি ঘুচলোনা কিন্তু অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচলো। ইতিমধ্যে থাইল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতির নতুন মূল্যায়ণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো আভ্যন্তরীন নীতির দর্পনে। শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি তারা গ্রহণ করলোনা। থাইল্যাণ্ড পুরোপুরি আমেরিকার ক্যাম্পে যোগ দিল। যে থাইল্যাণ্ড একদিন ধর্ম ও সভ্যতার রস ভারত থেকে আহরণ করেছিল সেই থাইল্যাণ্ড কিন্তু ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির কণা মাত্র গ্রহণ করলোনা। নিরপেক্ষ নীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে থাইল্যাণ্ড প্রশ্ন করলো, জীবন বড় না নীতি বড়? যে নীতি অনুসরণ করলে মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার পায় সেটাই নীতি, বাকি সব দুর্নীতি। কিন্তু আজ এই নীতিকে বল্গাহীন অশ্বের বেগে ছুটিয়ে দিয়ে থাইল্যাণ্ড তাদের সমাজ জীবনে এক নিদারুণ অবক্ষয় ডেকে এনেছে। অর্থই পরমার্থ লাভের উপায়—এই নীতিকে আশ্রয় করে জীবনের গভীর পঙ্কে ডুবে গেছে থাইল্যাণ্ড। ব্যাঙ্কক আজ এক পাপপুরীতে পরিণত হয়েছে। সুরা আর নারীই আজ সেখানে সকল সুখ সকল আনন্দের উৎস। নাইট ক্লাব আর স্ট্রিপটিজ 'বার' মাসাজ পারলারে ছেয়ে গেছে সারা সহরটা। দিনের ব্যাঙ্কক আর রাতের ব্যাঙ্কক দুটো আলাদা সহর। লাম্প্যট্য আর ব্যাভিচারের এমন স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে বোধ করি আর কোথাও নেই। মধুগন্ধে যেমন মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, তেমনি থাই যুবতীদের আকর্ষণে হাজার হাজার পর্যটক প্রতিদিন ছুটে আসছে এই ব্যাঙ্কক সহরে। এই সব দেহবিলাসীদের প্রথম প্রথম দেখে আমার দেবকন্যা বলে ভ্রম হয়েছে। কি অপরূপ তনুদেহলতা। কি শিশির ধোয়া শঙ্খের মত কি যৌবন লাবন্য এদের সারা দেহে। দেখে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু তাদের এই পেলব ত্বকের নিচে যে আগুন লুকিয়ে আছে তাতে প্রতি-

দিন প্রমোদ লোভী পতঙ্গদল পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। যৌনচর্চার যে বিকৃত রূপ দেখেছি তাতে মানুষের সুস্থবিচারবোধের উপর বোধকরি চিরকালের জন্যে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। কয়েকটা টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার থাই তরুন তরুনী টিকিট কাটা অতিথিদের বিভিন্ন মুদ্রায় নরনারীর যৌন মিলনের নিলর্জ্জ ক্রিয়াকলাপ দেখান বলে শুনেছি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্লু ফিল্ম দেখানোর ঢালাও ব্যবস্থা, অবশ্য প্রকাশ্যে নয়। মাসাজ পারলারগুলো এক একটা নতুন ধরণের গণিকাবৃত্তির কেন্দ্রস্থল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ বেশ্যা কিংবা 'কল' গার্লদের কথা ছেড়েই দিলাম। পানসী কিংবা ছোট মোটর লঞ্চ ভাড়া করে ছাঁওপিয়া নদীর জলে সেই পানসী ভাসিয়ে প্রায় সকলেই তাদের অঙ্গবাস ছাঁওপিয়া নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে আট দশটি পুরুষ এবং সমসংখ্যক স্ত্রী এক সঙ্গে নৌকা বিলাসে মত্ত হয়ে উঠে।

দু'একজন থাই বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলেছি। তাদের বক্তব্য —এই নাইট লাইফ বন্ধ করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। প্রতিদিন থাইল্যাণ্ড কয়েক লক্ষ্য ডলার আয় করে টুরিস্টদের কাছ থেকে। এই অর্থ বিনা দেশের উন্নতির স্রোতকে অব্যাহত রাখা যাবেনা। এই যুক্তির পর আর কি বলার থাকতে পারে। তাই একদিন থাইল্যাণ্ড থেকে নিরবেই চলে এসেছিলাম।

কিন্তু ব্যাঙ্কক থেকে চলে আসবার দিনটিতেও দেখেছি ব্রহ্মার স্বর্ণ-মূর্তির সামনে শতশত নরনারী পুষ্পমাল্য, ধূপকাঠি আর মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছেন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে। বৌদ্ধমন্দিরে আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপিত ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে শত শত ভক্ত তাদের ভক্তি নিবেদন করছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সময়ের চাকার সঙ্গে নিজেকে এমনি করে বেঁধে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, এক দেশ থেকে দেশান্তরে কয়েকটা যুগ ধরে পাক খেতে খেতে দেখলাম কুটনৈতিক জীবনের মেয়াদের কাচঘড়ির শেষ বালুকণাটি সময়ের সূক্ষ্মছিদ্রপথ দিয়ে কখন নিচে পড়ে গেছে। মেপিষ্টোফেলিসের স্মরন করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলনা, বৃদ্ধ ডাক্তার ফাউষ্ট নিজেই কাচঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন তার ধারকরা যৌবন অন্তর্হিত হবার শেষ দিন সমাগত। আমিও তেমনি আমার কূটনৈতিক জীবনের শেষ দিনটিতে এসে দাঁড়ালাম।

আমার কণ্ঠে সেদিন যদি একটি মন্দার মালিকা থাকতো তবে স্বর্গথেকে বিদায়ের শেষ দিনটিতে যে-কোন এক স্বর্গবাসীর গলার মালার মত আমার মালাটিও ম্লান হয়ে আসতো। কূটনীতিক জীবনের "সুখের অমরাবতী" থেকে বিদায় নেবার জন্যে নয়, এই পৃথিবীর কতশত মানুষের মনোরাজ্যের অমৃতলোকে অসমাপ্ত ভ্রমনের পথটা অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল বলে।

এই পৃথিবীতে মাইকেল লার্ক-এর মত হয়ত আরো কতশত অদেখা মানুষ রয়ে গেল যারা তাদের দেশের কল্যানের জন্যে অষ্ট্রেলিয়ার মেষ পালকের পুত্র মাইকেলের মতই নিজের দেশসেবার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেছে নিত ঐ মাইকেলের মতই নিঃসঙ্গ একক মরুজীবন কিংবা তার চেয়েও কোন ক্লেশকর পথ।

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের কোন একটি সন্ধ্যায় ব্যাঙ্ককে আমাদের দূতাবাসের কনফ্রারেনস হলে আয়োজিত আমার বিদায় সম্বর্দ্ধনা সভায় আমাদের রাষ্ট্রদূত যখন নেহাতই ফর্মালিটির খাতিরে আমার "কর্ম-

কুশলতা” সম্পর্কে দু'একটা প্রশংসার বানী শোনাচ্ছিলেন, তখন আমার মন ছুটে গিয়েছিল সেই পঁচিশ বছরের যুবক মাইকেল লার্ক–এর মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত তার বীয়ার আর অন্যান্য খাদ্য পানীয়ের ছোট্ট দোকান ঘরটিতে। সেই দোকানে মাইকেলের একটিমাত্র সহচর গন্ধকবর্ণের ঝুঁটি-ওয়ালা শ্বেতশুভ্র একটি কাকাতুয়া। মাইকেলের দোকানের হাজার বর্গমাইলের মধ্যে কোন জনমানবের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এই মরুভূমিতে ঋতু পরিবর্তন হয়না। গ্রীষ্মই একমাত্র ঋতু আর যেখানে দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতাপ ১২০° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠে যায়।

ট্রাক বোঝাই ভেড়া আর গরু সহরে নিয়ে যাওয়ার পথে মরুসূর্য্যের প্রচণ্ড দাবদাহে কণ্ঠতালু শুকিয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে ট্রাক ড্রাইভার ক্ষীণ কণ্ঠে মাইকেলকে প্রশ্ন করে— “মাইট, হ্যাভ ইউ গট সাম কোল্ড বিয়ার।”

মাইকেল তখন ঠাণ্ডা বিয়ারের জালাটা তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্যানডুইচের থালাটা আনতে ভেতরে চলে যায়।

ট্রাক ড্রাইভাররা কখনো গভীর রাত্রে তার দোকানে হানা দেয় বলে মাইকেল তার দোকানের দরজা কখনো বন্ধ করে না। রাত্রে শুতে যাবার আগে টেবিলের উপর সাজানো বিয়ারের বোতলগুলোর একটির গলায় বোতলের ছিপি খোলার চাবিটি ঝুলিয়ে তার নিচে এক টুকরো কাগজে লিখে রাখে—তোমরা আর যাই কর, দয়া করে বটল ওপেনারটি সঙ্গে করে নিয়ে যেওনা, তাহলেই মারা পরবো।

মরুভূমিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে সারাদিনের রোদ্রদগ্ধ বাতাস যখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসে, মাইকেল তখন তার প্রিয় কাকাতুয়াটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসে। সন্ধ্যার সেই মলিন আলোয় আকাশে সঞ্চরমান কোন পাখীকে কুলায় ফিরে যেতে দেখেনা মাইকেল। কিংবা ঝিল্লিরবে তার ছোট্ট কুটিরটির অঙ্গন প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠেনা। মাইকেল তখন বাসি রক্তের দাগের মতন কালছেলাল পশ্চিম দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে থাকে। হয়ত প্রিয়জনদের কথা ভাবে, কিন্তু

ক্ষণে ক্ষণে তার তন্ময়তা বাধা পায় যখন ঐ ট্রাক ড্রাইভারদের কণ্ঠ নকল করে তার ঐ শ্রুতিধর কাকাতুয়াটি আপন মনেই বলে উঠে—হ্যাভ ইউ কোল্ড বিয়ার? হ্যাভ ইউ গট ব্রেড? হ্যাভ ইউ পিনাটস্?

মাইকেল লার্ক-এর মত আরো কত পরিচিত মুখ মনের মধ্যে এসে ভীড় জমায়। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আর্জেন্টিনার করদোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দোলজীর ছাত্রী অসামান্যা রূপসী তরুণী এঞ্জেলা অর্তিজের কথা। এঞ্জেলার বিশ্বাস সে ভারত কন্যা। এই গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বুক বেঁধে এঞ্জেলা একদিন তার এঞ্জেলা নাম বদলে নিবেদিতা গান্ধারী নাম নিয়ে, পিতামাতা, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব এবং আবাল্যের সংস্কার সব ছেড়ে, এই ভারতভূমিকে নিজের মাতৃভূমিজ্ঞানে ছুটে এল দিল্লীতে জীবনটা এই মাটিতেই কাটাবে বলে। কিন্তু কি নির্মম মূল্যই না তাকে দিতে হয়েছিল তার এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্যে। কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে তরুণ ভারতীয় স্বামী হারিয়ে ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা হয়ে একদিন তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল সেই করদোবায়।

মনে পড়লো এই ব্যাঙ্ককেরই এক গণিকার কথা যে এক মোহমদির দেহবিলাসের রাত্রে তার জীবনের এক মহাসংকটময় মুহূর্তে তার এক ভারতীয় অতিথির হাত থেকে পাওয়া বোধিদ্রুমের একটি শুকনো পাতা বুকে চেপে সেই রাত্রেই ঘর ছেড়ে উধাও হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের শরণাগত হয়ে।

এদের মত আরো অনেকের এমনিতর জীবনের কাহিনী লিখে তালিকা দীর্ঘ করতে চাই না। কিন্তু এই পৃথিবীর লক্ষকোটি মানুষের ভীড়ে এসকল অখ্যাত অজ্ঞাত মানব-মানবীর জীবনের ট্যাজেডি কোন মানুষের হৃদয়ের এককোণে সামান্য একটু স্পন্দন তুলতে পেরেছিল কিনা আমার জানা নেই।

এদের সঙ্গে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো আরো কয়েকজন, বিশ্বজুড়ে যাদের খ্যাতি। ভারত প্রেমিক হিসেবে যাদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম।

যদি আমার কর্মজীবনের অবসান কোনদিনই না হত তবে হয়ত এদের মত আরো অনেকের মনোরাজ্যে আমার সফর অব্যাহত থাকতো জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত।

কাপপ্লেট আর কাটাচামচের টুং টুং শব্দে আমার তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম খাবার পরিবেশন হচ্ছে।

পরদিন বিমানবন্দরে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, সহকর্মীদের কাছে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠলাম। শুধু ব্যাঙ্কক থেকেই নয়, আমার কূটনৈতিক জীবনের জগত থেকে আমাকে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন করে প্লেন শূন্যে উঠে গেল।

প্লেনে যেতে যেতে আমার মন ছুটে গেল ফেলে আসা জীবনের বিস্মৃতপ্রায় অতীতে—আমার কৈশোর আর যৌবনের বয়ঃসন্ধির দিনগুলোতে। জানিনা কেন তখন থেকেই পৃথিবীর বহু বিচিত্র সুদূর দেশগুলি দেখার একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। সেই ছেলে বয়েসে 'ক্যালকাটা' মাঠে ফুটবল খেলা দেখে, খেলা দেখার উত্তেজনা আর সারাদিনের রৌদ্রদগ্ধ দেহের শান্তি ঘুচাতে যখন আউটরাম ঘাটে এসে জেঠির উপর বসতাম, তখন দেখতাম চাঁদপাল ঘাট থেকে সুরু করে খিদিরপুরের ডক পর্যন্ত একটার পর একটা বিদেশী জাহাজ গঙ্গার বুক জুড়ে আছে। এর মধ্যে কোনটা যাত্রী আর কোনটা মালবাহী জাহাজ তখন তা বুঝতাম না। কিন্তু এই জাহাজগুলোর উজ্জ্বল আলো, সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত শ্বেতকায় লোকগুলোর জাহাজে ওঠা-নামা, গঙ্গার ধারে বিদেশী নাবিকদের সদর্প পদচারণা, তাদের শ্বেতাঙ্গিনী সঙ্গিনীদের গায়ে দামী সেণ্টের মিষ্টি গন্ধ আমাকে যেন দূর দেখার স্বপ্নে বিভোর করে দিত। জাহাজগুলোর নাম পড়ে পড়ে আর জাহাজের মাস্তুলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা দেখে মনে মনে বলতাম, এই জাহাজটা এসেছে ইংলণ্ড থেকে, এটা জার্মেনী থেকে, এটা আমেরিকা থেকে, ওটা জাপান থেকে, আর ঐ দূরের জাহাজটা গ্রীস থেকে। চোখের সামনে ভেসে উঠতো টেইমস নদীর পারে লণ্ডন, সমুদ্র থেকে উঠে আসা জাপানের কোবে বন্দর। জার্মানির হামবুর্গ,

গ্রীসের সালোনিকা বন্দর, নিউইয়র্ক আর শিকাগোর আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা। জাহাজগুলোকে দেখে মনে হত এগুলো যেন সে-সব দেশের প্রতীক যেখানকার মানুষগুলো আমাদের মত পরাধীন নয়।

দারিদ্র, রোগ, অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অবমাননায় যারা মনুষ্যত্ব খোয়ায় নি, ভীরুতাকে জয় করে দুর্মদ সংগ্রামে যারা পিছু হটেনি, অন্তহীন প্রাণরসে যারা জীবনতরু সতেজ আর ফলবান করে রেখেছে দেখতে সাধ জাগতো সে সকল জাতির দেশগুলোর তরুলতার রঙ আমার দেশের গাছের পাতার সবুজ রঙ থেকে আরো সবুজ কিনা। তাদের দেশের পায়ে চলার পথ আমার দেশের থেকে দীর্ঘ কিনা।

আমার এই দূর দেখার স্বপ্ন যদি কেবলমাত্র একটা ভ্রমন বিলাস হত তবে সেই ছবিটা বোধকরি আজ আর আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতোনা। তখন থেকেই আমার মনের কোনে লুকিয়ে ছিল আর একটা আকাঙ্খা। বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উচ্চাকাঙ্খা। তারপর শিক্ষান্তে দেশে ফিরে কর্মজীবনে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমার সেই দুরাশাকে একদিন ঐ আউটরাম ঘাটের নিচে বহমান গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলাম। তারপর এসব স্বপ্ন একদিন নিঃশব্দে জীবন থেকে মিলিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমার জীবনের উপর দিয়ে দীর্ঘ পনেরো বছরের ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে। জীবন সংগ্রামে ঝঞ্চাতাড়িত হয়ে ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তের একটি সহরে যখন সাংবাদিকতার কাজে হাত পাকাবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রালয় থেকে এলো সেখানে কর্মগ্রহণের আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিতে হলো।

দূর দেখার যে-স্বপ্ন একদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল, জানিনা কোন এক রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় পথে রবিরশ্মির সোনার আলোর সঞ্জীবনী স্পর্শে সেই মৃত অঙ্কুরটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠলো। নিমেষের মধ্যে অপরিণত এক সাংবাদিকের উত্তরণ হলো কূটনীতিকের পদে।

শুরু হল শুধুমাত্র দূর দেখা নয়, শুরু হলো এই বিপুলা পৃথিবী পরিক্রমা। শুরু হল আমার চিরঅভিলষিত পথে—"জানি এ্যামং মেন"।

আমার এই কূটনৈতিক জীবনের লাভ লোকসানের খতিয়ান না মিলিয়েও এ কথা আজ নিঃশঙ্কোচে বলতে পারি যে এই ডিপ্লোম্যাটিক কেরিয়ারের এক মস্ত আকর্ষণ হলো যে এও জ্ঞানচয়নের এক বিরাট পাঠশালা, যেখানে একজন অনেক বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও চিরদিন বিদ্যার্থী হয়ে থাকার আনন্দ পেতে পারে।

অন্য কোন অর্থকরী পেশায় অনেককেই গ্রামোফোনের পিনের মত রেকর্ডের গ্রুভের মধ্যদিয়েই আবর্তিত হতে হয়। সেই কারণে জীবনের অগ্রপশ্চাতে তাকাবার স্বাধীনতা স্বাভাবিক কারনেই সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তাই জ্ঞানার্জনের পথটা স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ আর সঙ্কুচিত হয়ে আসে। কিন্তু একজন ডিপ্লোম্যাটের বেলায় কি হয়? তিনি প্রতিনিয়ত নতুন দেশ, নতুন জাতি আর নতুন ধ্যান ধারণার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। সেই সঙ্গে নতুন সমস্যার মোকাবেলা করতে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বারবার উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। যে ডিপ্লোম্যাট যতটা সতর্কতা, নিরাসক্তি আর সহানুভূতির সঙ্গে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, সাফল্যের দিকে ততই তিনি এগিয়ে যেতে পারেন। কূটনীতিকের বয়স তার এই গুণাবলীকে জীর্ণ করতে পারেনা, কোন সংস্কারই নানাদিকে প্রসারিত তার অসীম বৈচিত্রময় জীবন ধারার স্রোত রুদ্ধ করতে পারেনা।

জওহরলাল নেহেরু যখন একযোগে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন, তখন বিরোধী দল তাকে ঘায়েল করার জন্যে তাদের তুনীর থেকে বেছে বেছে যে-সকল শানিত তীক্ষ্ণবাণ নেহেরুকে তাগ করে ছুড়তেন তার মধ্যে তাদের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল আমদের কূটনীতিকদের তথাকথিত ব্যর্থতা। বিরোধীদলের যুক্তি—এই ব্যধিগ্রস্থ দুনিয়াটাকে সুস্থ করে তোলার পক্ষে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি যতবড় মোক্ষম দাওয়াই হোক না কেন, বিদেশে কার্যরত আমাদের কূটনীতিকগণ সে সব সরকার ও

জনমতকে সেই ধন্বন্তরী বটিকাটি গেলাতে পারেননি। তাদের আরো অভিযোগ—আমাদের রাষ্ট্রদূতদের যা ছিল প্রধান কর্তব্য—অর্থাৎ বিদেশের জনমতকে আমাদের সপক্ষে আনা, সেই কর্তব্য পালনে আমাদের রাষ্ট্রদূত-গণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতার কারণ, আমাদের রাষ্ট্রদূতদের একযোগে 'অপদার্থতা' ও কর্তব্যে অবহেলা। সংসদে বিরোধীদলের সদস্যগণ সংসদের অধিবেশনগুলোতে তাদের গলার স্বর সপ্তমে তুলে আরো অভি-যোগ করেছেন যে নেহেরু এই 'অযোগ্য' ব্যক্তিদের পুষবার জন্যে বিদেশে গণ্ডায় গণ্ডায় দূতাবাস খুলে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করছেন। ফল দাঁড়াচ্ছে কি? না অষ্টরম্ভা! তীক্ষ্ণ বাক্যের শরজালে জওহরলাল নেহেরুকে আচ্ছন্ন করে তারা বলেছেন, এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশের অগণিত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটা 'অযোগ্য' আর 'কর্তব্যজ্ঞান-হীন' ব্যক্তির আরাম আয়েসের জন্যে বিপুল অর্থ অপব্যয় করে নেহেরু মধ্যযুগীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এ সকল অভিযোগ কি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেন তা প্রায় সকলেরই জানা আছে। তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীর সকল দেশ যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি মেনে নেয়নি, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তার কারণ আমাদের রাষ্ট্রদূতদের তথা-কথিত অযোগ্যতা বা কর্তব্যজ্ঞানহীনতা নয়। আজ যদি ভারতের মাটিতে আর একজন এব্রাহাম লিঙ্কনের আবির্ভাব হয় এবং তাকে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয় তবে প্রেসিডেন্ট রেগন সাহেব কি লিঙ্কনরূপী ভারতের রাষ্ট্রদূতের দর্শনমাত্রই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে ফেল-বেন? এর উল্টো দিকটাও একবার ভেবে দেখা যাক। আজ লেনিনের মত অমিত প্রতিভাশালী একজন রাশিয়ান যদি আজ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হয়ে দিল্লীতে আসেন এবং নিজের কূটনীতিক দক্ষতার অসীম পরিচয় দেন তাহলেই কি আমরা আমাদের নীতি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়ে রাশি-য়ান নীতি গ্রহণ করবো?

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি যে সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি তার কারণ, অন্তত আমার যা মনে হয়েছে যে দুর্বলের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলদর্পে ধনদর্পে দর্পিতরা শুনতে পায়না। দরিদ্রের হিতোপদেশ ধনীর কানে পরিহাসের মত শোনায়।

সাম্প্রতিক কালে কোন কোন মার্কিন লেখকের মতে ভারত আজ "রাইজিং মিডল পাওয়ার", নিছক 'উন্নতিশীল' কিংবা 'নিম্ন আয়ের' 'দেশ নয়'। বর্তমান ভারতে কৃষি ও শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি লক্ষ্য করে আমেরিকার সেনেটার ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান ভবিষ্যৎবাণী করে-ছেন যে ২০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'সুপার পাওয়ার' হয়ে উঠবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পাকিস্তানী বিজ্ঞানী আবদুস সালাম ময়নিহানের ঐ ভবিষ্যৎবাণীতে সায় দিয়েছেন।

আমেরিকার অর্থনীতিবিদ লিনডন জে সারুশ এবং অপর কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির ধারার কমপিউটার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আধুনিকতম উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করে ভারত চল্লিশ বছরের মধ্যে সুপার পাওয়ারে পরিণত হবে।

ভারতে যতদিন সেই শুভদিন না আসবে ততদিন বিদেশে ভারতের দূতাবাসের মাথার উপরে কিংবা ভারতের রাষ্ট্রদূতের গাড়ীর বনেটে লগ্ন ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে বিদেশের বাতাস শুধু খেলা করবে, আর এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর ততদিন আজকের মত এমনি জনশূন্য হয়ে নিঃশব্দে কালের প্রহর গুনবে।